বহুব্রীহি

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ

—সাড়ে চার টাকা—

এই লেখকের

বশীকরণ

মরুতীর্থ হিংলাজ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

শুভায় ভবতু

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস, ২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

সুহৃদ্দ্বয়ের করকমলে

এই বইটি যে কোন কারণেই হোক প্রকাশ করতে লেখকের আপত্তি ছিল। আমরা জোর ক'রে এটি প্রকাশ করলাম। আমাদের বিশ্বাস, রচনা ভাল হয়েছে বা মন্দ হয়েছে—আর যে-ই হোক লেখক তার বিচারক হ'তে পারেন না এবং সবচেয়ে বড় কথা, পাঠকসাধারণের কাছ থেকে রায় না পেলে কোন মতামতেরই কিছু দাম নেই। তাই পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই আমরা বইটি সেই সর্বোচ্চ আদালতে পেশ করলাম। ইতি—

বহুব্রীহি

নাম বললে, বহুব্রীহি বর্মা।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি বললেন?"

গম্ভীরভাবে ফের বললে—"শ্রীবহুব্রীহি বর্মা।"

মুখ নিচু করে হাসি সামলে মনোযোগ দিলাম তার কররেখাগুলিতে। ডান হাতখানি ধরাই ছিল আমার বাঁ হাতের মধ্যে। বহুব্রীহি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমার রায় শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে হাতখানি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও নাম আপনার রেখেছিল কে?"

বহুব্রীহি ঢোক গিলে বললে—"আমার মামা। আমার বাপ মা নেইত, মামা মানুষ করেছেন, তিনিই রেখেছেন নামটা।"

মনে মনে বললাম, মানুষ যা' করেছেন তা' তো দেখতেই পাচ্ছি। মুখে বললাম—"মামা আপনাকে খুবই ভালবাসেন বুঝি।"

বহুব্রীহি ঘাড় চুলকে বললে—"তা', তা' অবশ্য বলতেও পারেন। তবে আজকাল একটু ইয়ে মানে কেমন যেন একটু,—"

গম্ভীরভাবে বললাম—"তাই তো দেখলাম। সময়টা আপনার এখন তেমন—"

বহুব্রীহি উত্তেজিত হয়ে উঠল। এক চাপড় মারল চৌকিখানার ওপর। বললে—"ব্যাস, ধরেছেন একেবারে আসল ব্যাপারটাই। সেই জন্যেই তো মশাই এলাম আপনার কাছে। এমন বেয়াড়া সময় মশাই জীবনে কখনও পড়েনি। মামা মামী দু'জনেই একেবারে টাইট মেরে গেছে। একটি পয়সা আর গলাবে না হাতের মুঠো থেকে। বলুন তো, এমন করলে আমার চলে কি করে?"

ধীরে সুস্থে হিসেব করে কোন্ গ্রহটি কোন্ স্থানে সরে যাবার দরুন এ হেন বিপত্তি ঘটছে বহুব্রীহির কপালে তা' বললাম। এই হিসেব করা আর বলা, এই দু'টিই হচ্ছে এ কারবারের আসল কায়দা। মক্কেলের সহ্যশক্তি কতটুকু,

কত দূর পর্যন্ত এগুলে মক্কেলটি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে না, সেই জ্ঞানটুকু থাকা দরকার। এমন কথা কখনও বলা উচিত নয় যাতে মক্কেল ভয় পায়। ভয় পেলে কাল আসব বলে উঠে যাবে আর সটান গিয়ে উঠবে একশ' টাকা যাঁরা খসান সেই সব রাঘব-বোয়াল রাজা-সম্রাটদের কাছে। কাজেই সামলে কথা বলতে হয়।

শ্রীবহুব্রীহি বর্মা অধীর হোয়ে উঠলেন। হাত টেনে নিয়ে বললেন—"তা' মশাই, এখন একটা উপায় বলুন দিখি। আর তো পারা যায় না।"

উপায় বললাম। জপ হোম তর্পণ অভিষেক, দশ দিন ধরে চালাতে হবে। পুরশ্চরণ-সিদ্ধ-কবচ করতে দশটা দিন লাগেই। ফাঁকি দিয়ে কারও পয়সা খরচ করানোটা আমার দ্বারা হবে না।

বহুব্রীহি বললে—"সেই জন্যেই তো আসা আপনার কাছে। ওই সব সাইনবোর্ড-মার্কা জ্যোতিষী, মশাই আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। গেলবার জন্মে হাঁ করে বসে আছে এক একটি রাহু। আপনি মানে আপনার মত যাঁরা লুকিয়ে আছেন, সহজে ধরা দিতে চান না, তাঁরাই আসল চিজ। কম কষ্টে কি আপনাকে ধরতে পেরেছি! যাক্ বাবা, এখন লাগবে কত বলুন?"

কত লাগবে বলবার আগে আর একবার বেশ করে দেখে নিলাম মক্কেলের ঘড়ি-বোতাম, এক ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া আংটি আর সাজ পোশাক। জামাটা গরদের, বোধ হয় কালই পরেছে, দু'জায়গায় হলুদের দাগ লেগেছে। অর্থাৎ একটু বেসামাল অবস্থায় মাংস খেয়েছে। চোখের কোলে কালির পোঁচ, ঘাড় থেকে কানের ওপর পর্যন্ত চাঁচা, ব্রহ্মতালুতে এক বোঝা চুল, চুলগুলো রুক্ষ, কিছুতেই সেগুলো যথাস্থানে থাকছে না, নেমে আসছে কপাল ছাপিয়ে চোখের ওপর। পরনের কাপড়খানা জরি পেড়ে, জুতো জোড়া দরজার কাছে খুলে রেখে এসেছে, সে দু'পাটির দিকেও তাকালাম একবার। তারপর গলায় যতটা সম্ভব তাচ্ছিল্য ভাব এনে বললাম—"কত আর লাগবে, এই ধরুন দিন তিন চার টাকাই লাগুক—"

বহুব্রীহি কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—"ধরুন না পঞ্চাশটা টাকাই লাগল। কিন্তু কাজটা আমার করে দিতে হবে মশাই, মামা মামীকে একটু টিট করতে না পারলে—

টাকা পঞ্চাশটা বার করে সামনে রাখলে।

খাতা টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"বলুন এবার আপনার গোত্রটা লিখে রাখি—"

ও পক্ষ চুপ। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, চোখ দুটো বড় বড় করে মাথার চুল টানছে।

আবার বললাম—"আপনার গোত্রটা বলুন।"

"গোত্র! গোত্র কি?"

বললাম—"মানে—গোত্র হচ্ছে, যেমন ধরুন এই ভরদ্বাজ—শণ্ডিল্য—কাশ্যপ—সৌকালীন এই সমস্ত। মানে, আপনাদের বংশ কোন্ মুনি ঋষি থেকে আরম্ভ হোয়েছে। আপনাদের বংশের সেই প্রথম মানুষটির নামই হোচ্ছে গোত্র। গোত্র না বললে সঙ্কল্প করব কি করে?"

বহুব্রীহি একেবারে ভেঙে পড়ল।

"তবেই সেরেছে। ও সব গোত্র ফোত্র কোথায় পাব মশাই? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি পাই কি না। কাল জেনে এসে বলব আপনাকে।"

কি অন্যায়ই করলাম গোত্র জিজ্ঞাসা করে। গোত্র না পেলে ফসকাবে না তো! এখন সামলাই কি করে।

বহুব্রীহি চলে গেল। টাকা ক'টা যে তুলে নিয়ে গেল না এই আমার ভাগ্যি। কিন্তু তুলে নিয়ে গেল না বলেই আমি ভাঙতে পারব না। কাল পর্যন্ত টাকা নিয়ে বসে থাকতে হবে। যদি এসে ফেরত চায়।

কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হোল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল বহুব্রীহি।

"পেয়েছি মশাই, পেয়ে গেছি গোত্র। নিন লিখে তাড়াতাড়ি, আবার ভুলে না মেরে দি।"

সুতরাং আবার খাতা খুলে বসতে হোল।

"বলুন আপনার গোত্র।"

"অ্যালুমিনিয়াম, আমাদের গোত্র হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম", বলে বহুব্রীহি সব ক'টা দাঁত বার করে ফেললে।

অতি কষ্টে হাসি সামলে বললাম—"কে বলে দিল আপনাকে গোত্রটি ?"

থতমত খেয়ে ঢোক গিলে দু'হাত কচলাতে কচলাতে বহুব্রীহি বললে—"আমার পরিবার। তার সব মনে থাকে কি না।"

বললাম—"তিনি আপনাকে আলম্ব্যায়ন বলেছিলেন, তাই না ?"

প্রায় চীৎকার করে উঠল বহুব্রীহি—"হাঁ হাঁ, ঠিক ধরেছেন তো। আশ্চর্য ! আমার মুখে মশাই ও সব খটমট নাম ফেরে না।"

এগার দিন পরে আসতে বললাম। "সকাল বেলা স্নান করে এসে কবচ ধারণ করে যাবেন, বুঝলেন। তার আগে জলটল খাবেন না।"

বহুব্রীহি বিদায় নিলে।

আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাড়িওয়ালাকে ডেকে তিন মাসের ঘর ভাড়া তিন আড়ায়ে সাড়ে সাতাটি টাকা দিয়ে তবে অন্য কাজ। হাবাতে লোকটা মল তাগাদা করতে করতে। আমি যেন এখনই মরছি ওর ঘরে। যত বেটা নচ্ছারের পাল্লায় পড়েছি তো। এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি, ভাড়া দেওয়া কাকে বলে।

রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

মাসে দু'-একবার···

মাসে দু'-একবার মনিঅর্ডারের পিয়নের শুভাগমন হবে না, অথচ কাশীবাস করতে হবে, এই রকমই বরাত আমাদের। বড় ছোট মেজ সেজ আসল নকল নামজাদা ভৃগুওয়ালারা আর নামজাদা স্বামীজী মহারাজদের হাত

ফস্‌কে যদি দু'-একটি চুনোপুঁটি ছটকে এসে পড়ে, এই আশায় দিনের পর দিন পথের দিকে চেয়ে থাকি।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার আগে দশাশ্বমেধ ঘাটে বা অন্য কোনও ঘাটে, যেখানে লোকে লোকারণ্য হয়, তেমন জায়গায় গেরুয়া চাদরখানা মুড়ি দিয়ে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে থাকি। বেশ কাজ হয় এতে। উঠে আসবার সময় মাঝে মাঝে এক-আধ জন পিছু নেয়। ওদের ভেতর থেকেই আসল মক্কেল বেরিয়ে আসে।

সেদিন সন্ধ্যার পরেও বসে আছি দশাশ্বমেধ ঘাটে। একটা চাতালের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে জপে মন বসাবার কসরত করছি। কার্তিকের শেষ তখন। ঘাটে লোকজন নেই। একটু দূরে তখনও এক বুড়ী সামনে ছোট্ট চুপড়িতে কয়েক গোছা পাকানো সলতে নিয়ে বসে আছে। এমন সময় একজনের আবির্ভাব।

শুনলাম, ফ্যাস ফ্যাস করে বুড়ী বলছে—"রাত যে কাবার হতে চলল গো বাবু।"

জবাব হ'ল বেশ গদগদ ভাষায়—"কি করি বল মাসী—সব দিক সামলে-সুমলে আসতে হয় তো।"

বুড়ী ঝাঁজিয়ে উঠল—"কিন্তু এরা তো বাপু বাজারের নয় যে, তোমার জন্যে রাত দুপুরে হা-পিত্যেশ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। গেরস্ত ঘরের মানুষ এরা, এদেরও তো সময় অসময় আছে।"

হি-হি করে হাসির আওয়াজ শোনা গেল, তারপর খোশামুদির সুরে—"আহা চটছ কেন গো মাসী, এই নাও পান খাও, ভাল জর্দা এনেছি।"

মাসীর সেই ঝাঁজানো সুর—"তা' বাপু, আজ আগে আমার টাকা দিয়ে দাও। সেদিন হাতে পেয়ে ফাঁকি দিয়ে ভেগে পড়লে।"

"আহা-হা। চটছ কেন গো। টাকা কি পালাচ্ছে নাকি। আগে জিনিস দেখাও—তবে তো টাকা। যে রকম ঘাটের মড়া সব জোটাচ্ছ, সেদিন তো খামকা টাকা ক'টা জলে গেল।"

আরও তেরিয়া হয়ে উঠল, অবশ্য চাপা গলায়।

"কাজ ফুরোলেই ঘাটের মড়া হয়ে যায়। এবার আর তা' বলতে হবে না বাছা। চল—ঐ কাছেই রয়েছে। কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি—আজ আগে আমার টাকা চাই। সুড়ুৎ করে যে সরবে, তা' হবে না। তাহলে লোক জমা করব চেঁচিয়ে।"

পাথর বাঁধানো সিঁড়িতে জুতোর শব্দ ওপর দিকে উঠে গেল।

আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম জপে মন বসাবার আশায়। বসানো তো দূরের কথা, মনকে দাঁড় করাতেই পারলাম না। যে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাকে বসাই কি করে। শেসে মনের পিছু পিছু নিজেই উঠে চললাম। ভাবতে ভাবতে উঠলাম, আমার মত কত জন কত রকমের খদ্দের পাকড়াও করবার আশা নিয়েই না এই মহাতীর্থের মহাপবিত্র গঙ্গার ঘাটে বসে থাকে। কে জানে, বাবা বিশ্বনাথ সকলের সব আশা পূরণ করে কি না! জয় বাবা বিশ্বনাথ।

ঘাট থেকে উঠে কালীতলার মা-ঠাকুরুণকে ভক্তিভরে একটি প্রণাম নিবেদন করে সামনের দোকান থেকে এক ছটাকি ভাঁড়ের এক ভাঁড় মালাই কিনলাম দু'-আনা দিয়ে। সকালে নগদ পঞ্চাশটি টাকা উপার্জন হয়েছে, সুতরাং দু'-আনার মালাই খেয়ে আজ রাত্রে জলযোগ সমাপন করা যায় বুক ঠুকে। মালাই নিয়ে বাঁ-হাতি গলিতে ঢুকলাম। এখন যেতে হবে সেই হাড়ারবাগ গলি-গলি দিয়ে। প্রায় এক মাইল পথ।

গলির ভেতরেও কুয়াশা ঢুকে পড়েছে। অনেক দোকান বন্ধও হয়ে গেছে তখন। সাবধানে এগোচ্ছি অন্ধকারে। হঠাৎ রৈ-রৈ শব্দ উঠল সামনে থেকে। গোলমালটা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

ষাঁড় নয় তো! বোধ হয় লড়ছিল দুটো ষাঁড়, এবার তাড়া খেয়ে ছুটে আসছে এদিকে। টপ্ করে একটা বন্ধ দোকানের সামনের রকে উঠে দাঁড়ালাম।

যেখানে গলিটা হঠাৎ মোড় ঘুরেছে, সেই মোড়ের ওধার থেকে শন্‌-শন্‌ করে একটা লোক ছুটে বেরিয়ে গেল আমার সামনে দিয়ে। পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এল সেইভাবে। এসেই রকের উপর লাফিয়ে উঠে ঝাপটে ধরল আমার দুই পা—"বাবাজী, বাঁচান আমায়, বাঁচান, নয়ত—"

অন্ধকারের ভেতর নজর করে দেখি—আরে এ যে সেই বহুব্রীহি! চমকে উঠলাম।

কিন্তু তখন আর একটি কথা বলারও সময় নেই। বহু লোক ছুটে আসছে ওধার থেকে। চক্ষের নিমেষে একটা মতলব খেলে গেল মাথায়। বহুব্রীহিকে ঘাড় ধরে শুইয়ে ফেলে আমার গেরুয়া চাদর দিয়ে তার আপাদমস্তক ঢেকে দিলাম। তারপর তার পাশে বসে রইলাম হাঁটুতে মাথা গুঁজে।

হৈ-হৈ করতে করতে গোটা দুই লোক ছুটে চলে গেল সামনে দিয়ে। তাদের পেছনে আরও তিন-চারজন এসে পড়ল। ওদের ভেতর একজনের নজর পড়ল আমার দিকে। তার হাতে আবার টর্চ। টর্চের আলো আমার ওপর ফেলে এগিয়ে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, খাস পূর্ব-বাংলার হিন্দীতে—"কোইকো দৌড়ায়কে ভাগনে দেখা হিঁয়াসে।"

খুব বড় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম পরিষ্কার বাঙলায়—"না, বাবারা, কেউ তো ছুটে যায়নি এখান দিয়ে, আমি তো ঠায় জেগে বসে আছি রুগী নিয়ে।"

হাতে লাঠিসোটা নিয়ে আরও কয়েক মূর্তি এসে ঘিরে দাঁড়াল সামনে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—"হয়েছে কি ওর?"

"বাবা বিশ্বনাথই জানেন। কি জানি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে। এখন তো বেঘোর জ্বর—আবার গায়ে কি সব বেরোচ্ছে যেন—"

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে—"আপনারা থাকেন কোথায়?"

জবাব দিলুম—"এখনও কোথাও থাকবার ব্যবস্থা হয়নি বাবা। সবে আজ ভোরে এসে নামলাম হরিদ্বার থেকে—"

আমার কথা আর শেষ করতে হ'ল না। একজন বললে—"মরুকগে যাক্, কোথাকার কে ওরা। দৌড়ো সামনে, ধরতেই হবে সে শালাকে।"

একদল বললে—"সামনে যায়নি, নিশ্চয়ই পাশের কোনও গলিতে লুকিয়েছে।"

একদল বললে—"বাতাসে তো আর মিশে যেতে পারে না হারামজাদা, পাখি নয় যে, আকাশে উড়ে যাবে। চল্ এগিয়ে—নিশ্চয়ই সামনে গেছে।"

ওরা আর দাঁড়াল না, ভাগাভাগি হয়ে দু'ধারে দু'-দল ছুটল।

দু'-হাত জোড় করে কপালে ঠেকালাম। আর একটু দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললেই হয়েছিল আর কি। সবেমাত্র যারা হরিদ্বার থেকে এসেছে, তাদের কাছে লোটা-কম্বল কিচ্ছু নেই। জয় বাবা—

একটু পরে বহুব্রীহি ফোঁপাতে লাগল।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, "খুব মেরেছে বুঝি?" বহুব্রীহি ফোঁপাতে ফোঁপাতে উত্তর দিলে, "না বাবা, মারতে পারেনি এক-ঘাও। কিন্তু সব কেড়ে নিয়েছে আমার; এমন কি, পরনের কাপড় পর্যন্ত—"

এতক্ষণ পরে খেয়াল হলো, সত্যিই তো, বহুব্রীহি শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল। এখন উপায়! আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওখানে ওভাবে বসে থাকাও নিরাপদ নয়। শেষে সেই চাদর জড়িয়ে বহুব্রীহি চলল আমার পাশে পাশে।

দশাশ্বমেধে পৌঁছে রিকশায় উঠলাম আমরা। গোধুলিয়ার ওধারের একটা ঠিকানা বলে বহুব্রীহি একটি বিড়ি চাইল। বিড়ি ধরিয়ে তখন বললে, কি করে এ দশা হ'ল তার।

সন্ধ্যার পর কেদারনাথকে প্রণাম করে ফিরছিল বহুব্রীহি। অন্ধকার গলির পথ। কোন্ এক অচেনা জায়গায় হঠাৎ পেছন থেকে কে তাকে

জাপটে ধরে। চীৎকার করতে সময় পায়নি সে, তার মুখ-চোখ বেঁধে ফেললে ক'টা লোক। তারপর নিয়ে গিয়ে তুলল একটা অন্ধকার নোংরা ঘরের মধ্যে। তারপর আংটি বোতাম জামা মায় কাপড়খানা পর্যন্ত খুলে নিল। ঘরের দরজাটা পর্যন্ত দিল বাইরে থেকে বন্ধ করে। তেষ্টায় তখন বহুব্রীহির ছাতি ফাটছে, সে জল জল করে চেঁচাতে শুরু করলে। এক বুড়ী দরজা খুলে তাকে জল দিতে এসেছিল, আর সেই ফাঁকে বুড়ীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সে দৌড় লাগিয়েছে। বরাতগুণে সদর দরজাটা ছিল খোলা। কিন্তু বুড়ীটা চেঁচিয়ে সব মাটি করে দিলে। ওদের লোকজন ছুটতে লাগল পেছনে।

এই পর্যন্ত বলে বহুব্রীহি বিড়ি ফেলে দিয়ে নিচু হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিলে, "আপনার জন্যেই আজ প্রাণে বাঁচলাম বাবা, সময়টা যে খুবই খারাপ, একথা তো আপনি আজ সকালেই আমায় বলেছেন। আপনার কথাই ফলে যাচ্ছিল। আগেই শান্তি-স্বস্ত্যয়নের টাকাটা দিয়ে দিয়েছি, তাই রক্ষে পেলাম আপনার দয়ায়—আপনিই বাবা সাক্ষাৎ কালভৈরব।"

বেশ বড় একখানা দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামল রিকশা। আমাকেও নেমে আসবার জন্যে পেড়াপোড় আরম্ভ করলে বহুব্রীহি। নামলাম, দেখেই যাই বহুব্রীহির সংসার।

আধ ঘণ্টা পরে বহুব্রীহি আর তার পরিবারের হাত থেকে রেহাই পেলাম। আবার রিকশা করেই ফিরে এলাম কালীতলার সামনে। চললাম গলির পর গলি পার হয়ে। আমাকে তো আর গুণ্ডারা ধরবে না। গুণ্ডাদের আক্কেল বিবেচনা আছে।

মালাইয়ের ভাঁড়টা বোধ হয় এখনও পড়ে আছে সেই রকের ওপর। হয়ত কুকুরে খেয়ে ফেলেছে এতক্ষণে। তা' থাক—আমার দুঃখ নেই সে জন্য। বহুব্রীহির পরিবার এক সের ভাল সন্দেশ আর এক জোড়া নতুন কাপড়-চাদর দিয়ে দিয়েছে।

পরিবারের মত পরিবার বটে বহুব্রীহির। গায়ে-গতরে অন্তত পাঁচগুণ বেশি হবেন বহুব্রীহির চেয়ে ভদ্রমহিলা। অত বড় চাকার মত মুখ, আর অমন ভাঁটার মত চোখ জীবনে নজরে পড়েনি আমার। আর তেমনি বাজখাঁই গলা। আমায় সঙ্গে না নিয়ে গেলে কি যে ঘটত আজ বহুব্রীহির কপালে, কে বলতে পারে। পরিবার তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, গুণ্ডায় সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে স্বামীর। আমার মুখ থেকে শুনেও যেভাবে চোখ দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে চাইছিলেন বহুব্রীহির দিকে, তাতে আমারই ভয়ে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। শেষে আমাকেই একটা ধমক দিলেন—"আপনি সাধু মানুষ, আপনি কি বুঝবেন বাবাঠাকুর ঐ বেঁটে বজ্জাতের পেটে-পেটে কত বুদ্ধি। ও আপনাকে ঠকাতে পারে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না।"

তারপর এগারো হাতি একখানা নতুন থান কাপড় আর একখানি নতুন ভাগলপুরী চাদর নিয়ে এসে বললেন—"আপনার গেরুয়া চাদর ঐ পাপের গায়ে ঠেকেছে, এ পাপের কি আর প্রাচ্চিত্তির আছে নাকি ওর। ও-চাদর আর আপনাকে ছুঁতে হবে না। ও ছুঁয়ে আর ঐ মড়াকে নরকে পাঠাবেন না বাবাঠাকুর।"

বহুব্রীহির সংসার আর পরিবার দর্শন করে, কাপড় চাদর সন্দেশ আর নগদ পাঁচ টাকা প্রণামী নিয়ে ফিরছিলাম—আর ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, অত সোনার গয়নাসুদ্ধ অত বড় একটি পরিবার কোথা থেকে যোগাড় করলে বহুব্রীহি। একেই বলে বরাত; দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে আর সোনার বোতাম আংটি সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। ঐরকম একটি জাঁদরেল পরিবার মাথার ওপর থাকলে ভাবনা-চিন্তা থাকবেই বা কেন। যাকগে, কি লাভ আমার ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে। কপালে প্রাপ্তিযোগ কিছু ছিল, পেয়ে গেলাম। জয় বাবা বিশ্বনাথ।

কিন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়নের আশীর্বাদ নেবার জন্যে বহুব্রীহি আর এল না অমাবস্যার পর শনিবার দিন। এতে ভাববার কিছু নেই। বড়লোক তো, হয়ত চলে গেছে

বৃন্দাবন বা হরিদ্বার। এই রকমই হয়, এই হচ্ছে ওরকম মক্কেল পাবার সুবিধে। তান্ত্রিক ক্রিয়ার অব্যর্থ ফল দেখবার আশায় বড় একটা কেউ বসে থাকে না।

নিয়মিত জপে বসছি দশাশ্বমেধ ঘাটে। ছুটকো-ছাটকা দু'-একটা খদ্দের যে না জুটছে তা' নয়। তবে বহুব্রীহির মত অত উঁচুদরের কেউ জুটছে না। তা' আর কি করা যায়। সবই বাবা বিশ্বনাথের কৃপা।

সলতে বেচতে বুড়ীও এসে বসে ঘাটে। একটু লক্ষ্য রেখে জানতে পেরেছি বুড়ী সলতের সঙ্গে আর কিসের কারবার চালায়। খুব রংচঙে ডুরে কাপড় পরে কপালে সিঁথিতে ডগ্‌ডগে সিন্দুর লাগিয়ে শাঁখা-পরা অল্পবয়সী দু'-একটি বউ-ঝি প্রায়ই এসে বসে বুড়ীর পাশে। দেখলেই বোঝা যায় গৃহস্থ ঘরের মেয়ে-বউ। একটু বেশি হাসিখুশি ভাব যেন ওদের। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ওরকম তো একটু হয়ই। বিদেশে এসেছে—এখানে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবেই তো। আবার কয়েকটি ছোঁড়াও ঘুর ঘুর করে আশে-পাশে। ওরা পান কেনে, চানাচুর কেনে। তারপর কে কোথায় যায় কে আর খবর রাখে।

অঘ্রাণ মাস পড়ল। আরও ঘনিয়ে উঠল কুয়াশা। এখন সন্ধ্যা না হতেই আমিও উঠে আসি দশাশ্বমেধ থেকে। সেদিন উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছে না। বুড়ীটা যে কেন বসে আছে তখনও তাই ভাবছি। একখানি ছোট বজরা এসে ঘাটে লাগল। কোট প্যাণ্ট-পরা একটি লোক উঠে এল বুড়ীর কাছে। বুড়ীর সঙ্গে কি দু'-একটা কথাবার্তা হলো। বুড়ী সলতের চুপড়ি ফেলে রেখে উঠে গেল আঁচলে কি বাঁধতে বাঁধতে। একটু পরে যখন আবার ফিরে এল তখন ওর পিছু পিছু এল একটি বউ মানুষ।

কোট প্যাণ্ট-পরা লোকটি ফস্ করে একটি দেশলাইর কাঠি জ্বালালে নিজের সিগারেট ধরাতেই বোধ হয়। সিগারেট কিন্তু ধরালে না। বললে চাপা গলায়—"খাসা জিনিস, আচ্ছা দোব দশ টাকা, কিন্তু ঐ বজরায় যেতে হবে।"

বুড়ী বললে, "এক ঘণ্টার ভেতর এখানে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে আমাদের। আর আমিও সঙ্গে থাকব বজরায়।"

লোকটি বললে, "আচ্ছা!"

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

শেষ সিঁড়িতে ওরা পৌঁছেছে। ঘন কুয়াশার মধ্যেও ওদের তিনজনের ঘোলাটে মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। বজরাখানা সামনে এগিয়ে এল। লোকটি লাফিয়ে উঠল বজরায়। হাত ধরে টেনে তুলে নিল বউটিকে। বুড়ীও উঠল বজরায় তাড়াতাড়ি। একজন মাথায় পাগড়ি-বাঁধা জোয়ান লোক সিঁড়িতে লগি লাগিয়ে ঠেলা দিলে। সেই সঙ্গে সেই কোট প্যান্ট-পরা লোকটি এক ধাক্কা মারলে বুড়ীকে। বুড়ী ছিটকে এসে পড়ল ঘাটের ওপর। বজরা সরে গেল অনেকটা দূরে। বুড়ী শকুনের মত চেঁচিয়ে উঠল। ওধারে বজরার ওপর নজর করে দেখলাম দুটো লোক বউটিকে গুঁজরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বজরার ঘরের মধ্যে। বজরা ঘুরে গেল। তারপর মিলিয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে। বুড়ীটা পরিত্রাহি চেঁচাতেই লাগল।

লোকজন জমতে লাগল। পুলিসও দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কেউ বিশেষ গরজ দেখালে না এ ব্যাপারে। উল্টে বুড়ীকেই অনেকে সদুপদেশ দিয়ে গেল। "কেন মরছ মিছিমিছি চেঁচিয়ে, টাকা পেয়েছ কটা?" কে একজন কস করে বুড়ীর আঁচল টেনে ধরলে। "এই তো কি যেন বাঁধা রয়েছে, খোল খোল।" খুলে দেখা গেল পাঁচখানা এক টাকার নোট! যে বুড়ী ঘাটে বসে সলতে বেচে তার আঁচলে পাঁচখানা নোট! সবাই হাসতে হাসতে চলে গেল। টিপ্পনী কাটল, "আ মর, ঢঙ দেখ মাগীর। উনিও যাবেন বজরা চেপে। সেই বয়সই ওঁর আছে কি না।' পুলিস দু'জন অবশ্য দরদ লাগিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে গেল বুড়ীকে। "কোই ডর নেহি আছে বুঢঢী, থোরা বাদ উসকো কোই ঘাট পর উতর দিয়ে যাবে। তু আপনা ঘর যা', ঝুটমুট চিল্লাচিল্লি মত কর। দেখে লিস, তোর বেটি কম সে কম বিশ রুপেয়া লিয়ে আসবে ঘরে!"

এরা সবাই সব কিছু জানে। জানে অনেক কিছু, বাঙলা দেশ থেকে এখানে এসে বাঙলার লোকে কতদূর কি করতে পারে না পারে সে জ্ঞান সকলেরই বেশ আছে। তা' আমার এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমিও বাঙালী, আমিও কাশীবাস করতে এসেছি পোড়া পেট সঙ্গে নিয়ে। তবে গেরুয়া পরা আছে, চুল দাড়ি আছে, কাজেই আমার অনেক সুবিধে আছে। বুড়ীর মত কাঁচা মালের কারবার নয় আমার এই যা' রক্ষে। জয় বাবা বিশ্বনাথ।

উঠে পড়লাম।

আবার সেই কালীতলার মা-ঠাকুরুণকে প্রণাম, আবার সেই বাঁ-হাতি গলি, সেই অন্ধকার পথ দিয়ে এ গলি সে গলি পেরিয়ে যাওয়া। নিত্যকার ব্যাপার। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, চোখ বুঁজেও চলে যেতে পারি।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনলাম। কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে। থমকে দাঁড়ালাম। পাশে এসে পড়ল। দশাশ্বমেধের বুড়ী ফিরছে।

যতটা সম্ভব আত্মীয়তার সুর গলায় ঢেলে বললাম, পাকা বরিশালী ভাষায় —"কি গো ঠাকরেন, হয়েছে কি ? কাঁদছ কেন ?"

প্রথমে তো বুড়ী কথাই বলে না। ফোঁসফোঁসানি আরও বেড়ে গেল। আরও দু'-একবার মিষ্টি কথা বলায় ফল হলো। বুড়ী প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর যা' বললে তার মোটা অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে, আজ বাসায় ফিরলে মারের চোটে বুড়ীর হাড় গুঁড়ো হয়ে হয়ে যাবে।

তারপর একটু একটু করে অনেক কথাই বেরুলো বুড়ীর পেট থেকে। যে বাসায় সে থাকে সে বাসায় দশ ঘর ভাড়াটে। বুড়ীকে ভাড়া দিতে হয় না। কারণ সে ভাড়াটেদের দু'-পয়সার মুখ দেখতে সাহায্য করে। যে বউটিকে এইমাত্র ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বজরায়, ওর স্বামী আর শাশুড়ী আজ বুড়ীর চামড়া তুলে নেবে বউকে না নিয়ে ফিরলে।

বললাম, "এখন না হয় নাই ফিরলে বাসায়। সে মেয়েটা ফিরে আসুক। তারপর যেও। তখন ওরা আর বেশী কিছু বলবে না।"

বুড়ী আবার কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার বিশ্বাস, যে গেছে সে আর ফিরবে না।

"ফিরবে না! কেন? কি করে বুঝলে যে ফিরবে না সে?"

"আমারই ভুল হয়েছিল গো বাবা, চোখে কম দেখি কি না, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। আবার সাহেব হয়ে এসেছে তো। কাজেই ভুল করলুম। আর নগদ অতগুলো টাকা, বউটাও দশ টাকা শুনে লুভিয়ে উঠল। ভাবলুম, কত জনাই তো বজরায় নিয়ে যায়। যাই না ছুঁড়িকে নিয়ে ঘণ্টাখানেক পরেই যখন নামিয়ে দিয়ে যাবে। এ যে সেই লোক তা' বুঝলে কি আর ফাঁদে পা দিতুম আমি। ও বউকে কিছুতেই ছাড়বে না। যদি ছাড়ে তো নাক কান কেটে নিয়ে ছেড়ে দেবে।"

আবার চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। তারপর বললাম, "তবে চল না কেন থানায়। পুলিসে সব কথা বললেই—"

বুড়ী আঁতকে উঠল থানার নাম শুনে। থানায় গেলে আর কারও রক্ষে নেই। পুলিস একবার গন্ধ পেলে গুষ্টিসুদ্ধ চিবিয়ে খাবে।

"যারা বজরায় ছিল তাদের তুমি চিনতে নাকি?

রাগে গরগর করতে লাগল বুড়ী। "চিনতে পারলাম সেই মুখপোড়াকে বজরায় পা দিয়েই। বউটাকে বজরায় টেনে তুলেই বলে,—এইবার ঘুঘু, শুধু ধান খেয়ে পালাও, ফাঁদ তো দেখনি কখনও।" চমকে উঠে মুখের দিকে চাইলাম লোকটার। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে।

"বউটার ওপর বুঝি রাগ ছিল লোকটার?" যতটা সম্ভব নিঃস্পৃহ গলায় জিজ্ঞাসা করলাম। বুড়ী আরও রেগে গেল।

"বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে—যেমন ঠেঁটা মেয়েমানুষ। ওর নাক কান কাটা যাবে না তো যাবে কার? মানুষ নিয়ে যাই, তোকে টাকা দেয়, আর তুই

কিনা তোর সোয়ামীর কথায় তার মাথা খেতে চাস। লোকটাকে ঘরে নিয়ে তার জামা কাপড় পর্যন্ত ছাড়িয়ে তারপর সেই গুণ্ডা সোয়ামীকে ডেকে আনে। তখন মারধোর করে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে নেংটো করে পথে বার করে দেয়। এর নাম ধম্ম। ধম্মের কল হাওয়ায় নড়ে। আজ ফল বুঝবি ভদ্দর লোকের ছেলেদের সঙ্গে ঠেঁটামি করার। ছুঁড়ির গা-ময় ছেঁকা দিয়ে ছেড়ে দেয়, তবে আরও ভাল হয়। ছ্যাচড়া মেয়েমানুষ কোথাকার—"

কথায় কথায় অনেকটা এলাম দু'জনে। আবার বললাম, "আজ না হয় নাই গেলে বুড়ী সে বাসায়। চল আমার সঙ্গে।"

বুড়ী শুনলে না। বাসায় তাকে যেতেই হবে। অন্তত সেই মালসাটা আনতেই হবে তাকে। যে মালসায় ছাই ভরা আছে। যাতে সে রাত্রে থুথু ফেলে।

বাঁ-হাতি একটা ঘোর অন্ধকার গলির মধ্যে বুড়ী ঢুকল। কয়েক পা এগিয়েছি, পেছনে শুনতে পেলাম, "বাবাজী ও বাবাজী"।

পিছন ফিরে দেখি বুড়ী হাঁপাতে হাঁপাতে এক রকম ছুটে আসছে। দাঁড়াতে হলো।

কাছাকাছি এসে বুড়ী দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কোথায় থাকেন বাবাজী ?"

বললাম ঠিকানা—"হাড়ারবাগের গলির ভেতর ঢুকে সেই চিন্তামণি গণেশের কাছাকাছি গিয়ে ডান ধারে যে হনুমান মন্দির আছে তার পেছনের বাড়ীর একতলায়।"

বুড়ী বললে, "সেই বাড়িতে একটা গম-ভাঙ্গা কল আছে তো ? বাবাজী আপনি একটু দাঁড়ান এইখানে, আমি আপনাকে একটা জিনিস এনে দোব। দয়া করে সেটি আপনি নিয়ে যান। এখনই আনছি সেটা আমি। যাব আর আসব। আমার ঘর বাইরের দিকে। ওরা বোধ হয় সব ঘুমিয়েছে। টের পাবে না।

বুড়ী চলে গেল। এমন পা চালিয়ে গেল যে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অত বুড়ো মানুষ, দেখলে মনে হয় চলতেই পারে না, সে একেবারে ছুটছে জোয়ান মানুষের মত। তাও আবার বেড়ালের মত নিঃশব্দে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না যে ঐ লোক ও-ভাবে ছুটতে পারে।

কিন্তু কি এনে দেবে আমায়! কোনও বিপদে পড়ব না তো! যাই চলে আমিও পা চালিয়ে। কি দরকার আমার এ সব নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার। এই সব সাত পাঁচ ভাবছি, দেখি বুড়ী ফিরে আসছে সেইভাবে পা চালিয়ে হাতে কি একটা ঝুলিয়ে নিয়ে।

"ধর বাবাজী, শিগ্‌গির নিয়ে চলে যাও এটা। ওরা টের পেয়েছে যে আমি ফিরেছি। যা' থাকে আমার কপালে হোক। যদি বেঁচে থাকি কাল যাব তোমার কাছে। আমি না যাওয়া পর্যন্ত তুমি এটা খুলো না। জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় মা অন্নপূর্ণা।"

কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী ফিরে গেল।

আমি জিনিসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে পা চালালাম।

ঘরের দরজা খুলে নেকড়ায় বাঁধা জিনিসটা বসিয়ে রাখলাম টুলের ওপর। তারপর হারিকেন জ্বালতে বসেছি, পিছনে টিপ করে আওয়াজ হ'ল। বিছানার ওপর বসে ছিল আমার বেড়াল দধিমুখী, দরজা খোলা পেয়ে দিলে লাফ। তার পা লেগে টুলের ওপর থেকে সেটা পড়ল মেঝের ওপর। আলো জ্বালিয়ে দেখি ঘরের অনেকটা জায়গায় ছাই ছড়িয়ে পড়েছে। চুরমার হয়ে গেছে নেকড়ার ভেতরের মালসাটা। নেকড়া ছিঁড়ে ছাই ছিটিয়েছে ঘরময়।

ভয়ানক রাগ হ'ল বুড়ীর ওপর। আমার হাতে দিলে ওর থুথু-ফেলা ছাইয়ের মালসা। আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! বসে বসে ঝাঁটা দিয়ে ছাই জড়ো করতে লাগলাম!

আর একটা মালসা চাই এখন। এগুলো তুলে রাখতে হবে তো। বুড়ীর শ্রাদ্ধে লাগবে। আমার ডাল থাকত যে মালসায় সেটা খালি করে এনে তাতে

ছাই তুলতে বসলাম। নেকড়া খুলে ভাঙ্গা মালসা বাদ দিয়ে বাকি ছাই তুলতে গিয়ে হাতে অনেক কিছু ঠেকতে লাগল। একে একে সব আলাদা করে ফেললাম। ছুটো সোনার আংটি আর টাকা আধুলি সিকি দোয়ানিতে নগদ একশ সতের টাকা কয়েক আনা গোনা হল। সোনার আংটি ছুটো জলে ধুয়ে আলোর সামনে এনে চমকে উঠলাম। একটায় একখানি ছোট পোখরাজ বসানো, আর একটা. আংটি হাল ফ্যাশনের। ওপরে এক ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া সোনার পাত। তাতে লালে সবুজে মিনা করা রয়েছে—বহুব্রীহি। আংটিটা হাতে করে হাঁ করে চেয়ে রইলাম সেই নামের দিকে। ঠিক এই আংটিই আমি দেখেছি বহুব্রীহির হাতে। এতবড় জলজলে আংটি কিছুতেই কারও নজর এড়াতে পারে না। যাতে সকলেই নামটি পড়তে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এ জাতের আংটি হাতে দেয় লোকে। বহুব্রীহি প্রথম যে দিন হাত দেখাতে আসে সেদিন এই আংটিই আমি দেখেছিলাম তার হাতে। কিন্তু কি করে এল এ আংটি বুড়ীর থুথু ফেলার ছাইয়ের ভেতর।

কাল বুড়ী এলে হয়। তখন চেপে ধরব তাকে। কি করে পেলে সে এই আংটি? বলতেই হবে আমায়। নয়ত সোজা থানায় নিয়ে যাব বুড়ীকে। চালাকি পেয়েছে!

রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না।

পরদিন সকাল আটটার সময় হাঁস-ফাঁস করতে করতে যিনি উপস্থিত হলেন তিনি হচ্ছেন বহুব্রীহির সাড়ে তিন মন ওজনের পরিবার।

খাতির করে বসাতে গেলাম, তিনি রক্তবর্ণ চোখ পাকিয়ে বাজখাই গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বহুব্রীহি কোথায়?"

আকাশ থেকে পড়লাম, "কোথায় তা' আমি জানবো কেমন করে!"

তাঁর গলা আরও চড়ল, "জান তুমি, নিশ্চয়ই জান তার খবর। বল শিগগির কোথায় সে। নয়ত এখনই আমি থানায় যাব।"

মিনিট খানেক একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। তারপর চাদরখানা টেনে নিলাম দড়ির ওপর থেকে। বললাম, "সেই ভালো, চলুন আমিও যাচ্ছি থানায়। আমারও দরকার আছে সেখানে।"

তিনি একটু মুষড়ে পড়লেন। একটু খাটো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দরকার ?"

"তা' শুনে আপনার লাভ কি ? চলুন থানায়, সেইখানেই বলব সব—যা' জানি আমি।"

তিনি দরজা জুড়ে ধপ করে বসে পড়লেন মেঝের উপর। তারপর হাউ-মাউ করে কান্না। "আপনার দু'টি পায়ে পড়ি—বলুন আমায় যা' জানেন তার সম্বন্ধে। তার নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। অতগুলো টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড বাধিয়েছে এতক্ষণে। কেন আমি মরতে ছোঁড়াকে নিয়ে এই অলুক্ষণে কাশীতে এলাম গো—কেন মরতে এলাম এখানে ডানপিটে গোঁয়ারটাকে নিয়ে।"

তিনি কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

হঠাৎ আমার চোখের ওপর থেকে একখানা পর্দা উঠে গেল। খপ করে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, "বহুব্রীহি কে হয় আপনার ?"

"ছাই হয়, মাথা হয়, আমার পিণ্ডি চটকাবার যম হয়। কুক্ষণে দেখা হয়েছিল পোড়ারমুখোর সঙ্গে। আজ দু'-বছর আমার হাড়-মাস পুড়িয়ে খাক্ করছে। ওর মামা ছিল আমার বাবু। ওই ছোঁড়া আমার মাথা গুলিয়ে দিলে। সেই রাজার মত বাবুকে তাড়িয়ে ওর পেছনে আমি মুঠো মুঠো টাকা উড়িয়ে আজ সর্বস্ব খুইয়েছি। এখন ভালয় ভালয় ওকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। এখানে একটা বিপদ যদি ঘটায় তাহলে ওর মামা আমায় খুন করাবে লোক লাগিয়ে। ওই ভাগনের জন্যে তারা সব করতে পারে। মামারাই তো আদর দিয়ে খেয়েছে ওর মাথাটা। এবার ও আমার মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে। এখন আমি করি কি ?"

মহিলার মেজাজ ঠাণ্ডা করে আগাগোড়া সব বললাম আমি যা' জানি। সব শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আপনাকে অনেক কটু কথা বলেছি বাবা, আপনি কি করে জানবেন তার গুণ। সেদিন ওই ছোঁড়াই গিয়েছিল বুড়ীর সঙ্গে নতুন জিনিসের খোঁজে। তারপর সব কেড়ে নিয়ে ওরা তাকে তাড়িয়েছিল। বোধ হয় ঐ আংটিটা বুড়ীকে ঘুষ দিয়ে সে পালাতে পেরেছিল। নয়ত সেদিন আরও উত্তম-মধ্যম ছিল ছোঁড়ার কপালে। আপনার সঙ্গে বাড়ি গেল। আমিও খুব গালমন্দ করলুম। ওমা, তার পরদিনই গা ঢাকা দিলে হাজার দেড়েক টাকা সঙ্গে নিয়ে। এই ক'দিনে লোকজন জুটিয়ে ধরে নিয়ে গেছে সেই ছুঁড়ীকে যে তার নাকালের জন্যে দায়ী। ও হ'ল বিষকেউটের ভাগনে। রোখ চাপলে ওর হাত থেকে নিস্তার নেই। সে ছুঁড়ীর কপালে অশেষ খোয়ার আছে, এই বলে দিলুম।"

দু'জনে বসে অনেক পরামর্শ করা গেল। কোনও দিকেই কোনও কিনারা দেখতে পাওয়া গেল না। এই কাশীস্থানে হাজার হাজার গুণ্ডা বদমাইসের আড্ডায় কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে বহুব্রীহি, কে তার সন্ধান দেবে!

শেষে ঠিক হল, ইনি চলে যাবেন কলকাতায়। এখানে থেকে কি লাভ? যদি পুলিশ হাঙ্গামা বাধে তখন বাঁচাবে কে? তিনি আমায় ঠিকানা দিয়ে গেলেন—পরীবালা বাড়িউলি, দু'শ সাতান্নর-এ গরানহাটা স্ট্রীট। বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গেলেন যদি কোনও খোঁজ-খবর পাই বহুব্রীহির, তবে যেন তৎক্ষণাৎ তার করি তাঁকে। তারের খরচা আর প্রণামী মিলে কয়েকখানা দশ টাকার নোট রেখে গেলেন পায়ের কাছে।

দিন সাতেক পরে বাঙালীটোলার ভেতর মাথা নেড়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি যুবতী মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। তার দুই গালে আর শরীরের অন্য সব জায়গায় বড় বড় ফোস্কা। কেউই চিনতে পারলে না মেয়েটিকে। কেউ এগিয়ে এসে তাকে নিজের লোক বলে দাবী করলে না।

বুড়ীও আর এল না তার ছাইয়ের মালসা নিতে।

মাস চারেক পরে আংটি দুটো বেচে যা' পেলাম আর তখনও যা' কিছু নগদ ছিল সব নিয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। এবার কেদারবদরী সেরে আসি। বাবা কেদারনাথ আর প্রভু বদরীনারায়ণের দয়ায় যাওয়া-আসার খরচটা বিনা চেষ্টায় হাতে এসে গেছে। কিছুতে এ সুযোগ ছাড়া কাজের কথা নয়।

গঙ্গোত্তরীর ছাপান্ন মাইল নীচে উত্তরকাশী। বাঙলার ছেলে ভোলানাথ কালী প্রতিষ্ঠা করেছেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন এখানে তিনি। দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী বছরের পর বছর বাস করছেন উত্তরকাশীতে। গুহা আছে, কাঠের কুঠরী আছে তাঁদের বাসের জন্যে। আর আছে ছত্র। ছত্র থেকে দিনে একবার কয়েকখানি রুটি দেওয়া হয় সাধুদের। ভাদ্র মাস থেকে প্রায়ই বরফ পড়া শুরু হয়। পোষ-মাঘ মাসে কাক চিলও থাকে না উত্তরকাশীর আকাশে। শুধু জেগে থাকেন গঙ্গা আর হিমালয়। তা' ছাড়া বাতাস পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে।

সেই উত্তরকাশীতে গিয়ে পৌঁছলাম অক্ষয় তৃতীয়ার আগের দিন। বাসনা ছিল কয়েকদিন বাস করব। কিন্তু কলেরা বাধ সাধলে সে আশায়। গিয়েই জানা গেল উত্তরকাশী এলাকায় কলেরা লেগে গেছে।

সুতরাং গঙ্গোত্তরীর যাত্রীদের পত্রপাঠ বিদেয় করা হচ্ছে কলেরার টিকা ফুঁড়ে দিয়ে।

এগিয়ে চল্লাম সামনে। একদিন পরে যে চটিতে গিয়ে পৌঁছালাম সেখানে ঘরে ঘরে কলেরা। খাওয়ার তো কিছু জুটলই না। এমন কি, সে রাতটা মাথা গোঁজবার আশ্রয়ও দিতে চাইলে না কেউ। কি আর করা যায়। রাস্তার ধারে একখানা পাথরের ওপর খোলা আকাশের তলায় কম্বল পাতলাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বসে বসে ভাবছি, কিছু কাঠ পেলেও হ'ত। আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাতাম যে করে হোক। নয়ত জমে যেতে হবে যে ঠাণ্ডায়।

আমাদের দলে ছিল তিনজন লেংটি সম্বল কানফাটা নাথ সম্প্রদায়ের সাধু। তাঁরা চললেন কাঠ যোগাড় করতে।

খানিক পরে তাঁদের সঙ্গে এসে উপস্থিত এক দণ্ডীস্বামী। নাথ সম্প্রদায়ের বাবাজীরা বললেন যে, দণ্ডীস্বামী মহারাজ মৌনীবাবা। তাঁকে পাওয়া গেল পাহাড়ী বস্তিতে। আমাদের অসহায় অবস্থা শুনে নিজে এসেছেন ব্যবস্থা করতে। কাঠ চাল আটা সব আসছে এবার।

পাহাড়ী বস্তিতে দণ্ডীমহারাজ কলেরার সেবা চালাচ্ছেন একলা। এখানকার লোকে তাঁকে দেবতার মত মানে।

মুণ্ডিত মস্তক নেহাৎ অল্পবয়সী দণ্ডীমহারাজের দয়ায় সে রাত্রে আমরা রক্ষা পেলাম। কাঠ এল, বড় বড় ধুনি জ্বালা হ'ল কয়েকটা। একটা ধুনির পাশে তিনি মৃগচর্মের ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে রইলেন সারা রাত।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। হঠাৎ নজর পড়ল দূরে বসা দণ্ডী মহারাজের দিকে। চোখ বুঁজে স্থির হয়ে বসে আছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না তাও বোঝা যায় না। আগুনের আলো পড়েছে মুখের ওপর। একটি পরম নিশ্চিন্তার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মুখে।

দেখতে দেখতে কেমন ধাঁধা লেগে গেল। কে এ! ঐ মুখ তো আমার বেশ চেনা মনে হচ্ছে। কে ইনি? কোথায় দেখেছি একে?

আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। চিনেছি তো দণ্ডী মহারাজকে। কিন্তু কৈ, কোথায় গেলেন তিনি?

ছুটলাম দূরের পাহাড়ী বস্তিতে।

তাঁকে দেখতে পেলাম। একটি কলেরা রোগীর ময়লা পরিষ্কার করছেন দু'হাতে।

তিনিও আমায় দেখতে পেলেন। খুশির ঝলক ফুটে উঠল তাঁর দুই চোখে। প্রথমে হাত জোড় করলেন। তারপর হাত নেড়ে ইশারা করলেন

চলে যেতে। তারপর নিজেই চলে গেলেন সেখান থেকে আর এক ঘরে আর এক রোগীর পাশে।

আমিও ঘুরতে লাগলাম মুখ বুঁজে তাঁর সঙ্গে। মায়ের মত সেবা করছেন রোগীদের। নিজের হাতে সব পরিষ্কার করছেন। গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আর করবেনই বা কি ? ওষুধও নেই, পথ্যও নেই।

দণ্ডীস্বামী আবার হাত জোড় করে ইশারা করলেন ফিরে যেতে। মাথা নত করে প্রণাম করে ফিরেই এলাম। আমার যে তীর্থ করা শেষ হয়নি তখনও।

তারপর যথা সময়ে কাশীতে ফিরে এসেছি উত্তরাখণ্ডের চারধাম দর্শন করে। গরানহাটার বাড়িউলির অনেক চিঠি এসে জমে আছে। একখানারও উত্তর দিইনি। অবশ্য লিখতে পারতাম, উত্তরকাশীতে এক দণ্ডীস্বামীকে দেখেছিলাম। যাঁকে দেখতে হুবহু বহুব্রীহির মত। এবং তিনিও আমায় চিনেছিলেন। কিন্তু কি লাভ হবে সে কথা জানিয়ে গরানহাটায়। উত্তরকাশীতে তো তখন শুধু বরফ পড়ছে। যাবে কে সেখানে ?

কাকবন্ধ্যা

বেলা দুটো বাজল।

লালগোলা ঘাটের গাড়ি আসছে এবার। দু'দিকের লাইন ক্লিয়ার দেওয়া হয়েছে। এ গাড়িখানা বেলঘড়িয়ায় থামে না। প্ল্যাটফরমের ওপর ভিড় নেই। একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন একখানা বেঞ্চিতে।

অনেকক্ষণ তিনি বসে আছেন। বারটা-পঁয়তাল্লিশে যে ট্রেনখানা কলকাতা থেকে এসেছে, সেই গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে না গিয়ে কোনও রকমে নিজের দেহখানি টেনে এনে একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন। সেই থেকে একভাবে বসে আছেন ঘাড় হেঁট করে নিজের জুতোর ডগায় লক্ষ্য রেখে।

এঁর বেশ বাস দারিদ্র্যের পরিচয় দেয় না—সুরুচি ও ভদ্রমনের পরিচয় দেয়। চোখ ধাঁধানো রঙের জলুস নেই তাঁর রূপে—কিন্তু লাবণ্য শ্রী যথেষ্ট আছে। এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই, পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার গরজ নেই। নেহাতই ভদ্র গৃহস্থ ঘরের একটি ভাল মানুষ বউ। কাজেই কেউ ডেকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেনি তাঁকে। প্ল্যাটফরমের কনেষ্টবল, রেলের লোকেরা, পানওয়ালা সকলেই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কোনও কথা বলেনি।

দূরে দেখা গেল ট্রেনখানা।

এতক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা মুখ তুললেন। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সেই দিকে যে দিক থেকে গাড়ি আসছে। তারপর বেশ চেষ্টা করে খাড়া করলেন নিজেকে। দু'পা এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। কে একজন বললে, এ গাড়ি থামবে না এখানে। শুনে তাঁর কপাল কুঁচকে উঠল। কি আপদ—এখানা আবার থামবে না এখানে। দু'পা পিছিয়ে এসে ফের বসে পড়লেন বেঞ্চির ওপর।

কাছে এসে পড়েছে গাড়ি। একটানা কানফাটা চীৎকার করছে ইঞ্জিনের বাঁশী। হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন মহিলাটি। দপ করে আলো জলে উঠল তাঁর দুই চোখে। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ইঞ্জিনটার দিকে। হু-হু করে ছুটে আসছে বেশ দুলতে দুলতে। অন্যমনস্ক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেঞ্চি ছেড়ে—দু'পা এগিয়ে গেলেন সামনে।

পূর্ণ বেগে প্ল্যাটফরমে ঢুকল ট্রেনখানা। প্ল্যাটফরমের ওপর যারা ছিল তারা চেয়ে আছে গাড়ির দিকে। চক্ষের নিমেষে প্ল্যাটফরম ছেড়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

সামনেই লাইনের ওপর পড়ে রইল রক্ত মাখা কয়েক খণ্ড মাংস। কনুই পর্যন্ত দু'খানি হাত ছিটকে পড়েছে ও পাশের লাইনের ওপর। হাত দু'খানিতে রয়েছে সোনার চুড়ি, কঙ্কন, সোনা বাঁধানো শাঁখা। গোটা দুই আংটিও রয়েছে এক হাতের আঙুলে। মুখ মাথার ওপর দিয়ে বোধ হয় চলে গেছে চাকা। বাদ বাকি সবই এমন বিশ্রী ভাবে তালগোল পাকিয়ে গেছে যে রক্তমাখা কয়েকটা মাংসের ডেলা ভিন্ন আর কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

* * *

কলকাতা থেকে সেই ট্রেনেই ফিরছে প্রশান্ত চৌধুরী। প্রথম শ্রেণীতে নরম গদির ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়েছে সে। ঠোঁটে ষ্টেট এক্সপ্রেস গোঁজা। আলস্য বশতঃ ধরানো হয়নি তখনও। এ ধারে যিনি বসেছিলেন, তাঁর নজর ছিল বাইরে। বলে উঠলেন, "মাই গড, কে একজন আত্মহত্যা করলে!"

নিস্পৃহ কণ্ঠে টিপ্পনী কাটলে প্রশান্ত, "যত সব নোংরা ব্যাপার! হামেশা এই রকম হচ্ছে আজকাল। ট্রেনের তলায় লাফিয়ে পড়া একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। আগে থেকে জানতে পারলে ওদের ধরে চাবকে লাল করে দেওয়া উচিত।" উঠে বসে সিগারেট ধরালে প্রশান্ত।

এরপর আলোচনা আরম্ভ হোল মনঃসমীক্ষণ, দুঃখবাদ ইত্যাদি মানস বিজ্ঞান নিয়ে। শেষে যা' হয়ে থাকে তাই হোল, আলোচনা গড়াল সেক্স

পর্যন্ত। ব্যারাকপুরে এসে দাঁড়াল গাড়ি। প্রশান্ত সহযাত্রীকে মাথা হেলিয়ে, "আচ্ছা আবার দেখা হবে" বলে নেমে গেল তার মূল্যবান ছোট ব্রিফকেশটি বগলে চেপে।

ব্যারাকপুরের বিখ্যাত সোহিনী-বিতানের সভ্য সভ্যারা কোথায় ফাংশন করতে যাচ্ছিলেন। লালগোলা ছেড়ে দিয়ে সবাই ঘিরে দাঁড়াল প্রশান্তকে। এক সঙ্গে এক রাশ প্রশ্ন ছিটকে পড়তে লাগল তার মুখের ওপর।

"কি হোল প্রশান্তদা? বড়ে গোলাম আলি সাহেবকে পাওয়া যাবে তো? রবিশঙ্কর কবে পৌঁছবেন কলকাতায়? শচীন কর্তা কি উত্তর দিলেন আপনাকে? মুন্না খাঁ এসে গেছেন না কি? ভূপালী দেবী কত দক্ষিণা চাইলেন? টাকার ব্যবস্থা কতদূর করতে পারলেন?"

প্রশান্ত সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে হাসি মুখে। বললে, "হবে হবে। সবই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। এত আগে থেকেই ভাবছ কেন তোমরা।"

সোহিনী-বিতানের সম্পাদিকা সাহানা দেবী এগিয়ে এলেন সামনে। বিনা ভনিতায় হাত পাতলেন।

"মনে হচ্ছে আজ বেশ কিছু আছে প্রশান্তদার পকেটে। অনেক দিন কিছু হয়নি, আজ হয়ে যাক। আমরা ফাংশনে যাচ্ছি, যাত্রাটা শুভ হোক।"

আর একবার প্রশান্ত সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে সকলে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে তার দিকে। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল। বললে, "সেই ভাল কথা। যাত্রা তোমাদের শুভ হোক। সোহিনী-বিতানের জয় হোক।" বলতে বলতে ডান দিকে একটু হেলে প্যাণ্টের বাঁ পকেটে হাত চালিয়ে এক তাড়া নোট বার করলে। পাঁচখানা নোট নিয়ে বাকিগুলো আবার গুঁজলে পকেটে। তারপর নোট ক'খানা বাড়িয়ে ধরলে ওদের দিকে।

সকলে হৈ হৈ করে উঠল। সাহানা দেবী ধরলেন নোট ক'খানা। প্রশান্ত এগুলো সামনে। তটস্থ হয়ে পথ ছেড়ে দিলে সকলে। লম্বা পা ফেলে প্রশান্ত বেরিয়ে এল ষ্টেশন থেকে মুখে চোখে সকৌতুক হাসি নিয়ে।

রিক্সাওয়ালা ছুটে এল। যার গাড়িতে পা দেবে প্রশান্ত নগদ এক টাকা পাবে সে।

গঙ্গার ধারে ছোট্ট একটি বাঙলোতে থাকে চৌধুরী সাহেব। সমস্ত রিক্সা-ওয়ালা চেনে তার ছবির মত বাঙলোখানি। আসতে যেতে একটাকা করে পায়। টাকাটা দিয়ে কখনও পিছন ফিরে তাকায় না সাহেব। গাড়ি সে করেনি। কেউ সেকথা তুললে বলে, "খামকা পয়সা খরচ করে হাঙ্গামা কেনা আর লোকের চক্ষুশূল হওয়া। বেশ আছি যতদিন আমার রিক্সাওয়ালারা আছে। ওরা যখন থাকবে না তখন দু'খানা পা আছে।"

উষা কিন্তু গজগজ করে।

"গাড়ি বাড়ি সবই তোমার কাছে হাঙ্গামা। মাসে মাসে গুচ্ছের করে টাকা নিচ্ছে বাড়িওয়ালা। ট্যাক্সি আর রিক্সা খাচ্ছে যে টাকা তাতে তিনখানা গাড়ি রাখা যায়। সবই যদি হাঙ্গামা. তাহলে আমার মত একটা জ্যান্ত হাঙ্গামায় কেন জড়াতে গেলে নিজেকে!"

কেন!

এক এক সময় নিজেই আশ্চর্য হয়ে ভাবে প্রশান্ত। মনের মত একটা জুতসই জবাব আজও খুঁজে পায়নি সে। নেশা, তার জীবনের একমাত্র নেশা হচ্ছে উষা। স্বপ্নের জাল বোনে সে উষাকে ঘিরে। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের চূড়ায় একখানি ছোট সাদা রঙের বাড়ি। নাম উষসী। সেদিন প্রশান্তর জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা কিছু থাকবে না। কূল পেয়েছে সে তখন। উষাকে আঁকড়ে ধরে কূলে উঠতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। সেই পাহাড়ের চূড়ায় উষাকে পাশে নিয়ে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে দেখবে পায়ের তলায় সমুদ্রের নিস্ফল আস্ফালন। ক্ষুব্ধ আক্রোশে বার বার আছড়ে পড়ছে সমুদ্র। মাথা খুঁড়ে মরছে প্রশান্তর নাগাল পাওয়ার জন্যে। প্রশান্ত সে দিন সবাইয়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে গেছে।

সেই কথাই অনেকবার বুঝিয়েছে উষাকে।

"আর কিছুটা দিন সবুর কর। রাশিকৃত টাকা ছড়িয়ে রয়েছে। একবার সব গুছিয়ে তুলেনি তারপর চলে যাব বোম্বাই। এখানে ব্যবসা করা পোষাবে না। ছ্যাঁচড়ার হদ্দ সব ব্যাটা। টাকা আদায় করতে যে কি হুজ্জত-হাঙ্গামা পোয়াতে হয়! মানুষে কারবার করতে পারে এখানে!"

সেই আশাতেই আছে উষা। বোম্বাই না গেলে যে তাদের বাড়ি গাড়ি কিছুই হবে না এ ধারণা তার মনেও শিকড় গেড়েছে। কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া হয়ে ওঠে না সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে। এত টাকা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে, গুটিয়ে নিতে সময় লাগবে তো।

গুটিয়েই নিচ্ছে সব প্রশান্ত চৌধুরী।

আজকাল প্রায়ই পাঁচ সাতশ' হাজার দেড় হাজার নিয়ে ফিরছে। ব্যাঙ্কে রাখে না টাকা। গডরেজের একটা শক্ত ক্যাশ বাক্স কিনে দিয়েছে উষাকে। তাতেই উষা গুণে গুছিয়ে তুলে রাখে টাকা। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা মানে লোককে জানানো—কত টাকা আছে। কি দরকার পাঁচকান করে। তেড়ে আসুক ইন্‌কামট্যাক্সওয়ালারা।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে উষা, "আর কত টাকা পড়ে আছে বাজারে?"

হাসে প্রশান্ত। রহস্যময় হাসি হাসে। বলে, "অফুরন্ত, অঢেল, দেদার, কে তার হিসেব রাখে।"

কথা শুনে গা জ্বলে যায় উষার। এমন খামখেয়ালী লোক আছে ত্রিভুবনে! পাঁচ বছর ব্যবসা করছে। আনছে—আময়দা খরচ হয়ে যাচ্ছে। হিসেবও রাখে না কত টাকা আছে লোকের কাছে।

উষাই প্রশান্তকে নামিয়েছিল ব্যবসায়। চাকরি করছিল তখন প্রশান্ত দিল্লীতে। কলকাতায় মেয়েদের হোষ্টেলে থাকত উষা, কলেজে ঢুকেছিল বি-এ পড়বার জন্যে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না অন্য কিছু। যুদ্ধ চলছে তখন। সেই ডামাডোলের বাজারেও বউ নিয়ে দিল্লীতে থাকবার স্থান হয়ত জুটত। কিন্তু চারশ' টাকা মাইনেতে বাড়ি ভাড়া আর খাওয়া কুলিয়ে উঠত না। ন'

মাসে ছ' মাসে দু'দিনের জন্য চলে আসত প্রশান্ত কলকাতায়। বউকে হোস্টেল থেকে নিয়ে এসে উঠত হোটেলে। নাকের জলে চোখের জলে কোথা দিয়ে পালিয়ে যেত দুটো দিন। তারপর হাওড়ায় প্রশান্তকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ফোলা চোখমুখ নিয়ে ফিরে আসত উষা হোস্টেলে। অসহ্য হয়ে উঠল উষার। ধরে বসল প্রশান্তকে, চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামতে হবে। কত লোক লাল হয়ে গেল ঠিকাদারী করে! চারশ' টাকার মাইনের মুখে মার ইয়ে।

শেষ পর্যন্ত ইয়েই মারা হল চাকরির মাথায়। উষার গায়ের গয়না ক'খানা বেচে নামল প্রশান্ত ঠিকাদারী করতে। দু'মাসের ভিতর ফ্ল্যাট ভাড়া করলে কলকাতায়। বি-এ পড়ার মাথায়ও ইয়ে মেরে উষা এসে উঠল সেই ফ্ল্যাটে গিন্নী হয়ে। হগ মার্কেটে মার্কেটিং করে, সাহেব পাড়ায় সিনেমা দেখে, বান্ধবীদের চা খাইয়ে স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠল উষার। কিন্তু স্বপ্ন দেখার তো সীমা নেই কোথাও। কাজেই তারপর আরম্ভ হ'ল লাল হয়ে ওঠবার স্বপ্ন দেখা। কিন্তু যুদ্ধ গেল থেমে।

অথচ স্বপ্ন দেখাটা থামল না কিছুতেই।

তারপর ওরা চলে এল ব্যারাকপুরে।

গঙ্গার ধারে ছোট্ট বাগান ঘেরা বাঙলোখানি। গেটে পেতলের প্লেট লাগানো হ'ল—চৌধুরী এণ্ড কোং, কনট্রাক্টর এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার।

মিষ্টার এণ্ড মিসেস চৌধুরী সার্বজনীন পূজায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দশ বিশ পঞ্চাশ একশ' দিতে লাগলেন অকুণ্ঠ চিত্তে। কলকাতা হচ্ছে মানুষের জঙ্গল। সেখানে কেউ কারো চোখে পড়ে না সহজে। কিন্তু ব্যারাকপুর এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে অনেকটা। সহজেই সকলের নজরে পড়ে এই হাসি-খুশি স্বামী-স্ত্রীর দিকে। ডাক পড়তে লাগল সব ব্যাপারে। কিন্তু ওরা জানত সম্ভ্রান্ততা বজায় রাখতে হলে অতি অমায়িকভাবে ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলা চাই। দূরত্ব বজায় রেখে চলার আর্টটা ভাল করে রপ্ত থাকা দরকার যদি মর্যাদা বজায় রাখবার বাসনা থাকে। বিশেষতঃ দু'দিন পরে যারা লাল হয়ে উঠতে

চলেছে, তাদের এখন থেকেই হলদে পাঁশুটে বেগুনী নীল রঙগুলো এড়িয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন।

কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার প্রবৃত্তিও নেই ওদের। আপনার লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে যে দগদগে ঘা খানা নিয়ে এসেছে তা' আর জীবনে শুকাবে না কোনও দিন। গভীর রাত্রে ছ'মাসের ছেলেটাকে বুকে নিয়ে একলা শ্মশানে গিয়েছিল প্রশান্ত। একলা বাড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল উষা। পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজন নিজেদের দরজায় খিল এঁটে বসে রইল। কেউ এসে বউটাকে হাত ধরে তুলে বসায়নি। পরদিন শ্মশান থেকে ফিরে এসে উষাকে তোলে প্রশান্ত। বাপ পিতামহের ভিটেতে সকলের অবহেলা অত্যাচার গ্রাহ্য না করে মুখ বুজে পড়েছিল এক বছর। হাসি মুখে সমস্ত সহ্য করেছিল উষা। না করেই বা উপায় কি তখন—দাঁড়াবে কোথায়? উষার বাবা নাম করা প্রফেসর। তিনি সোজা বার করে দিলেন মেয়েকে বাড়ি থেকে। অবশ্য বাপের কথায় রাজী হলে তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে হ'ত না। তিনি চেয়ে ছিলেন মেয়ে কাশী চলে যাক। গর্ভে যেটা এসেছে সেটা নষ্ট করে ফিরে আসুক। তখন শান্তিতে বিয়ে থা দেবেন মেয়ের। উষা বসল বেঁকে। প্রশান্তকে জানালে সব কথা। প্রশান্ত তার চওড়া বুকখানা দেখিয়ে বললে—আগামীকাল সকালে সোজা চলে যাবে শিয়ালদা। গিয়ে সুরমা এক্সপ্রেসে চেপে বসবে। দেখেছ আমার বুকের ছাতি! এখানে স্থান তোমার আর তোমার ছেলের। অন্য কোথাও নয়। তাই করেছিল উষা। তার ফলে বাপ মা রটালেন—মেয়ে যমের বাড়ি গেছে।

যমের বাড়ি নয়—উষা প্রশান্তর হাত ধরে এসে উঠল তার শ্বশুরের ভিটেতে। শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ফেলে দিতেন না তাকে কায়স্থের মেয়ে বলে। তাকে ফেলতে হলে যে তার পেটে তাঁদের যে নাতি রয়েছে, তাকেও ফেলে দিতে হ'ত। এ তাঁরা কিছুতেই পারতেন না। প্রশান্তর বাপ মা অমন হতেই পারতেন না।

বাড়ি বাগান পুকুর ধানজমি বাপ পিতামহের এতবড় সম্পত্তি ছেড়েই বা দেবে কেন প্রশান্ত! রাজীবলোচন চৌধুরীর একমাত্র ছেলে সে। আড়াই বছর বয়সে তার মা মারা যান। বড় দুঃখে মাতৃহীন শিশুটিকে মানুষ করেছিলেন চৌধুরী মশায়। সিলেটে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে এল প্রশান্ত। রাজীবলোচন পড়ে রইলেন দেশে। বুক দিয়ে সব রক্ষা করতে লাগলেন ছেলের জন্যে। এম-এ পাশ করে ফিরে এসে ছেলে বসবে বাড়িতে। কখন কারও দরজায় চাকরির জন্যে যেতে হবে না ছেলেকে সে ব্যবস্থা করেছিলেন চৌধুরী মশায়। ছেলে এসে বাড়িতে বসলে তিনি বেরুবেন তীর্থ করতে। সেই সঙ্গে খুঁজে আনবেন তাঁর বউমাকে। এইসব সঙ্কল্প ছিল তাঁর মনে। কিন্তু ডাক এসে গেল হঠাৎ। কুড়ি বাইশ বছর আগে যে স্ত্রী রওনা হয়ে গেছেন তাঁকে ধরবার জন্যে তিনিও রওনা হলেন একদিনের জ্বরে। দেশে গিয়ে শ্রাদ্ধ শান্তি করে কাকা খুড়োদের হাতে সম্পত্তি সঁপে দিয়ে ফিরে এল প্রশান্ত কলকাতায়। তাঁরা স্বর্গ পেলেন হাতে। রাজীবলোচন বেঁচে থাকতে একটি কাণাকড়িও ছুঁতে দেননি কাউকে। এইবার সুযোগ দিলেন ভগবান। বোকা ছেলেটাকে মাসে মাসে একশ' দেড়শ' টাকা পাঠিয়ে বাকি সমস্ত লুটে পুটে খেতে লাগলেন তাঁরা।

কিন্তু ওঁদের সে সুখে বাদ সাধলে উষা। আচম্বিতে একদিন উষাকে নিয়ে উঠল প্রশান্ত বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে সকলের দু'টি চক্ষের শূল হয়ে উঠল মেয়েটি। তারপর যখন কিছুই না লুকিয়ে ছাপিয়ে সকলের সামনে প্রশান্ত নিজ মুখে কবুল করলে যে উষা কায়স্থ কন্যা, তার বাপ মায়ের অমতে সে উষাকে বিয়ে করে এনেছে, তখন ঘৃতাহুতি পড়ল আগুনে। একটি লোকও তার চৌকাঠ মাড়ালে না আর। যে দূর সম্পর্কের বিধবা পিসিটি ত্রিশ বছরের বেশী কাটিয়েছেন প্রশান্তদের সংসারে—তিনিও কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

'ওরে রাজু ভাইরে—কি সর্বনাশ করলে তোর ছেলে একবার দেখে এস

ভাই! বাপ চোদ্দ পুরুষের নাম ডুবিয়ে বংশের মুখে কালি লেপে কার মেয়ে এনে ঘরে তুললে দেখ একবার!"

তখন কতই বা বয়স ছিল ঊষার। কুড়িতেও পৌঁছোয়নি বোধ হয়। প্রশান্ত তাকে নিজের চওড়া বুকের ওপর জাপটে ধরে কান্না থামিয়েছিল সেদিন। বলেছিল, "কাঁদছ কেন তুমি! তোমার কি বিশ্বাস—সত্যিই বংশের মুখে কালি লেপে দোব আমি তোমাকে ফেলে দিয়ে। এই বংশের বউ তুমি, এই বংশের ছেলে তোমার পেটে। চৌধুরীদের ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছ। যা' রেখে গেছেন আমার বাবা—তাতে তাঁর ছেলের বউকে কোনও দিন কারও কাছে হাত পাততে হবে না। আর আমিও এখনই মরছি না। তবে তুমি কাঁদছ কেন মিছামিছি?"

অনেক পরে চোখের জল শুকিয়েছিল সেদিন ঊষার। তারপর ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল কিছুতেই চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছাড়বে না। কারও কথার জবাব দেবে না। সকলের কাছে নত হয়ে চললে একদিন সব গণ্ডগোল নিভে যাবে। নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে ওরা সকলের মন জয় করবে। ডোম চাঁড়াল মুচিরাও তো রয়েছে গ্রামের একধারে। ওরাও সেই রকম সবায়ের নীচু হয়েই থাকবে।

কিন্তু ভুল ওদের একদিন ভাঙল। হাড়ে হাড়ে টের পেলে, ডোম চাঁড়াল মুচিদের জন্যে ডোম চাঁড়াল মুচিরা আছে। কিন্তু ওদের কেউ নেই। মরা ছেলে বুকে নিয়ে শ্মশানে যেতে হয়—একলা ঘরে বউকে ফেলে রেখে। এতবড় বিপদেও কেউ দরজা খোলে না। এভাবে কেউ বাঁচতে পারে কোথাও!

সাতদিন পরে কাজীডাঙ্গার জোতদার বাড়ির বড় হাজী সাহেব লোকজন নিয়ে এসে চৌধুরী বাড়িতে উঠলেন। মাত্র বিশ হাজার টাকায় বাড়ি বাগান জমি জায়গা সব বেচে দিয়েছে প্রশান্ত। হাজী সাহেবের লোকেরাই নৌকা করে পৌঁছে দিলে ওদের দু'জনকে সিলেটের বাস অফিসে। ছুটল বাস পাহাড়ের ওপর শিলংয়ের রাস্তায়। সম্বন্ধ চুকে গেল জন্মভূমির সঙ্গে প্রশান্তর চিরদিনের মত।

শিলং চেরাপুঞ্জি।

আকাশে পাহাড়ে আলোয় আঁধারে মান অভিমানের খেলা চলে সেখানে। নীলাম্বরী ওড়না জড়িয়ে নিঃশব্দে নেমে আসে আকাশ, পাহাড়ের গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপটি করে। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পাহাড়, আবেশে চোখ বুঁজে আসে তার। এমন সময় ফিস-ফিসিয়ে শুনিয়ে যায় বাতাস তার কানে কানে—ওকে বিশ্বাস কোর না, আবার পালিয়ে যাবে এখনই। শুনে মুখ কালো হয়ে ওঠে পাহাড়ের। থমথম করতে থাকে তার চোখের দৃষ্টি। তখন তার ঝাঁকড়া চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে আকাশ। অনেকক্ষণ পরে হাসি ফুটে ওঠে পাহাড়ের মুখে, খুশির আলো ঝলমল করে ওঠে তার চোখে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যায় আকাশকে। আর সেই মুহূর্তে আকাশ পালিয়ে যায় মুচকি হেসে অনেক—অনেক দূরে—একেবারে ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে!

এই নিয়েই ওখানে কাটছিল ওদের দিন। আরও কিছুদিন হয়ত কাটত নিশ্চিন্তে, কিন্তু বন্ধুবান্ধব জুটে গেল অনেক। সিলেটের লোকে শিলং বোঝাই। চেনা শোনা অনেকে আবিষ্কার করে ফেললে ওদের। আদর আপ্যায়ন হৈ হুল্লোড়ের বান ডাকল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা, মনের মেঘ কেটে গেল। দেশের লোক কখনও পর হতে পারে! গ্রামে শুধু গোঁড়ামি, স্বার্থবুদ্ধি আর অশিক্ষা। এঁরাও তো তার দেশেরই লোক, আপন জন এক রকম। কৈ—এঁরা তো তাদের দূরে ঠেলে দিলেন না। সব জেনে শুনেও নিমেষের মধ্যে আপনার করে নিলেন।

নিলেন এবং আরও আপনার করে নেবার চেষ্টা যখন আরম্ভ হ'ল তখন আর একবার চোখ ফুটল।

মিঃ দস্তিদার বড় ঘরের ছেলে। বহু বন্ধুবান্ধব নিয়ে জমিয়ে থাকেন শিলং-এ। দু'দিনে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি। সব সময় মুখে বৌদি

আর প্রশান্তদার কথা। তা' ছাড়া অনেক রকম ব্যবসার প্ল্যান ছিল তাঁর মাথায়। একটা কোনও ব্যবসাতে তো নামতে হবে প্রশান্তকেও, নয়ত চলবে কেমন করে। কাজেই দস্তিদারের সঙ্গে ব্যবসার মতলব চলতে লাগল। কিন্তু ব্যবসা ছাড়াও আর একটি মতলব ছিল দস্তিদারের মনে। সেটি হাসিল করবার সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি। মিলেও গেল সে সুযোগ একদিন।

সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে সেদিন। বেলা ছুটোর সময় মিঃ দস্তিদারের লোক একখানা চিঠি নিয়ে এল। দস্তিদার লিখেছেন, প্রশান্তকে তখনই চলে আসবার জন্যে। কে একজন বড় লোক খাসিয়া আসছে দস্তিদারের কাছে। লোকটার মস্ত বড় কমলার চাষ। তার সঙ্গে পাকাপাকি কথাবার্তা শেষ করে ফেলতে হবে, যাতে সামনের মরসুমেই কমলা চালান দেওয়া যায় কলকাতায়।

বর্ষাতি চাপিয়ে বেরুল প্রশান্ত। উমা বললে, "বেশী দেরি কোর না যেন। একে এধারে লোকজন নেই তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে! একলা বেশীক্ষণ আমি থাকতে পারব না কিন্তু।"

প্রশান্ত বললে, "বেশী দেরি হবে কেন—আর যদি দেরি হয়ই, দস্তিদারের গাড়ি পাঠিয়ে দেব। চলে যেও ওখানে বাড়িতে চাবি দিয়ে।"

রাস্তায় বেরিয়ে প্রশান্ত একখানা ট্যাক্সি পেল না। বেশ কিছুক্ষণ চড়াই উৎরাই ভেঙে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একখানা গাড়ি। দস্তিদারের বাড়ি পৌঁছাল যখন, তখন প্রায় চারটে বাজে। দস্তিদারের চাকর তাকে বসালে ঘরের মধ্যে। বৈদ্যুতিক চুল্লীটা জ্বালিয়ে দিলে। বললে—"সাহেব বেরিয়েছেন, এখনই ফিরবেন। আপনাকে বসতে বলে গেছেন। আর এই চিঠি লিখে রেখে গেছেন।"

চিঠি পড়ে দেখলে প্রশান্ত। এখনই ফিরবে দস্তিদার। খাসিয়াকে হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গেছে। একটু আধটু পেটে পড়লে লোকটার মন মেজাজ খুলবে। অনুরোধ জানিয়েছে দস্তিদার, প্রশান্ত যেন চলে না যায়। লোকটার সঙ্গে কমলালেবুর ব্যবসা সংক্রান্ত সব কথা আজই শেষ করে ফেলার দরকার।

আধ ঘণ্টা কাটল। কফি দিয়ে গেল দস্তিদারের চাকর। কফি ঢেলে কাপটা মুখে তুলছে প্রশান্ত—ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল উষা।

মিঃ দস্তিদারকে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে এসেছে সে।

ফিরে এল প্রশান্ত উষাকে নিয়ে। ঘরের তালা খুলে দিলে। ঘাড় হেঁট করে দস্তিদার বেরিয়ে গেল। একটি কথাও বললে না প্রশান্ত ওকে। উষাকে বোঝালে—ভদ্রলোকের ছেলে—যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। গায়ে হাত দিলে কিংবা পুলিশ ডাকলেই লোককে শিক্ষা দেওয়া হয় না। জীবনে আর কখনও করবে না এমন কাজ, যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে।

মনুষ্যত্ব ছিল বৈ কি! তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিনই। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিলে। ভদ্রলোকের ছেলেদের ভুলিয়ে ভুলিয়ে ধরে এনে ফাঁসাবার চেষ্টা করা তাঁর বাড়িতে থেকে চলবে না। চেনাশোনা সবাই একেবারে কথা বলা বন্ধ করলে। বৃদ্ধরা বলাবলি করলেন, চৌধুরী বংশের ছেলের এতটা অধঃপতন তাঁরা ভাবতেই পারেন না। একটা বদ মেয়েমানুষকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের পেছনে লেলিয়ে দেওয়া—ছি-ছি-ছি। খুব বেঁচে গেছে আমাদের দস্তিদার। সোনার টুকরো ছেলে বলেই বেঁচে গেছে।

শিলং থেকে পালালে ওরা। এধারে বাড়ি-সম্পত্তি বেচা বিশ হাজার অনেক কমে গেছে। প্রশান্তকে চাকরি খুঁজতে হ'ল দিল্লীতে। যুদ্ধের বাজারে একেবারে চারশ' টাকা মাইনে। উষাকে কলকাতায় কলেজে ভর্তি করে হোষ্টেলে তুলে দিয়ে প্রশান্ত দিল্লী চলে গেল।

তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নামতে হ'ল উষার জন্যেই। লাল হয়ে উঠতে হবে। বাড়ি গাড়ি টাকা—এত টাকা যে পাহাড়ের চূড়ায় ঘর বাঁধা যায়। সেখানে নাগালই পাবে না লোকের নিন্দা চর্চা অসম্মান। সমাজের চূড়ায় তুলে দিতে হবে উষাকে। হ্যাঁ, উষার জন্যেই সমাজের মাথায় উঠে যাবে প্রশান্ত। তখন গ্রামের সেই ছোট লোকেরা আর শিলং-এর দস্তিদাররা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে দূর থেকে। হতভাগা কুকুরের দল—

হাতে বাঁধা সাড়ে সাতশ' টাকা দামের ঘড়িটার দিকে একবার নজর দিলে প্রশান্ত। পাঁচটা বেজে গেল। কিন্তু এখনও ফিরছে না কেন উষা। গেল কোথায়? নিশ্চয়ই সিনেমায়। চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোর মাইজী কখন বেরিয়েছে রে ব্যাটা জাম্বুবান সিং?"

"বরাব্বর ন বাজকে সাঁইত্রিশ মিনিট পর হুজুর।"

সাড়ে নটার সময় বেরিয়েছে! তার মানে? সেই সকালে, গেল কোথায় আবার? ভুরু কুঁচকে ভেবে নিলে একটু সে। আবার জিজ্ঞাসা করলে, "কেউ এসেছিল নাকি রে? কারও সঙ্গে গেছে তোর মাইজী?"

"নেহি হুজুর। কোই নেহি আয়া—মাইজী কোইকো সাথ নেহি গিয়া।"

আর একটা সিগারেট ধরালে প্রশান্ত। নাঃ এবার একটু সাবধান করতে হবে উষাকে। কি দরকার একলা ঘুরে বেড়াবার! কত রকমের লোক আজকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। কাজকর্ম তো নেই। টো টো করে ঘুরছেন শ্রীমতী।

টো টো করে ঘুরছে কথাটা মনে হতেই আপন মনে হেসে উঠল প্রশান্ত। এই তো সেদিন বলে মনে হচ্ছে, টো টো করেই ঘুরে বেড়াত ওরা দু'জনে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঠিক দুপুর রোদে। শুধু রোদে কেন, ঝড় জল বৃষ্টি হলে আরও সুবিধে। বৃষ্টির দিন একখানা রিক্সার মধ্যে বসে সামনে পর্দা চাপা দিয়ে যেখানে খুশি হুকুম দাও। যাবে রিক্সাওয়ালা টুং টুং করতে করতে! কলকাতার রিক্সাওয়ালারা জানে সব কিছু। মুখ দেখে আর বয়স দেখে চিনতে পারে। ওরা জানে, হাতে বই খাতা নিয়ে দুপুর বেলা বিশেষ বয়সের দু'জন একসঙ্গে রিক্সা চাপতে আসে আর পাঁচ মাইল দূরের ঠিকানার নাম করে। তবে তাদের উদ্দেশ্য ঠিকানায় পৌঁছান নয়। পর্দা চাপা রিক্সার মধ্যে বসে সকলের একটু চোখের আড়াল হওয়া। তা' ভিন্ন অন্য উপায়ও নেই কিছু। হোটেলে ঘর ভাড়া করতে গেলে সাহস দরকার, টাকা পয়সাও চাই, তারপর

পাঁচজনের নজরে পড়তে হবে। তার চেয়ে চলন্ত রিক্সার মধ্যে যা' দু'এক ঘণ্টা পর্দার আড়ালে কাটানো যায় সেটুকুর মূল্যও কিছু কম নয়।

হাসিতে পেট ফুলতে লাগল প্রশান্তর সেই সব দিনের ঘটনাগুলো মনে পড়তে। যেদিন প্রথম সে উষাকে রাজী করালে রিক্সায় চড়তে। সারাক্ষণ উষা থরথর করে কাঁপতেই লাগল তার বুকে রিক্সার ভেতর বসে। না তুললে মুখ, না বললে একটি কথা। কোথায় গেল সেদিন তার অনর্গল ছলছলানি আর বকবক করা আর কোথায়ই বা গেল তার সেই ফাজলামি দুষ্টুমি। যখন থামল গিয়ে রিক্সা শ্যামবাজারের মোড়ে—তখন একটিও কথা না বলে একবার তার দিকে ফিরেও না চেয়ে দৌড়ে গিয়ে ট্রামে উঠে বসল। যেন তার কাছে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তারপর দিন কালেজে দেখা হতে আর ফিরেই দেখলে না তার দিকে। যেন চেনেই না তাকে। দিন কতক তো কলেজের বাইরে কোথাও দেখাই করলো না যেয়ে। তারপর আবার যেদিন দেখা হ'ল দু'জনে, সেদিন কি রাগ!

"কেন তুমি সেদিন ওসব করতে গেলে প্রশান্তদা?"

"কি, কি করেছি আমি সেদিন!"

সত্যই ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছিল প্রশান্ত। কিছুই এমন করা হয়নি সেদিন যাতে ভয়ানক অপরাধ হয়ে গেছে। শুধু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে চেপে নিয়ে বসেছিল তাকে। একবারও উষা মুখ তোলেনি। কিন্তু তাতেই কি এত অপরাধ হয়ে গেল যে আর সাতদিন দেখাই করলে না সে প্রশান্তর সঙ্গে। সত্যই ভয়ও পেয়েছিল প্রশান্ত সেদিন উষার প্রশ্ন শুনে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিক্ করে হেসে ফেলেছিল উষা। তার সঙ্গে চোখ দু'টি অপরূপভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিল, "যাও, তুমি ভয়ানক ইয়ে!"

ইয়ে কথাটি হচ্ছে ওর মুদ্রা দোষ।

কি অদ্ভুত ভঙ্গিমা করেই উচ্চারণ করে কথাটি। ইচ্ছে করলে শুধু চোখ ঘুরিয়েই বুঝিয়ে দেবে যে ইয়ে হচ্ছে ইয়ে।

তারপর আর একদিনের ব্যাপার। প্রশান্ত চোখ বুঁজে বেশ চেখে চেখে আগাগোড়া মনে আনে সেদিনের খুঁটিনাটি সব কিছু।

সেদিনটাও ছিল বৃষ্টির দিন।

বাসে করে এসে ওরা নেমে পড়ল চিত্তরঞ্জন এভেনিউ হ্যারিসন রোডের মোড়ে। মেয়েদের জায়গায় উমাকে আর পুরুষদের জায়গায় প্রশান্তকে বসতে হয় বাসে। এমন কি পাশাপাশি বসে কথা বলারও সুযোগ নেই। কাজেই বাস থেকে নেমে গেল ওরা। জল কাদা বাঁচিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রেলের বুকিং অফিসের সামনে গাড়ি-বারান্দার নিচে। দুপুরবেলা প্রকাশ্য রাস্তার ওপর মানে সেই গাড়ি-বারান্দার নিচে। কতকগুলো স্ত্রী পুরুষ শুয়ে ঘুমচ্ছে। ঐ জায়গাটাই ওদের ঘর বাড়ি। কাজেই শালীনতার প্রশ্ন উঠতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছে এবং ঘুমলে মানুষের হুঁস থাকে না।

ওরা দু'জনে গিয়ে দাঁড়াল তাদের মাঝখানে। মুখ চোখ লাল 'হয়ে উঠল উমার। প্রশান্তর কান গরম হয়ে উঠল। হঠাৎ ওদের দু'জনের চোখে চোখ মিলল। দু'জনেই বোকার মত হেসে চোখ ঘুরিয়ে নিলে। তারপর উমা বললে, "কি আজ এখানেই সারাটা দিন দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে নাকি!" চারিদিকে নজর করলে প্রশান্ত। একখানি রিক্সার টিকিও দেখা গেল না। ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। রিক্সাওয়ালারাও তো মানুষ বটে!

কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না। দেখা গেল উত্তর দিক থেকে একখানা রিক্সা আসছে। প্রশান্ত থামাল তাকে। রিক্সাওয়ালা এক নজর চাইলে ওদের দিকে। ওরা উঠে বসতে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যেতে হবে।

প্রশান্ত বললে—শ্যামবাজার।

ঠুং ঠুং করে চলল রিক্সা। ওরা বাঁচল তখন পর্দার আড়ালে বসে। কোথা দিয়ে যে কেটে গেল ঘণ্টাখানেক সময় তা' কেউ টেরই পেলে না। হুশ হ'ল হঠাৎ গাড়ির সামনের দিকটা নিচু হতে। গাড়ি থামিয়ে রিক্সাওয়ালা পর্দার ভেতর মাথা গলিয়ে দিলে। ওদের কাপড় চোপড়ের অবস্থা তখন

শোচনীয়। তৎক্ষণাৎ মাথাটা টেনে নিলে রিক্সাওয়ালা পর্দার বাইরে। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশান্ত মুখ বার করে দেখলে কোথায় এসেছে তারা। এসেছে একেবারে খাল ধারে। ডান ধারে খাল—বাঁ ধারে দোতলা টিনের মাঠকোঠার সামনে রিক্সা থেমেছে।

রিক্সাওয়ালা মাড়ী বার করে বললে, "উৎরাইয়ে হুজুর।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত, "এ কোথায় নিয়ে এলে!" অতি বিনীতভাবে নিবেদন করলে রিক্সাওয়ালা, "কিছু ভাবনা করবেন না। অনর্থক বৃষ্টিতে কেন ঘুরছেন। তার চেয়ে সামনে ঐ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যান। বারান্দার শেষের ঘরখানা আমার। ঘরে একখানা চারপায়াও আছে। ঘণ্টা দু'য়েক আরাম করুন সেখানে। এখন কেউ থাকে না বাড়িতে কাজেই কোনও ভাবনা নেই। নিচে বসে পাহারা দেবো আমি।"

ভয়ে দুর্ভাবনায় কাঠ হয়ে গেল প্রশান্ত—এ ব্যাটা বলে কি! কোন বদ মতলব নেই তো!

রিক্সাওয়ালা বোধ হয় বুঝতে পারলে তার মনের কথা। গলায় বাঁধা এক গোছা লাল সুতা ধরে বললে, "কালী ঘাটের মা কালী আর মা গঙ্গার নাম দিয়ে বলছি কোনও ভাবনা নেই আপনাদের। কত বাবুকে এভাবে এনেছি। আমার ঘরে বসে আরাম করে গেছেন। যাবার সময় খুশি হয়ে দু'পাঁচ টাকা বখশিশও দিয়ে গেছেন গরীবকে।"

ঘণ্টা দুয়েক পরে নিচে নেমে এসে নগদ পাঁচ টাকা বখশিশ দিয়েও ছিল রিক্সাওয়ালাকে প্রশান্ত।

তারপর দিন পনরো কলেজ কামাই করলে ঊষা। সে ক'টা দিন যে কি অবস্থায় কেটেছিল প্রশান্তর! একে একে নাওয়া খাওয়া ঘুম সব বন্ধ হ'ল। তবু ওদের বাড়ির দিকে পা বাড়াবার সাহস হ'ল না তার। যে কড়া মেজাজের লোক ঊষার বাবা—একটু কিছু সন্দেহ করলে আর রক্ষে রাখবেন না।

পনরো দিন পরে কলেজে আসতে লাগল উষা। কিন্তু কিছুতেই প্রশান্তর সঙ্গে কোথাও যেতে রাজী হোল না। শেষে রাগ করে ওর দিকে চেয়ে দেখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলে প্রশান্ত। সামনা সামনি পড়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিত। এভাবেও বেশীদিন চলল না। সংক্ষিপ্ত একখানি চিঠি পেলে প্রশান্ত। উষা লিখেছে—পনরো দিনের ভিতর তাকে বিয়ে না করলে সে আত্মহত্যা করবে।

প্রশান্ত জানত মিথ্যা ভয় দেখাবার মেয়ে নয় উষা। সে প্রায় পাগল হয়ে উঠল। কোথায় যাওয়া যায়! কাকে বিশ্বাস করে এ সব কথা বলে একটা পরামর্শ নেওয়া যায়। এধারে উষার সঙ্গেও দেখা করবার উপায় নেই। সে কিছুতেই কোথাও দেখা করবে না প্রশান্তর কথা না পেলে।

শেষ পর্যন্ত হ'ল একটা উপায়। নারকেল ডাঙ্গায় থাকেন এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক—তিনি বিবাহ রেজেষ্ট্রি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বললে প্রশান্ত। তার দু'দিন পরে ওদের বিয়ে রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের দয়ায়। তিনি দু'জন সাক্ষীর ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু তারপরও উষা রয়ে গেল নাগালের বাইরে। বললে সে প্রশান্তকে, "আরও কিছুদিন ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই আমার বাবাকে রাজী করাতে পারব আমাকে তোমার হাতে দিতে। এভাবে তোমায় নিয়ে গিয়ে আমি দাঁড় করাতে পারব না তাঁদের সামনে! মাথা উঁচু করে যাবে তুমি সেখানে, মাথা নিচু করে নয়।"

কিছুই হোল না, কথাটা বলতেই পারলে না উষা বাপের সামনে। পারতও না বোধ হয় কখনও যদি না খোকাটা পেটে আসত।

খোকার কথা মনে হতেই চমকে উঠল প্রশান্ত। কত রাত্রি হ'ল এখন! রাত তো বেশ হয়েছে—সাড়ে নটা বাজে। এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় রইল সে! নাঃ—খোকাটাও যদি আজ থাকত তাহলে এ রকম হো-হো টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে পারত না উষা।

চাকরটা এসে বললে—রান্না হয়ে গেছে। এখন সে খাবার দেবে কি? এক ধমক খেয়ে সে সরে পড়ল সামনে থেকে। সিগারেটের পর সিগারেট ওড়াতে লাগল প্রশান্ত বাইরের আরাম চেয়ারের ওপর শুয়ে শুয়ে।

খোকা খোকা খোকা—একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে উষা ছেলে ছেলে করে আজকাল। কাল রাত্রেই একচোট কান্নাকাটি মান অভিমান হয়ে গেছে।

কেন আর একটা ছেলে হচ্ছে না? বছর দু'বছর অন্তর ছেলে হয় সকলের, কিন্তু তাদের হয় না কেন আর একটি ছেলে? রোজ রাতে এই এক কথা নিয়ে এক পসলা করে হবেই। ডাক্তার কবিরাজ তাগা তাবিজ আর মানত করা ঠাকুর দেবতার কাছে—এরও যেমন কামাই নাই, তেমনি সেই মরা ছেলের জন্যে চোখের জলেরও বিরাম নেই। সব দিক দিয়ে উষাকে সুখী করবার চেষ্টা করে প্রশান্ত। প্রাণান্ত চেষ্টাই করে। কিন্তু যা' তার হাতের মধ্যে নেই তা' দেবে কি করে! ছেলে একটা চাই উষার। ছেলে না হলে সে বিষ খাবে, গলায় দড়ি দেবে। রাস্তা থেকে ছেলে কুড়িয়ে এনে জামা জুতা দেবে। তার মাকে খোসামোদ করবে। লাজ লজ্জা মান অপমান বোধ কিছুই নেই। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে কাল রাতে দুটো কড়া কথাই বলে ফেলেছিল প্রশান্ত। বলে ফেলেছিল বেশ শক্ত কথাই। তার ফলে আজ সকালেও উষা তার সঙ্গে কথা বলেনি।

উষা ছেলে না হওয়ার জন্যে দায়ী করেছিল তাকেই। বলছিল, "একটা ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ কর না কেন তুমি! তোমার কিছু হ'ল কি না একবার দেখাবে না কিছুতেই! আমি তো এই দশবার দেখিয়ে এলাম। সব ডাক্তার বললে আমার কিছুই হয়নি। তুমি একবারও কোন ডাক্তার দেখাবে না! কেন? কি হয়েছে তোমার তা' বল সত্যি করে। নয় তো আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

ফস করে বেরিয়ে গেল প্রশান্তর মুখ দিয়ে, "যাও, ঘরে টাকা রয়েছে, সেই টাকা নিয়ে গিয়ে কালই উকিলের সঙ্গে পরামর্শ কর। করে আমার সঙ্গে

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করগে। রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে তোমার সঙ্গে। তোমার ভাবনা কি। কোর্টে গিয়ে আমি মানব যে আমার ছেলের বাবা হবার সামর্থ নেই! ব্যস, ল্যাঠা চুকে যাবে। খালাস পাবে তুমি। তারপর আর কাউকে বিয়ে করে ছেলের মা হওগে। আমাকে আর জালিও না।"

খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইল ঊষা বিছানার ওপর। একটি কথাও আর বলেনি। তারপর প্রশান্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অত বড় শক্ত কথাটা ফস করে না বললেই হ'ত।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশান্ত ঘড়ি দেখলে আবার। সাড়ে দশটা।

আর শুয়ে থাকতে পারলে না সে! গেল কোথায়?

গেল কোথায় তাহলে ঊষা?

কি একটা অজানা আশঙ্কায় প্রশান্তর হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

রাত সাড়ে বারটায় ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রশান্ত।

ব্যারাকপুর পুলিশ লালবাজার পুলিশকে জানালে।

ইনস্পেক্টার ঘোষ প্রশান্তর বন্ধু। তিনি উঠে বসলেন গাড়িতে প্রশান্তর পাশে। ব্যারাকপুর থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত পাঁচশ' ঠিকানায় ঢুঁ দিলে প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে সেই রাত্রেই। কেউ কোনও সংবাদ বলতে পারে না।

দু'দিন পরে।

লালবাজারে বসে আছে প্রশান্ত। তখন বেলা নটা হবে। কোথা থেকে ঘুরে এলেন ইনস্পেক্টার ঘোষ। প্রশান্তর কাঁধের উপর হাত রেখে গম্ভীর মুখে বললেন—"চলুন মিঃ চোধুরী, এক জায়গা থেকে ঘুরে আমরা বাড়ি যাই।"

ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াবার মত সামর্থও তখন আর নেই শরীরে তার। ঘোষ তাকে নিয়ে বেরুলেন এবার পুলিশের গাড়িতে।

তারপর কত জায়গায় গাড়ি থামল, কে কে উঠল আরও গাড়িতে এ সব কিছুই প্রশান্ত দেখলে না। চোখ বুঁজে বসে রইল একভাবে।

শেষে ঘোষই তাকে সজাগ করে নামাল গাড়ি থেকে। নামিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল একটি ঘরে। লক্ষ্য করলে প্রশান্ত যে বহু লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সবাই কি নিয়ে আলাপ করছিল। হঠাৎ সকলে চুপ করে গেল সে ঘরে ঢুকতেই।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বলতে লাগলেন, "প্রশান্ত চৌধুরী আর উষা চৌধুরীকে আমি চিনি। বার বছর আগে আমি এদের বিবাহ রেজেষ্ট্রি করি। তারপর বহুদিন আর ওদের কোনও সংবাদ পাইনি। দু'দিন আগে বেলা সাড়ে এগারটার সময় উষা আমার কাছে আসেন। প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি তাঁকে। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে ওঁদের বিবাহের কাগজ পত্র দেখান আমাকে, তখন আমার মনে পড়ে সব, তাঁকে চিনতে পারি আমি।"

কে একজন প্রশ্ন করলেন, "কি জন্যে গিয়েছিলেন তিনি আপনার কাছে? কি কি কথা হ'ল তাঁর সঙ্গে আপনি খুলে বলুন সব। কিছু ঢাকবার চেষ্টা করবেন না।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কেশে গলা পরিষ্কার করে বলতে লাগলেন, "না আমি কিছু ঢাকব কেন। এমন কোন ঢাকবার মত কথা বলেননি তিনি আমাকে। তিনি জানতে এসেছিলেন, জানতে চাইলেন যে, মানে—তাঁর কথাটা হচ্ছে"—ভদ্রলোক বার বার প্রশান্তর দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল।

ততক্ষণে প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার থেকে। সামনে ঝুকে টেবিলটা চেপে ধরেছে দু'হাতে। চীৎকার করে উঠল সে—"বলুন—বলুন শিগ্‌গির দয়া করে—কি জানতে চাইলে উষা আপনার কাছে?"

কম্পিত গলায় বৃদ্ধ উত্তর দিলেন নিচের দিকে চেয়ে, "উষা জানতে চেয়েছিলেন যে, ছেলে পুলে না হলে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে কি না।

মানে তাকে .বোধ হয় ভয় দেখানো হয়েছিল যে, যখন তাঁর ছেলে পুলে হচ্ছে না তখন প্রশান্তবাবু বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন। কারণ রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে কি না। ভয়ানক ভয় পেয়েই এসেছিলেন তিনি। খুব ব্যথাও পেয়েছিলেন মনে।"

বৃদ্ধ বসে পড়লেন কাঁপতে কাঁপতে।

মাথা হেঁট করে প্রশান্ত শুনছিল। আর একবার চীৎকার করে উঠল, "কোথায় উষা? এসে বলুক সে আমার সামনে যে আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম। বলুক—বলুক একবার আমার সামনে। কোথায় সে।" চারিদিকে চাইতে লাগল সে রক্তচক্ষু করে।

ঘোষ তার হাত চেপে ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে।

এবার উঠলেন ডাঃ অরুন্ধতী সেন, কলকাতার বিখ্যাত মেয়েদের ডাক্তার। তিনি বললেন—

"উষা চৌধুরী তাঁর পেসেণ্ট। প্রায় তিন বছর তিনি উষাকে চেনেন। কেন ছেলে হয় না, এ জন্যে বহুবার তিনি পরীক্ষা করেছেন উষাকে। কিন্তু কখনও সত্য কথা জানাননি তাঁকে। দুইদিন আগে প্রায় পাগলের মত অবস্থায় এসে উষা কান্নাকটি করতে লাগলেন আর একবার তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে। কি মনে হোল তাঁর সেদিন—তিনি উষাকে বুঝিয়ে বলেন যে কখনও আর তাঁর ছেলে পুলে হবে না। তারপর ডাক্তার সেন ডাক্তারী শাস্ত্র মতে কেন আর গর্ভ হবে না তা' বুঝিয়ে বললেন।

আবার লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত। পাগলের মত চীৎকার করে উঠল, "কোথায় উষা? কোথায় সে? কেন সে পাগল হয়ে উঠেছে ছেলে ছেলে করে? এ সব পাগলামী কেন করছে সে? কে বলেছে তাকে যে আমি ছেলে চাই। কোথায় উষা, ডাক তাকে, এখনই আমি চলে যাব তাকে নিয়ে।"

তখন ঘোষ এবং আর একজন দু'ধার থেকে ধরে ফেলেছে প্রশান্তকে। একজন অফিসার একটা প্যাকেট খুলে ফেললেন তার চোখের সামনে

টেবিলের ওপর। কয়েকটি সোনার চুড়ি, একটি মুক্তা বসানো আংটি আর রক্ত মাখা ছিন্নভিন্ন একখানা শাড়ি এবং আরও কিছু রক্ত মাখা কাপড়-চোপড়।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রশান্ত জিনিসগুলোর দিকে। তার দু'ধারে দু'জন শক্ত করে ধরে আছে তখন।

তারপর হঠাৎ এক সময় হা-হা-হা-হা করে বিকট হাসতে লাগল সে। যাঁরা দু'জনে ধরেছিলেন তাকে, তাঁরা সভয়ে দেড়ে দিলেন সেই হাসি শুনে। চীৎকার করতে করতে প্রশান্ত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—

"উষা, উষা—শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিলে তুমি আমাকে। ফাঁকি দিয়ে ফেলে পালালে!"

রূপ কথার মত

তুচ্ছ ব্যাপার। হামেশা ঘটছে এ জাতের ঘটনা। বাসের মধ্যে পা মাড়িয়ে দেওয়া একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়। যে ভিড় হয় বাসে তাতে কেউ কারও মাথায় পা তুলে দেয় না এইটুকুই যথেষ্ট। বাসের মধ্যে কে কবে কার পা মাড়িয়ে দিয়েছে তা' মনে করে রাখে না কেউ। তার প্রয়োজনও নেই কিছু।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাই আসামান্য হয়ে দাঁড়ায় কখনও কখনও।

বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে বাসে ওঠে মণিকান্ত। পৌনে দশটায় ডালহাউসি পৌঁছান প্রয়োজন, দাঁড়িয়ে ঝুলে যে করে হোক। রোজ ট্যাক্সি চেপে গেলে এলেও কিছু যায় আসে না তার। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর খুব বড় অফিসার। পয়লা তারিখে এক তাড়া নোট এনে দিদিমার কোলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বুড়ী তুলে রাখেন লোহার সিন্দুকে নোটের বাণ্ডিলটা। তিন বছর পাঁচ মাস চাকরি করছে নাতি। একচল্লিশটা বাণ্ডিল সাজানো আছে সিন্দুকে। এক পয়সা নড়চড় হয়নি। হবেও না কস্মিন্ কালে। নাত বৌ এলে গুণে নিতে বলবেন বুড়ী। নাতির আর খরচ কি। আগে যা ছিল এখন তাও নেই। কলেজের মাইনে, পরীক্ষার ফি লাগে না আর। দিদিমার খায়, দিদিমার পরে। ছ'-বছর বয়স থেকে তাই করছে, করবেও চিরকাল তাই। শুধু শুধু চাকরি করা। চাকরি করছে, বাসে উঠছে, ট্রামে ঝুলছে। স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটির ছেলে হয়ে আছে সে এখনও। এক গাদা পরীক্ষায় পাশ করে অতবড় চাকরি করছে, এ কথা ওর নিজেরও খেয়াল হয় না সব সময়।

মেজমামা পরেশবাবু রাগারাগি করেন :

"এই মণি, হয় আমার গাড়িতে যাওয়া আসা কর, নয় তো কিনে ফেল এক-খানা গাড়ি। ঐ ভাবে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া আসা করে বাধাবি একটা বিপদ একদিন!"

খাবার সময় পিঠে হাত বুলিয়ে দিদিমা বলেন, "লক্ষ্মী দাদু আমার। একখানা গাড়ি এবার কিনে ফেলি—কি বল? রোজ সকালে সেই গাড়ি করে আমি গঙ্গা নেয়ে আসব, তারপর তুই অফিস যাবি।"

মুখের মধ্যে তখন ভাত—মণিকান্ত উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করে ওঠে। মুখ খালি হলে বলে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে দিদিমা। খামকা গাড়ি কিনবে কেন। দু'দিন পরে শ্বশুরই তো দেবে একখানা।"

বুড়ী চটে গিয়েও হেসে ফেলেন। "তোর সেই গাড়িওয়ালা গাড়োয়ান শ্বশুর কোথায় আছে বল না আমায়। তাড়াতাড়ি আদায় করি গাড়িখানা। নয় তো তোর গাড়ি চড়ে গঙ্গা নাইতে যাব কি মরবার পর!"

এই কথাটিই সহ্য করতে পারে না মণিকান্ত। একদিন তার দিদিমা মরবে এ চিন্তাটা তাকে কি রকম কাবু করে ফেলে। মা নেই, বাপ নেই—কবে থেকে নেই, তা' তার মনেও পড়ে না। দিদিমাই সব। ভাতের থালার ওপর হাত থেমে যায় মণিকান্তর। পিঠে হাত বুলিয়ে রাগ ভাঙাতে হয় বুড়ীকেই।

"না রে না—খেপা কোথাকার। তোর গাড়ি না চড়ে নাত বোয়ের সেবা না নিয়ে আমি মরব না কিছুতেই।"

ছোট মামী ঠাট্টা করে, "যত ধেড়ে হচ্ছে নাতি, তত আদর বাড়ছে। আমরা সব বানের জলে ভেসে এসেছি এ বাড়িতে।"

গোঁ গোঁ করে ওঠে মণিকান্ত, "যান যান, কোথায় ছিলেন দু'বছর আগে।"

দুধের বাটিটা নিয়ে এসে মেজমামী শাসন করেন, "আর একজন যে দিন আসবে, তোমার আদরও কমবে সেদিন থেকে। তখন আর খাবার সময় পিঠে হাত বুলোতে বসবেন না দিদিমা।"

সেই ভয়েই বিয়ের নাম উচ্চারণ বরদাস্ত করতে পারে না মণিকান্ত। তার দিদিমার ভাগ আর কেউ পাবে না কখনও। তার কাছে দিদিমার চেয়ে আপন হতে পারে কি কেউ কিছুতে!

মেজমামার কথাই ফলে যাচ্ছিল সেদিন। আর একটু হলেই মহাবিপদ ঘটে যেত।

"উঃ—পা ছাড়ুন শিগ্‌গির—"

কাকে বলা হচ্ছে কথাটা বুঝতে পারেনি মণিকান্ত প্রথমে। দারুণ ঠাসা-ঠাসিতে সকলেরই নাভিশ্বাস ওঠবার উপক্রম। কে কাকে কি বলছে, তা' শোনবার অবস্থা নেই কারও। হঠাৎ তার চোখ পড়ল দু'টি চোখের ওপর। তার বুক থেকে পোনে এক হাত দূরে ভীষণ হয়ে উঠেছে সেই চোখ দু'টির দৃষ্টি, যন্ত্রণায় লাল হয়ে উঠেছে মুখখানি। নিমেষের মধ্যে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ল মণিকান্ত, কোনও রকমে পা দু'খানা সরাল একটু। সামনের মুখখানির দম আটকানো ভাবটা কাটল। নিঃশ্বাস নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলে: "অসভ্য কোথাকার।"

লাল হয়ে উঠল মণিকান্তর দুই কান। কোনও রকমে বললে, "মাফ করুন দয়া করে, পেছনের চাপে—"

কোঁ ওঁ ওঁ—ক্যাঁচ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থামল বাস। দু'হাতে মাথার ওপরের রড ধরেই ছিল মণিকান্ত, প্রাণপণে সামলালে ঝাঁকুনিটা। সামনের মুখ মাথা এসে সজোরে ধাক্কা খেলে তার বুকের সঙ্গে।

বৌবাজারের মোড়ে ঘুরে লালবাজারের দিকে ছুটল গাড়ি।

আবার মিলল চোখের সঙ্গে চোখ। এবার সে চোখের চেহারা অন্ত রকম।

"আপনিও মাপ করবেন দয়া করে।"

এবার আর একটি ধাক্কা খেলে মণিকান্ত বুকে। ওপরে নয় ভেতরে। গলার ভেতর কি যেন ঠেলে উঠল তার। ভয়ানক থতমত খেলে যা' হয় তাই। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না।

কোঁ ওঁ ওঁ—ক্যাঁচ।

বসা দাঁড়ানো ঝুলন্ত পৌনে একশ' নরনারীর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ শেষ হ'ল তখনকার মত। মাটিতে পা দিয়ে অভ্যাস মত আগে চোখ পড়ল হাতের বাঁধা ঘড়িটার ওপর। রুমাল বার করে ঘাড় কপাল ঘষে নিলে। তারপর সামনে পা বাড়াতেই দেখতে পেলে বাঁ হাতে পিঠের ওপর আঁচল গুছিয়ে নিচ্ছেন একজন। এগিয়ে গেল।

"বেশী চোট লাগেনি তো আপনার পায়ে" অনুতপ্ত সুরে বললে মণিকান্ত।

চকিতে মুখ ফেরালেন তিনি। নিজের পায়ের দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন, "না তেমন কিছু হয়নি। এরকম একটু-আধটু রোজই তো সহ্য করতে হচ্ছে। ক'দিন আর বসবার জায়গা পাই।''

পাশাপাশি দু'জনে নামল ফুটপাথ থেকে। মণিকান্ত বললে, "ওরকম আঙ্গুল বার করা জুতো একেবারে অচল আজকাল। উচিত হচ্ছে সকলের মিলিটারি বুট পায়ে দিয়ে বাসে ওঠা। অন্তত পা দুটো বাঁচে তাহলে।''

একটু শব্দ করেই হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, "তাহলে বাসে না উঠলেও চলবে তখন। মিলিটারি কায়দায় 'কদম কদম বাড়য়ে যা' করে যাওয়া আসা চলবে।"

মণিকান্ত বললে, "হাসুন আজ আমার কথা শুনে। কিছু দিন পরে আইন বানানো হবে—বুট পট্টি না চড়িয়ে কাজের লোক রাস্তায় বেরুতে পারবে না। আপনাদের এই সব শাড়ি-টাড়িও চলবে না তখন। আমরা জন্মেছি খেটে খেতে আর ছুটোছুটি করতে—ঐসব সৌখিন সাজ পোষাক আমাদের জন্যে নয়।''

এবার মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে একবার ভাল করে দেখে নিলে মণিকান্তকে। আপন মনে গজগজ করে চলেছে সে—"আপনারা আজ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুনিয়াকে চালাচ্ছেন পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ঘরের ভিতর গৃহলক্ষ্মী হয়ে না থেকে সকলের সঙ্গে একতালে পা ফেলে চলেছেন। সেই রকমের সাজ পোষাকও হওয়া চাই আপনাদের। কাজের

মানুষ হবে ষোল আনা কাজের মানুষের মত—এতে হাসবার কথা আছে কোথায়।" রাইটার্স বিল্ডিং-এর কোণার ফুটপাথে উঠল ওরা।

মেয়েটি বললে, "পেটের দায়ে সবই করতে হতে পারে। রোজ এত মেয়ে বাসে, ট্রামে ঠেলাঠেলি করে যাবে আসবে, কিছুদিন আগে কি কেউ ধারণা করতে পেরেছিল?"

কথাটা বাজল মণিকান্তর কানে। বেদনাহত অভিমানের সুর। সে মুখ ফিরিয়ে দেখলে। ছিপছিপে গড়নের সাদাসিধে মানুষটি। বেশ একটু লম্বা ধাঁচের মুখ। অপর্যাপ্ত রুক্ষ চুলের অগোছাল-করে-জড়ানো মস্ত বোঝাটা রয়েছে ঘাড়ের ওপর। দেখতে পাওয়া যায় না এত সরু একগাছি সোনার হার গলায়। এধারে গলা পর্যন্ত ওধারে হাতের কনুই পর্যন্ত ঢাকা সাদা জামা—পাতলা ফিনফিনে কাপড়ের নয়। এক ইঞ্চি চওড়া পাড়ের সাদা কাপড়। কাপড় জামা খুবই পরিষ্কার। কাঁধে ঝুলছে একটা সাধারণ চামড়ার ব্যাগ। লম্বা রোগা হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি, মুখে কোনও কিছু মাজা ঘষার চিহ্ন দেখা যায় না। বয়স কুড়ি একুশের ওপর হবে না নিশ্চয়ই। নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে হাঁটছে মাথা নিচু করে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে মণিকান্ত, "কোন্ অফিস আপনার?"

মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে জবাব দিলে মেয়েটি—"ইরাবতী ব্যাঙ্ক"। এবার ভাল করে দেখলে মুখখানি মণিকান্ত। ছোট্ট কপাল। চোখ দু'টি সেই অনুপাতে বেশ বড় আর ভাসা ভাসা। খুব সাদাসিধে গোছের মুক চাহনি।

মণিকান্ত রাস্তা পার হবে আবার।

"আচ্ছা আবার দেখা হবে" বলে দু'হাত জোড় করলে। তারপর ফুটপাত থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল।

৩

রাত্রে ঘোষণা করলে মণিকান্ত—"অফিসের কাজে দিল্লী যাচ্ছি এবার।" দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদিন থাকবি তুই সেখানে?" মাথাটা

একটু চুলকে নিয়ে মণিকান্ত বললে, "তা' এক মাসও হতে পারে, দু'মাসও হতে পারে।"

পরেশবাবু বললেন, "ছেড়ে দিয়ে আয় চাকরি। কাল থেকে আমার সঙ্গে বেরুবি। তখনই বলেছিলাম—আমাদের বাড়ির ছেলের চাকরি-বাকরি করা পোষাবে না। হুকুম করলেই দিল্লী মক্কা ছুটতে হবে। ওসব হবে টবে না। তিন পুরুষ ব্যবসা করে খাওয়া পরা জুটছে আমাদের। তোরও দু'বেলা দু'মুঠো জুটবে—ব্যস।"

ছোট মামা মণিকান্তর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। কলেজ ছেড়ে কারবারে ঢুকেছে। বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর। বেলা বারটার আগে শয়ন গৃহ ত্যাগ করে না। জরি পাড় ধুতি পরে সব সময়। তিনি টিপ্পনী কাটলেন—"যাও বৎস, যাও। দিল্লী, লণ্ডন, পিকিং, মস্কো যেখানে খুশি যাও। চলে যাও একেবারে এস্কিমোদের দেশে। কিন্তু দিদিমাটিকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও। নয়ত —আমরা কেউ টিকতে পারব না বাড়িতে।"

দিদিমা বললেন—"যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় না কোথাও। না হয় যাবি দিল্লী। আমিও যাব তোর সঙ্গে। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, অযোধ্যা সব ঘুরে আসব। আগে বিয়ে-থা চুকে যাক তোর। আমিও এধারে সব গুছিয়ে নি।"

মণিকান্ত বুঝলে এখানে বাক্য ব্যয় করা অনর্থক। রাত সাড়ে দশটার সময় সে বড় মামার ঘরের দরজা নিঃশব্দে ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

চারিদিকের দেওয়ালে বই-ঠাসা আলমারি। মেহগনি কাঠের ভারি টেবিল চেয়ার। ওপাশে একখানি ছোট্ট মাটিতে ঠেকানো চৌকি। তার ওপর কম্বল ঢাকা পাতলা বিছানা। প্রায় অষ্টপ্রহর এই ঘরেই থাকেন সুরেশবাবু। স্ত্রী মারা যাবার পর বড় একটা বার হন না ঘর থেকে। বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন। আগে নিজে ব্যবসা দেখতেন। এখন কোনও সম্পর্ক রাখেন না কিছুর সঙ্গে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ভায়েদের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে এখন নিশ্চিন্ত আছেন।

একখানি পাঁচ সেরি বইয়ের খোলা পাতার ওপর ঝুঁকে বসেছিলেন। টেবিল ল্যাম্পটার আলো পড়েছে বই-এর পাতার ওপর। সারা ঘরখানি পাতলা অন্ধকারে ডুবে আছে। ধ্যানে মগ্ন থাকবার উপযুক্ত স্থান। মণিকান্ত চেয়ারের পিছনে গিয়ে একটু কাশল। বই থেকে নজর না সরিয়ে বললেন সুরেশবাবু, "আয়—বোস ঐ চেয়ারে।"

মিনিট তিনেক পরে মুখ তুলে বললেন, "দে এবার আলোটা জেলে।"

উঠে গিয়ে সুইচ টিপে দিলে মণিকান্ত। সবুজ নরম আলোয় আরও রহস্যময় হয়ে উঠল ঘরখানি। মণিকান্ত বললে, "একবার আমাকে দিল্লী যেতে হবে অফিসের কাজে।"

খুব খুশি হয়ে উঠলেন সুরেশবাবু। "বেশ বেশ, তাহলে এবার ওরা তোর ওপর বড় বড় কাজের ভার দিচ্ছে।" তারপর অল্প একটু উপদেশ দিলেন—সৎপথে থাকলে, পরিশ্রম করলে উন্নতি হবেই, তা' যে কাজই কর না কেন! তাঁর বলা শেষ হলে মণিকান্ত বললে, "কিন্তু দিদিমা—"

এবার সুরেশবাবু বুঝলেন ব্যাপারটা। হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"মা তোর সঙ্গে যেতে চায় তো! আমার প্রথমবার বিলেত যাবার সময়ও ঐ রকম গোলমাল বাধিয়েছিল মা। শেষে কোনও রকমে সে হাঙ্গামা থামান বাবা।"

দু' মিনিট কি চিন্তা করে বললেন, "আচ্ছা ঘুমোগে যা' তুই আজ। একটা ব্যবস্থা করছি আমি। কবে তোকে যেতে হচ্ছে?"

মণিকান্ত বললে, "এই সপ্তাহের শেষেই।"

সেই রাত্রেই চিঠি লিখলেন সুরেশবাবু মেয়ে জামাইকে। জামাই প্রফেসর লক্ষ্ণৌ কলেজে। এখন কলেজ বন্ধ। সুরেশবাবু লিখলেন, ওরা যেন পত্র পাঠ দিল্লী চলে যায়। সেখানে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে জামায়ের। সুতরাং কোন কষ্ট যেন না হয় তাঁর ভাগনের।

পরদিন সুরেশবাবু ওঁদের খড়দার ঠাকুর বাড়িতে চলে গেলেন মাকে

নিয়ে। সেখানে গুরুদেবও বাস করেন। কাজেই মায়ের আপত্তি হবে না জেনেই মণিকান্তকে কথা দিয়েছিলেন তিনি। সাত দিন পরে ছোট মামা দিল্লী মেলে তুলে দিয়ে এল ভাগনেকে হাওড়ায় গিয়ে।

পনরো দিনের ভেতরেই ফিরে এল মণিকান্ত। ব্যাপার সাংঘাতিক। মামাতো বোন শান্তিসুধা আর তার স্বামী দিল্লী গিয়ে এমন কাণ্ড করে বসেচে যে, এক সঙ্গে তেরটি ভদ্রমহিলা তাকে জামাই করবার জন্মে হন্যে হয়ে উঠেছিলন!

ছোট মামা টিপ্পনী কাটলে, "মাকাল ফল সবায়েরই লোভ হয় দেখে। তার চেয়ে চলে যাও বাছা হাইল সেলাসির দেশে। তোমার রঙ দেখেই তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে। সেখানে শুধু আবলুস জিনিয়া বর্ণের কদর! নির্ভয়ে ইনসিওর করাওগে তাদের ধরে ধরে।"

৪

বড় মামা খড়দা থেকে ফিরে এলেন নতুন একখানা গাড়ি নিয়ে। ভাগনেকে ডেকে বললেন, "কাল থেকে এই গাড়িতে অফিস যাবি, বুঝলি।"

বুঝলে মণিকান্ত। না বুঝে উপায় কোথায়। কারণ ইনি হচ্ছেন বড়মামা এবং এটি তাঁর আদেশ।

গাড়িতে চড়ে যাওয়া আসা করার সুখ সুবিধা আছে বটে কিন্তু কেমন যেন স্বস্তি পাওয়া যায় না। জানা শোনা সকলেই পায়ে হাঁটছে, বাসে ট্রামে যাচ্ছে। মণিকান্ত যেন আলাদা হয়ে গেল সবায়ের কাছ থেকে। ওর ক্লাবের বন্ধুবান্ধব, কলেজের সহপাঠি আর পাড়ার যারা ওকে মণিকান্তদা বলে ডাকে, বিশেষতঃ পাড়ার বয়স্ক ভদ্রলোকেরা, যাঁদের মণিকান্ত কাকা-জেঠা-মামা বলে ডেকে এসেছে এতদিন—সবাই দূরে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে ঐ গাড়ি চড়ার ফলে। যাকে যেদিন দেখতে পায়, গাড়িতে তুলে নেবার চেষ্টা করে, "আসুন, আসুন কাকা, এক সঙ্গে যাই। পৌঁছে দিয়ে যাই আপনাকে।" এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন অনেকেই। বড়লোকের ভাগনে, নিজে অত বড়

চাকরি করে। বলছে বলেই কি পাশে উঠে বসা যায় নাকি। আরও অস্বস্তি লাগে মণিকান্তর। কিছুতেই সে বুঝতে চায় না যে অন্য সকলের সঙ্গে কোথাও প্রভেদ আছে তার।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় সেই মেয়েটির কথা। এর মধ্যে কতবার কতজনে হয়ত তার পা মাড়িয়ে দিয়েছে বাসে। মনে পড়ে যায় সেই চোখ দু'টি। মস্ত বড় চুলের বোঝাসুদ্ধ ছোট মাথাটি আছড়ে পড়েছিল তার বুকে। তখন নিমেষের জন্যে সে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে। গাড়ির ভেতর বসে নিজে চোখ বুঁজে সেই মুখখানি আর চোখ দু'টি দেখতে থাকে সে। বেশ স্পষ্ট দেখতে পায় চোখ বুঁজলেই। ভারি রোগা মেয়েটি আর কি অসহায়। এই বয়সেই চাকরি করতে নেমেছে। কি যেন নামটা বলেছিল তার ব্যাঙ্কের?

ইরাবতী ব্যাঙ্ক। মনে মনে হাসলে মণিকান্ত—ও ব্যাঙ্ক দু'দিন পরেই পটল তুলবে ঠিক। কিন্তু তারপর করবে কি ও! সত্যই যদি ওর চাকরিটি যায় তখন! তখনকার ভাবনায় মহা অশান্তিতে পড়ে গেল মণিকান্ত।

একবার যদি দেখা হয়ে যায় রাস্তায় কোথাও। তাহলে অনুরোধ করবে তাকে গাড়িতে উঠতে মণিকান্ত। যদি না রাখে অনুরোধ, যদি অন্য কিছু মনে করে।

আসা যাওয়ার সময় রাস্তার দু'ধারে নজর রাখে মণিকান্ত। শেষে ঠিক করলে যাবে সে একদিন ওদের ব্যাঙ্কে। অন্তত তার জানা দরকার যে কি অবস্থায় আছে সে। যে কোনও দিন চলে যেতে পারে চাকরিটুকু।

মণিকান্তর মাথায় আর একটি চিন্তার উদয় হোল। একবার জেনারেল ম্যানেজার আয়ারকে বলে দেখলে হয় না, কোথাও একটা মেয়েকে নেওয়া যায় কি না। যদি সে ষ্টেনো হয়, তবে নিশ্চয়ই তার একটা চাকরি করে দিতে পারবে মণিকান্ত নিজের অফিসে!

এই ভাবে কেটে গেল আরও একমাস। রাস্তার কোথাও দেখা মিলল না তার। ইরাবতী ব্যাঙ্কে যাবার সময় করে উঠতে পারলে না মণিকান্ত।

৫

ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে বেলা তিনটে থেকে। সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরুল মণিকান্ত। শম্বুক গতিতে গাড়ির মিছিল চলেছে। ডালহাউসির কোণে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে হাত উঁচিয়ে। গাড়ির মিছিল স্তব্ধ।

বাইরের দিকে চেয়েছিল মণিকান্ত। ভাবছিল ভিজে বাড়ি ফিরতে কি মজা। এই রকম হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরে কতবার দিদিমার কাছে বকুনি খেয়েছে! আজ আর সে উপায় নেই। কাঁচের খাঁচার মধ্যে বসে বাড়ি ফিরতে আজকের মত দিনে তার ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ নজরে পড়ে গেল।

বাঁ দিকের ফুটপাথের ওপর দিয়ে পা ঘষে ঘষে চলেছে ছোট ছাতাটি মাথায় দিয়ে। ওখানে মানুষের মিছিল, পা ঘষে ঘষে না গিয়ে উপায় নেই। টুক করে নেমে পড়ল গাড়ির দরজা খুলে। ড্রাইভারকে বললে, সামনে এগিয়ে রাখতে গাড়ি। তিন লাফে পৌঁছে গেল ফুটপাথের ওপর তার পাশে।

"এই যে, নমস্কার।"

মুখ ফিরিয়ে দেখলে মেয়েটি, কোনও জবাব দিলে না।

"চিনতে পারছেন না বোধ হয়, সেই যে সেদিন বাসে—"

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "পারছি চিনতে, কি বলছেন বলুন।"

গলার আওয়াজে আর কথার ধরনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল মণিকান্ত।

"না এমন কিছু নয়। আপনাকে দেখতে পেলাম তাই। চলুন না, পৌঁছে দিচ্ছি—গাড়ি আছে আমার সঙ্গে।"

"দরকার নেই", এবার অন্য দিকে চেয়ে উত্তর দিলে মেয়েটি।

মণিকান্তর জিব আটকে যেতে লাগল তোতলার মত। কোনও রকমে বললে, "একটু কথাও ছিল আপনার সঙ্গে আপনার অফিস সম্বন্ধে।"

টপ করে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি, কঠিন দৃষ্টি তার চোখে। বললে—"বলুন"।

"এখানে—এই রাস্তার মাঝখানে।"

"আমার শোনার দরকার নেই কোনও কথা", বলেই আবার পা চালালে।

মুখের ওপর যেন চাবুক পড়ল মণিকান্তর। বৃষ্টি পড়তে লাগল মাথায় গায়ে। পা নাড়াবার সামর্থ রইল না তার। অদ্ভুত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই।

সেদিন বাড়িসুদ্ধ সবাই ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল। মণিকান্তর মাথা ধরেছে। সাতাস বছর বয়সে এই জীবনের প্রথম মাথা ধরা। দিদিমা মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগলেন। ছোটমামা সন্ধ্যার পর কোথাও বেরুল না। চুপ করে বসে রইল ওর বিছানার ওপর একখানা বই হাতে করে। মেজমামার বড় ছেলের ম্যাজিক শেখা হোল না সেদিন বড়দার কাছে। সে পায়ের কাছে বসে আঙুল টানতে লাগল। পরেশবাবু বাড়ি ফিরে আগুন হয়ে উঠলেন, "যেতে হবে না কাল থেকে অফিসে, ওরা কি এতটুকু পদার্থ থাকতে ছেড়ে দেয় নাকি অফিস থেকে। এবার বেরুবি তুই আমার সঙ্গে। খবরদার যদি আর মুখে আনবি ওই চাকরির কথা।" বড়মামা একটুকরা কাগজে লিখে পাঠালেন নিজের ঘর থেকে—"মন হাল্কা করে ফেল্লে মাথা ধরা থাকে না।"

কেউ জানতে পারলে না যে, গভীর রাত্রে সুরেশবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পুরনো ড্রাইভার মঙ্গল সিংকে। সে চুপি চুপি বড়বাবুর ঘরে জানিয়ে এল যে, খোকাবাবু অফিস থেকে বেরোন খোশমেজাজে। ডালহাউসির মোড়ে হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে ছুটে দাঁড়াল ছাতা মাথায় একটি মেয়ের পাশে। মঙ্গল সিং গাড়ি নিয়ে সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাঁচ সাত মিনিট পরে খোকাবাবু আবার যখন এসে গাড়িতে উঠলেন, তখন তাঁর মুখের অবস্থা দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এক বিন্দু রক্ত ছিল না খোকাবাবুর মুখে।

আরও বেশী করে ঘটক-ঘটকীর আসা যাওয়া শুরু হোল বাড়িতে।

দিন পনরো পরে বেলা একটার সময় হঠাৎ চমকে উঠল মণিকান্ত সংবাদ শুনে। ইরাবতী ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করেছে।

জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আয়ারের সঙ্গে দুপুরে কফি খেতে বসল মণিকান্ত। আয়ার জানতেন যে তার এই সহকর্মীটি অনর্থক সেধে আসেননি তাঁর ঘরে কফি খেতে। অফিসে মণিকান্ত হচ্ছে মিষ্টার প্রবীর চৌধুরী—অর্থনীতির সর্বশেষ পরীক্ষাগুলিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ ভয়ানক মূল্যবান অফিসার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর। বৃথা নষ্ট করবার মত এক মিনিট সময় নেই চৌধুরী সাহেবের। একবারের জন্যেও বেরোয় না নিজের ঘর ছেড়ে। একটির বেশী দু'টি বাক্য ব্যয় করে না কারুর সঙ্গে। বৃদ্ধ আয়ার প্রস্তুত হলেন চৌধুরীর কাছ থেকে কিছু শুনতে।

কফি শেষ করে মণিকান্ত বললে, "একটি মেয়ে কর্মচারী আর বাড়ান যায় মিঃ আয়ার আমাদের অফিসে।"

"ও নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। খালি তো রয়েছে তিনটে জায়গা। না হয় মেয়ে দিয়েই ভর্তি করে নেওয়া যাক্।"

"ইরাবতী ব্যাঙ্ক ফেল করল শুনলেন বোধ হয়।"

আয়ার চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে চুরুট টানতে লাগলেন। তখন মণিকান্ত বললে যে তার প্রস্তাব হচ্ছে ওখানকার একটি মেয়েকে নেওয়া হোক এখানে। মেয়েটি সত্যই কাজের লোক আর বিশেষ প্রয়োজন তার একটি চাকরি হওয়ার।

আয়ার ফোন তুললেন কানে। ফোনে বললেন তাঁর অন্য এক অফিসারকে—ইরাবতী ব্যাঙ্কে তখনই খোঁজ করতে! কতজন মহিলা কর্মচারী ছিল ওদের ওখানে। তারা এসে দেখা করুক এখানে। তিনজনকে নিতে হবে এই অফিসে। ফোন রেখে জিজ্ঞাসা করলেন মণিকান্তকে—"তোমার কেণ্ডিডেটের নাম কি চৌধুরী?"

"তা তো জানি না।'

আয়ার বললেন, "হাউ ষ্ট্রেঞ্জ (কি আশ্চর্য)! আচ্ছা দরখাস্ত করুক তারা। তুমি লাহিড়ীর কাছ থেকে দরখাস্তগুলো নিয়ে বেছে দিও কাকে কাকে নিতে হবে। আমি লাহিড়ীকে সেই রকম বলে দোব।"

মাত্র দু'জন মহিলা কর্মচারী ছিলেন ইরাবতী ব্যাঙ্কে। দু'জনেরই কাজ হয়ে গেল সাত দিনের মধ্যে। তাঁদের কাউকে যেতে হোল না চৌধুরী সাহেবের সামনে। লাহিড়ীই নিযুক্ত করে নিলেন কাজে। চৌধুরী সাহেব ফোনে আয়ারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন।

আয়ার, লাহিড়ী এবং আরও দু'-একজন জাঁদরেল লোক অনেক কিছু আশা করেছিলেন। কিছুই ঘটল না। একটি দিনের জন্যেও নূতন মহিলা কর্মচারী দু'জনের কাউকেই ডেকে পাঠালেন না চৌধুরী সাহেব। ওঁরা দু'জনেও জানতে পারলেন না কার জন্যে চাকরি হোল এ অফিসে। চোখে তো দেখতেই পেলন না চৌধুরী সাহেবকে। কেউই সহজে পায় না তা'—একমাত্র তাঁর চাপরাসীরা ছাড়া। নিঃশব্দে তারা কাগজ, বই, খাতা নিয়ে যায় নিয়ে আসে চৌধুরী সাহেবের ঘর থেকে। নিঃশব্দে কাজ করে ঘরের ভেতর বসে। ঘরের ভেতর একজন আছে তা' টেরও পায় না কেউ। কিন্তু সকলেই জানে এই ঘরের ভেতর ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সব চেয়ে জটিল কাজগুলো হচ্ছে একটি মাত্র লোকের দ্বারা। লোকটির অশেষ সম্মান অফিসে।

একদিন দেখা হয়ে গেল। অফিসারদের লিফট্ খারাপ। সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে একটা লিফটের সামনে। লিফট্ ওপরে গেছে। মৃদু গুঞ্জন উঠেছে সেখানে। হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে তটস্থ হয়ে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলেন চৌধুরী সাহেব। দু'-পাশে সকলের দিকে চেয়ে হাসি মুখে মাথা নাড়লেন। লিফট্ নেমে এল নিচে।

দরজা খুলে দিয়ে অনেকটা নিচু হয়ে সেলাম করলে লিফট্ ড্রাইভার। ভেতরে যেতে যেতে বললেন চৌধুরী সাহেব, "আসুন কয়েকজন।" মাত্র জন-তিনেক ভারিক্কী চালের বড়বাবু গিয়ে উঠলেন তাঁর সঙ্গে। লিফট্ ওপরে চলে গেল।

পাঁচ সাতজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন এক ধারে। ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'ইনিই মিঃ প্রবীর চৌধুরী।' ছিপছিপে গড়নের যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল সকলের পেছনে, তার ভেতরটা কেঁপে উঠল। নিচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। অনর্থক দুই কান লাল হয়ে উঠল। ততক্ষণে চৌধুরী সাহেবের গুণগান শুরু হয়ে গেছে সকলের মধ্যে। অমন লোক নাকি মেলে না সহজে। বিপদে পড়ে যদি কেউ গিয়ে সাহস করে দাঁড়াতে পারে সামনে তাহলেই হোল। নিজের কাজ ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ ছোটাছুটি করতে থাকবেন তার সঙ্গে। জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত ওঁর কথায় ওঠেন বসেন। কিন্তু সহজে কেউ ঘেঁষতে পারে না কাছে। জেনারেল ম্যানেজার জানতে পারলে আর রক্ষে নেই তার। কড়া হুকুম কেউ যেন না বিরক্ত করে চৌধুরী সাহেবকে।

আরও অনেক কথাই হোল। ইরাবতী ব্যাঙ্কের অরুণা দাশগুপ্তা এক পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনলে। নতুন চাকরি হয়েছে তার এই অফিসে। আজ সে ভাল করে জানতে পারলে, কি করে তার চাকরি হোল এখানে। আজ-কালকার দিনে সেধে ডেকে এনে চাকরি দেওয়ার রহস্যটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিখ্যাত ফুটো পয়সার লড়াই লাগলো সহরে। বালবের ভেতর নানা জাতের এসিড ভর্তি করে ছোড়া হতে লাগল বাসের গায়ে। একান্ত নিরাসক্ত ভাবে নির্বিচারে ছোড়া হতে লাগল নেপথ্যে দাঁড়িয়ে। পেটের দায়ে যারা বাসে উঠে অফিস যাওয়া আসা করছিলেন, তাঁদের অনেকে চক্ষে

গেলেন হাসপাতালে সর্বাঙ্গ পোড়া হয়ে। দেখা গেল মেয়েদের ওপরেই এসিড ভর্তি বালব ছোড়ার ঝোঁকটা বেশী। বাধ্য হয়ে মেয়েরা কামাই করতে লাগল।

নতুন চাকরি অরুণার। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সে যাওয়া আসা করে অফিসে। হঠাৎ একদিন চৌধুরী সাহেবের চাপরাসী উপস্থিত তার টেবিলে। সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

উঠল অরুণা চেয়ার ছেড়ে। বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পডতে লাগল। দরজাটা একটু ফাঁক করে ধরে চাপরাসী সরে দাঁডালো একপাশে। একটু ইতস্তত: করে ঢুকল অরুণা ঘরে।

বেশ বড় ঘর। একেবারে ওধারের কোণায় মস্ত বড কাঁচ ঢাকা টেবিলে ঘাড গুঁজে কাজ করছেন। দরজার কাছেই থমকে দাঁড়ালো অরুণা। বেশ ঝাঁজালো কণ্ঠে প্রশ্ন হোল, "আপনার কি প্রাণের মায়াও নেই। এখনও রোজ আসছেন যে অফিসে।"

অরুণা চুপ। আরও তেতে উঠলেন চৌধুরী সাহেব। "কি ভেবেছেন আপনি! একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বেন না কিছুতেই।" অরুণা চুপ।

গলা আরও চড়ল, "এমন ভয়ানক লোক আমি জীবনে দেখিনি একটি। যে করে হোক লোককে জ্বালিয়ে আমোদ পান—না? যান—খবরদার বলছি আর আসবেন না অফিসে গোলমাল না থামলে। ফের যদি জ্বালান এভাবে, ভাল হবে না বলছি।" মাথা হেঁট করে আরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল অরুণা। তারপর পেছন ফিরে পা বাড়ালে।

আবার কানে এল, "শুনুন, আমার ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে তিনটের সময়। তখন গোলমালটা একটু কম থাকে। যান।"

তিনটের সময় চৌধুরী সাহেবের চাপরাসী এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিলে। বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়ে চোখ বুঁজে বসে রইল

অরুণা এক কোণে। তার দু'চোখের কোণ বেয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামতে লাগল। অনর্থক অশ্রু। অরুণা দাশগুপ্তার চোখের জল দুঃখের না আনন্দের তা' সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

সেদিন অনেক রাত্রে মঙ্গল সিং বড়বাবুর ঘরে গিয়ে জানিয়ে এল যে, কার্তিক বসু লেনের এত নম্বর বাড়িতে একটি মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে বেলা তিনটের সময় মণিবাবুর হুকুমে। গাড়িতে বসে মেয়েটি কাঁদছিলো।

তিনদিন পরে ঘটক যদু আচার্য এসে জানালেন কার্তিক বসু লেনের সেই নম্বরের বাড়িতে থাকেন ডাক্তার নিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত। ডাক্তারের মেয়ে ইনসিওরেন্স অফিসে চাকরি করে। নিকুঞ্জ ডাক্তার সিলেটের লোক। ভদ্রলোক মহা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কলকাতায় এসে। এখানে কিছুই করতে পারছেন না। বাধ্য হয়ে মেয়েকে চাকরি করতে পাঠিয়েছেন। নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে কেঁদেই ফেলেছিলেন যদু আচায্যির সামনে। মেয়েকে চাকরি করতে দিয়ে এতদূর ভেঙে পড়েছেন যে, বেশী দিন বোধ হয় আর বাঁচবেনও না।

সুরেশবাবু দেখলেন নিকুঞ্জ ডাক্তারের মেয়ের অফিসের নাম আর তাঁর ভাগনের অফিসের নাম এক।

সুরেশবাবু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। এ সম্বন্ধ হতে পারে। সিলেটের ওধারে কায়স্থ বৈদ্যে সম্বন্ধ হয়। কিন্তু মেয়ে চাকরি ছাড়লে ডাক্তারের চলবে কেমন করে? মেজ ভাই পরেশের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

পরেশবাবু বললেন, "আগে মেয়ে দেখ তোমরা। শিলচরে অনেকগুলো চা বাগান আছে দত্তদের। বিভূতি দত্তকে বলে সেই চা বাগানের ডাক্তার করে দেওয়া যাবে মেয়ের বাপকে।

মা বললেন, "না হয় নাই বা হোল তার মেয়ের সঙ্গে মণির সম্বন্ধ। তবু কাজ একটা করে দেনা সেই ডাক্তার বাবুর। ভদ্রলোক এত বড় বিপদে পড়েছেন!"

মায়ের কথার ওপর তো আর কথা নেই। পরেশবাবু বললেন, "আচ্ছা বেশ কালই বলব বিভূতির সঙ্গে দেখা করে।"

১০

ফুটো পয়সার লড়াই থেমে গেল। কোনও পক্ষেরই এতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি হোল না। মাত্র কলকাতার হাসপাতালগুলোতে অনেকগুলি সর্বাঙ্গ দগ্ধ মেয়ে-পুরুষ দারুণ যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। তাতে কি যায় আসে, কারণ এরা কোনও পক্ষেরই লোক নয়। হতভাগা তৃতীয় পক্ষ এরা। পেটের দায়ে পথে বেরিয়েছিল লড়ায়ের সময়। তার ফল পেয়েছে হাতে হাতে। সুতরাং ওদের জন্যে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।

১১

অরুণা আবার অফিসে আসতে লাগল। দিন দুয়েকের ভেতরেই বেশ বুঝতে পারলে হঠাৎ তার দাম অনেক বেড়ে গেছে অফিসে। খাতির করে কথা বলছে সকলেই। জেনারেল ম্যানেজার স্বয়ং একদিন তলব দিলেন। দু'চারটি প্রশ্ন করলেন কাজ সম্বন্ধে। বললেন, "বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম কর। তোমাকে এবার বড় কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে। চমৎকার মেয়ে তুমি। আই উইস্ ইউ গুড লাক।" (তোমার সৌভাগ্য কামনা করি)।

সহজে কখনও যা' হয় না, এ অফিসে তাই হোল। মাত্র কয়েক মাস চাকরি করে অরুণার একেবারে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল। মানে একটি বেশ বড় রকম ঢিল পড়ল ভিমরুলের চাকে।

একটি লোক এত সব ব্যাপারের কিছুই টের পেলে না। পরম নির্বিকার চিত্তে ঘরের ভেতরে বসে কাজ করে যেতে লাগল। জেনারেল ম্যানেজার

আর অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসাররা তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই যে এমন একটি কাজ করলেন, তা' সে জানতেও পারলে না। অরুণাকে ঘরে ডেকে এনে চেঁচামেচি করে নিজের গাড়িতে বাড়ি পাঠান কর্মটি ডালপালা বিস্তার করে কত বড় মহীরুহে পরিণত হয়েছে, সে খবর তার ঘরের ভেতর পৌঁছালই না।

বেচারী অরুণা পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। অনেকেই এসে আরম্ভ করলে তার তোষামোদ করতে। চৌধুরী সাহেবকে বলে এটা করে দাও, ওটা করে দাও। আর একদল গজরাতে লাগল, কোন্ আইনে তাদের ডিঙিয়ে একজনের মাইনে বেড়ে যাবে একেবারে পঞ্চাশ টাকা। বাইশ বছরের চাকরি ভবতোষ বাবুর। তিনি বহু চেষ্টায় তাঁর জামাই রজত রায়কে ঢুকিয়েছিলেন অফিসে। হাজার দেড়েক টাকার ক্যাশ এধার-ওধার করে ছোকরা সাসপেণ্ড হয়েছিল, হয়ত জেলও হয়ে যাবে। প্রৌঢ় ভবতোষ বাবু তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন গিয়ে কার্তিক বসু লেনের নিকুঞ্জ ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তারের সামনেই অরুণার দু'হাত ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাঁচাতে হবে তাঁর জামাইকে।

"দেখ মা—তুমি একবার মুখ তুলে দেখ। আমার মেয়ে তোমার চেয়ে বেশী বড় হবে না। যদি জামায়ের জেল হয় তাহলে এই মেয়ে কি আমার বাঁচবে।"

নিকুঞ্জ ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এর মধ্যে কি এমন ক্ষমতা পেলে অরুণা যে একজনের জেল পর্যন্ত বাঁচাতে পারে। রাগে দুঃখে ক্ষোভে অপমানে অরুণা কাঠ হয়ে বসে রইল। কোনও রকমে তাড়াতাড়ি ভবতোষ বাবুকে বিদেয় করলে। এসব কথা বাবার কানে গেলে কি আর রক্ষে আছে। মিথ্যা সত্যি যাচাই করতেও যাবেন না তিনি। মেয়ে একজন অফিসারকে হাতের মুঠোয় পুরেছে, তার অর্থ যে কি সেইটুকু বুঝে নিয়ে সোজা গলায় দড়ি দিবেন। অরুণা ঠিক করলে—কাল একবার যে করেই হোক দেখা করবে প্রবীর চৌধুরীর সঙ্গে। তারপর দেবে চাকরি ছেড়ে। না হয় না খেয়ে মরবে

বাপ মা ভাইবোন নিয়ে—তবু তার বাপ-মা তার জন্যে অপমানে আত্মহত্যা তো করবেন না।

১২

কোমরে আঁচলটা শক্ত করে গুঁজে অরুণা গিয়ে দাঁড়ালো চৌধুরী সাহেবের ঘরের সামনে। বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ আওয়াজ তার কানে বাজতে লাগলো। চাপরাসী তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। পর মুহূর্তেই দরজাটা একটু ফাঁক করে টুপ করে ঢুকে গেল ঘরের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে শোনা গেল, "ভেতরে আসুন।"

চাপরাসী বেরিয়ে এসে দরজা ঠেলে ধরলে। অরুণা পা দিলে ঘরের ভেতর।

"আরে এই যে! নমস্কার—নমস্কার। বসুন ঐ চেয়ারটায়। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে।" একেবারে ভদ্রতার অবতার! কিন্তু অসভ্যের মত অত চেঁচিয়ে কথা বলছে কেন? রাগে সর্বশরীর জ্বলে গেল অরুণার। কি বেহায়া—এত লোকে এত কথা বলাবলি করছে, একটুকু যদি গায়ে লাগে লোকটার। মোটা মাইনে পায়, সকলের মাথার ওপর বসে আছে—লোকের বলাবলিতে ওর কি যায় আসে।

অরুণা বসল না। চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

"বসুন বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন যে।" এবার আরও চেঁচিয়ে। এটা যে অফিস তাও ভুলে গেল নাকি! দুটো চাপড় মারলেন ঘণ্টায় চৌধুরী সাহেব। চাপরাসী মুখ বাড়ালে দরজা দিয়ে। তৎক্ষণাৎ হুকুম হয়ে গেল "দুটো কোল্ড ড্রিঙ্ক।" অরুণা দেখলে বিপদ আরও বাড়ছে। তাড়াতাড়ি বললে, "একটু কথা ছিল।" একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল চৌধুরী সাহেবের গলা, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বসে পড়ুন না ঐ চেয়ারটায়, একটা ঠাণ্ডা কিছু খেতে খেতে কথা বলুন। শুনি কি বলতে এসেছেন।" এবার অফিসসুদ্ধ লোক শুনিয়ে ছাড়বে নিশ্চয়। অরুণা বুঝলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। বললে,

"এখানে বলা যায় না সে কথা।" তৎক্ষণাৎ চৌধুরী সাহেব চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।

"সেই ভাল কথা। বেশ বলেছেন। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। কোন্ ডিপার্টমেণ্ট আপনার যেন?" বলেই ফোনে হাত দিলেন।

"হ্যালো—মিঃ সোমকে চাই। হ্যাঁ, কে সোম! আমি বাইরে যাচ্ছি। আর ভাল কথা—অরুণা দাশগুপ্তা যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। ঐ ডিপার্টমেণ্টে কথাটা বলে দিও। নাঃ, তেমন খারাপ খবর কিছু নয়। তবে এখুনই যেতে হচ্ছে বাইরে।" ফোন রেখে দিয়ে জামাটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে বললেন, "চলুন।"

কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে তখন অরুণার। সেও মরিয়া হয়ে উঠল। যা' হবার তা' তো হয়েই গেল। এতক্ষণ অফিসসুদ্ধ সবাই কি করছে তা' সে কল্পনায় দেখতে পেলে। চাকরি তো ছাড়তে হবেই। সুতরাং একটা চরম বোঝাপাড়া আজ করতেই হবে লোকটির সঙ্গে।

মাথা তুলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে সে বললে, "চলুন।"

১৩

গাড়িতে উঠে চৌধুরী বললে, "বলুন কোথায় যাওয়া যায়।"

সজোরে ঝামটা দিয়ে উঠল অরুণা, "চুলোয়"।

"তার মানে! সেটা কি একটা যাবার জায়গা নাকি!"

ঘুরে বসল অরুণা, "বলুন তো কি হয়েছে আপনার?"

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললে মণিকান্ত, "কই! কিছুই হয়নি তো!"

দাঁতে দাঁত ঘষে বললে অরুণা, "তবে? তবে এ রকম হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হলেন কি করে?" মুখ দিয়ে আর একটিও কথা বেরুল না মণিকান্তর। কি রকম যে হয়ে গেল সে। কোথায় উবে গেল তার উচ্ছ্বাস আনন্দ। চুপ করে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল অরুণা, "ভদ্রলোক আপনি। মনে হয় বেশ বড় ঘরের ছেলে। অতবড় চাকরি করছেন—এত লেখাপড়া শিখেছেন। কিন্তু এ রকম মতিভ্রম কেন আপনার? আমার মত একটা নিঃসহায় ভিখিরীর পেছনে কেন লেগেছেন অমন করে! কে সেধেছিল আপনার অফিসে আমার চাকরি করে দিতে—কে বলেছিল ছ'মাসের মধ্যে আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে! সুনাম বদনামের পরোয়া আপনার না থাকতে পারে। কিন্তু এ সব জানতে পারলে আমার বাবা বিষ খাবেন—মা গলায় দড়ি দেবেন। আমরা গরীব, বাড়ি ঘর সমস্ত খুইয়ে এখানে এসেছি। আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে বাবা উপোস করছিলেন তবু আমায় চাকরি করতে দিতে চাননি। বহু কষ্টে তাঁকে রাজী করিয়ে আমি দু'বেলা দু' মুঠো দিতে পারছি মা ভাই বোনের মুখে। কি করেছি আমি আপনার? আমার সর্বনাশ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন? কালই আমি ছেড়ে দোব এ চাকরি—"

আর বলতে পারলে না অরুণা। কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ির অন্য কোণে রক্তশূন্য মুখে বসে রইল মণিকান্ত।

ডালহাউসির কোণায় এসে মঙ্গল সিং জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যেতে হবে?"

চোখের জল মুছে অরুণাই হুকুম করলে, "অফিসে ফিরে চল।"

আর একটিও কথা হোল না গাড়িতে। অরুণা নেমে গেল গাড়ি থেকে। মণিকান্ত নামলে না। দুই চোখ বুঁজে গাড়ির কোণায় বসে রইল সে। মুখে শুধু বললে, "বাড়ি চল এবার।"

১৪

মিনিট সাতেকের মধ্যে ওকে ঘুরে আসতে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। অনেকে এসে ঘিরে ধরলে। ভবতোষবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "বলেছ তো মা চৌধুরী সাহেবকে!" অরুণা চুপ করে রইল।

ভবতোষ নিশ্চিন্ত হলেন। "আশীর্বাদ করি তুমি রাজরাজেশ্বরী হও মা"। আরও কি সব বিড়বিড় করে বলতে বলতে তিনি সরে পড়লেন।

জেনারেল ম্যানেজার আয়ার ডেকে পাঠালেন।

"কি হোল চৌধুরীর? কোথায় গেল সে?"

যা' মুখে এল তাই বলে দিলে অরুণা, "হঠাৎ শরীর খারাপ বোধ করে বাড়ি চলে গেলেন।"

আয়ার চাইলেন চৌধুরীর বাড়ির নম্বর। ধরলেন ছোট মামা।

"আমি আয়ার, অফিস থেকে ফোন করছি। চৌধুরীর সংবাদ কি?"

আকাশ থেকে পড়ল ছোট মামা। বড় ভাইকে ডেকে দিলে ফোনে।

সুরেশবাবু বুঝলেন জেনারেল ম্যানেজার কথা বলছেন। তিনি বললেন, "বোধ হয় মাথা ঘুরছে ওর।"

আয়ার বললেন, "ছুটি নিতে বলুন ওকে কিছুদিন। যে বিশ্রী কাজ করতে হয় তাতে শরীর খারাপ হবেই। চৌধুরী একটু সুস্থ হলে দয়া করে জানাবেন যে আমি ফোন করেছিলাম। কালই যেন সে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়।"

ফোন রেখে বিভ্রান্ত অবস্থায় বেরুলেন সুরেশবাবু। বারান্দা থেকে নজরে পড়ল মণিকান্তর গাড়ি ঢুকল গেটের ভেতর। গাড়ি থামতে নামল মণিকান্ত, টলতে টলতে উঠে এল ওপরে। সুরেশবাবুই এগিয়ে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরলেন! টেনে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে।

দেড় ঘণ্টা পরে সুরেশবাবুর ঘরের দরজায় কান পাতলে শোনা যেত, ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে মণিকান্ত, "শুধু শুধু—একেবারে শুধু শুধু আমাকে একটা নীচ হ্যাংলা যা' তা' ভাবলে সে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।"

সুরেশবাবু ওর মাথার কোঁকড়ান চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে বললেন, "ভাবুক যা' খুশি, তাতে তোর কি? ভাবলেই অমনি তুই নীচ হ্যাংলা হয়ে গেলি নাকি! পাগল কোথাকার।"

ছেলে নেই সুরেশবাবুর। আছে মণিকান্ত। নিজে পছন্দ মত তাকে মানুষ করে তুলেছেন। দুনিয়ার সমস্ত লোক যদি একবাক্যে বলে যে মণিকান্ত খারাপ, তিনি তা' বিশ্বাস করবেন না কিছুতেই। খাঁটি সোনায় কলঙ্ক ধরে কখনও! সেই রাত্রেই সুরেশবাবুর মা ভবতারিণী দারুণ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, "কি, এত বড় আস্পদ্দা—আমার মণিকে হেনস্তা করেছে সেই মেয়ে। খোকা ঐ মেয়েই আনতে হবে যে করে হোক। আমি আর কোনও কথা শুনতে চাই না।"

১৫

চৌধুরী সাহেব ছ'-মাস ছুটি নিয়েছেন। অরুণা চাকরি ছাড়েনি। ভবতোষ এখনও জ্বালাচ্ছেন তাকে। আর বেশী দিন জ্বালাতে হবে না ভবতোষকে। অরুণা চাকরি ছেড়ে দেবে এবার। তার বাবা ডাক্তার হয়ে যাচ্ছেন শিলচরের এক চা বাগানে। এত দিনে একটা হিল্লে হোল ওদের সংসারের। শিলচরে গিয়ে অরুণা স্কুল মাষ্টারি জুটিয়ে নেবে। যতদিন না ছোট ভাই দু'টি মানুষ হচ্ছে, মাষ্টারি করবে সে। কিছু টাকা জমানো দরকার। বাবা আর কতদিন চাকরি করতে পারবেন।

কিন্তু তবু যেন মনের মধ্যে কোথায় খচখচ করতে থাকে অরুণার। কাজ করতে করতে হঠাৎ তার হাতের আঙ্গুল থেমে যায়। চৌধুরী সাহেবের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে আসতে বুকের ভেতরে একটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কে একজন পাঞ্জাবী এসেছেন বোম্বে অফিস থেকে ঐ ঘরে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায় ঐ ঘরের দরজা অরুণা। এক মাথা কোঁকড়া চুলসুদ্ধ গোল মুখ একটি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কি করুণ, কি অসহায় দেখিয়েছিল সেদিন সেই চোখ দু'টি। থরথর করে কাঁপছিল পাতলা ঠোঁট দু'খানি। যেন দম আটকে এসেছিল। অরুণার দিকে চেয়ে ছিল শূন্য দৃষ্টিতে। জোর করে একটা নিঃশ্বাস চেপে ফেলে অরুণা। কি জানি এখন সে কোথায়। বড় লোক তো—বোধ হয় হাওয়া খেতে চলে গেছে অনেক দূরে।

বাসে উঠে বসে অরুণাও অনেক দূরে চলে যায়। সমুদ্রবেলায় তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায় অরুণা। এক সময় কখন তার মোটা মোটা আঙুলগুলো দু'-হাতের মধ্যে নিয়ে খেলা করতে শুরু করে। সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শাড়ির আঁচল উড়িয়ে নিয়ে তার গায়ে জড়িয়ে যায়। হঠাৎ গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে দু'জনের। অরুণা বলে, "দেখ আবার পা মাড়িয়ে দিও না যেন।" অমনি ভয় পেয়ে যায় বোকা লোকটি, "লাগেনি তো পায়ে, দেখি দেখি কোথায় লাগল।" নিচু হয়ে পা দেখতে যায়। খিল-খিল করে হেসে ওঠে অরুণা।

চীৎকার করে ওঠে বাসের কণ্ডাকটার—হাতিবাগান গ্রে স্ট্রীট।

চমক ভাঙে অরুণার। একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেলে নেমে পড়ে বাস থেকে।

১৬

জল খাবারের থালা সামনে দিয়ে মা বললেন, "কাল রবিবার, কাল বিকেলে তোকে দেখতে আসবে। কথাবার্তা এক রকম ঠিকই হয়ে গেছে। ছেলের দিদিমা একবার চোখের দেখা দেখে আশীর্বাদ করে যাবেন কাল। এত দিনে মা শুভচণ্ডী মুখ তুলে চাইলেন—তোকে উপযুক্ত ছেলের হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে শিলচর চলে যাব!"

কোনও রকমে অরুণার মুখ দিয়ে বেরুল, "তার মানে? আগে আমায় বলনি কেন তোমরা এই সমস্ত কথা—"

মা বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, "আগে থাকতে তোকে শুনিয়ে কি লাভ হোত। কর্তা সব ঠিক ঠাক করে ফেলেছেন, এবার তো তুই জানতেই পারবি।"

থালাখানা ঠেলে দিয়ে অরুণা উঠে চলে গেল এবং যা' কখনও করে না, তাই করলে সে। চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সন্ধ্যার পর।

দু'ঘণ্টা পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে। কি ভয়ানক কথা—এক মাস পার হোল না—একি ঘটতে বসেছে তার জীবনে! এই জন্যই সে অতবড় আঘাত দিয়েছিল প্রবীর চৌধুরীকে? আজ আর মা বাপের কাছে কানাকড়ির দাম নেই তার? তার মতামত জানবারও কোন দরকার নেই। হাত পা বেঁধে যেখানে খুশি, যার হাতে খুশি, ফেলে দিতে পারলেই হোল। আপদ বিদেয় করে ওঁরা শিলচরে যাবেন নিশ্চিন্ত হয়ে। কি মিথ্যে অহঙ্কার নিয়ে সে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে সেই নির্দোষ লোকটিকে। বার বার বুকের ভেতর স্পষ্ট ফুটে উঠল সেই ছবিখানি. একখানি নির্দোষ নিষ্পাপ মুখ! এক মাথা কোঁকড়া চুল, থরথর করে কাঁপছে পাতলা ঠোঁট দু'খানি।

বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে হাঁটছে অরুণা। পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে তার চমক ভাঙল। এ কোথায় এল সে! এ রাস্তাটার নাম কি! এখন রাত ক'টা?

পাশের দোকানের ঘড়িতে দেখলে রাত সাড়ে আটটা। দোকানের সাইন বোর্ডে রাস্তার নাম দেখে আবার একবার চমকে উঠল সে। এ তো সেই রাস্তা। বহুবার শুনেছে এই রাস্তায় চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। মনে করবার চেষ্টা করলে, কত নম্বর যেন চৌধুরী সাহেবের বাড়ির! মনে করতে পারলে না। সামনের দোকানদারকেই জিজ্ঞাসা করে বসল, "আচ্ছা বলতে পারেন অমুক অফিসে চাকরি করেন মিঃ চৌধুরীর বাড়ি কোথায়?"

আঙ্গুল উঁচু করে দেখিয়ে দিলে ছেলেটি, "ওই যে গেট, সোজা চলে যান ভেতরে।"

চলল।

জেনে আসতেই হবে কোথায় গেছেন চৌধুরী সাহেব। তারপর চলে যাবে সেই দেশে। গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, "দাও তোমার যে শাস্তি ইচ্ছে। সব অহঙ্কার আমার ঘুচেছে। যে আঘাত দিয়েছি তোমায়, তার ষোলগুণ ফিরিয়ে দাও তুমি আজ।"

১৭

"কে, কাকে চান?"

অরুণা দেখলে সে পৌঁছে গেছে কখন বারান্দার সামনে ছোট বাগান পার হয়ে। ঢোক গিলে বললে, "মিঃ চৌধুরী এখন কোথায় তাই জানতে এসেছি।"

ইলেকট্রিকের আলোয় ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কেমন যেন হয়ে গেল প্রশ্ন কর্তার মুখের অবস্থা। যেন ভূত দেখেছেন। ঢোক গিলে বললেন, "আসুন ভেতরে, ডেকে দিচ্ছি।"

ভারি পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটি নজরে পড়ল অরুণার—তা' হচ্ছে তার নিজের ফটোখানি। যেখানি এখন তাদের ঘরেই দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো থাকবার কথা।

"বসুন তাকে ডেকে আনছি"—বলে ভেতরে চলে গেলেন ভদ্রলোক। বাড়ির ভেতরে শচীন কত্তার রেকর্ড বাজছে। অরুণার কানে গেল—

"আজিও ফাগুনে হাসে বনতল
আমার নয়নে বরষা উতল
কুটীরে আমার কে জ্বালিবে আর দীপ শিখাটিরে।"

তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

১৮

ছুটে এলেন ভবতারিণী, সুরেশবাবু, পরেশবাবু, মেজ বৌ, ছোট বৌ সবাই। ছোট মামা আর কাউকে জড় করতে বাকি রাখলে না। অরুণার সংজ্ঞাহীন দেহ তুলে নিয়ে যাওয়া হোল বাড়ির ভেতর।

সুরেশবাবু তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালেন হাতীবাগানে। মা লক্ষ্মী সেধে তাঁর বাড়িতে এসে উঠেছেন।

সিনেমা থেকে ফিরে মণিকান্ত এমন ভ্যাবাচাকা খেলে, যা' সে আর জীবনে কখনও খায়নি।

বাগীশ্বরী

লোকে বলত—সাক্ষাৎ হরপার্বতী।

বলত যারা, তাদের সঙ্গে আসল হরপার্বতীর চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় কখনও ঘটেছিল কি না তা' অবশ্য কেউ হলপ করে বলতে পারে না। তবে সকলেই দেখেছে হরপার্বতীর পট। সেই পটের সঙ্গে ওঁদের রূপ হুবহু মিলে যেত বলেই লোকে বলত।

রাস্তার লোক থমকে দাঁড়িয়ে ওঁদের দিকে চেয়ে থাকত। ওঁরা চলে যেতেন, দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেলে লোকে বুক খালি করে নিঃশ্বাস ফেলত। কড়ের্ঁাড়ী হয়ে যাঁরা তিনকাল কাটিয়ে এককালে পৌঁছেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিজবিজ করে বলতেন—"আহা যেন সাক্ষাৎ নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়া, এমন সোনার কপাল মানুষ কত পুণ্যে করে আসে গো!" বলে কুঁজো বুড়ীরা লাঠি ঠক্ঠক্ করে নিজের পথে চলে যেতেন।

মিলই বটে, সব দিক দিয়ে ওঁদের মিল ছিল। এক জাতের মাটি দিয়ে এক ছাঁচে গড়া দু'টি মূর্তি। দু'জনের অঙ্গ-বর্ণ আর অঙ্গাবরণের বর্ণও এক। ফিকে কমলা রঙের মোম দিয়ে গড়া দু'টি নিখুঁত পুতুল, ঐ রঙেরই পাড়হীন সিল্কের কাপড় চাদর দিয়ে ঢাকা। তফাতের মধ্যে একজন অপরের চেয়ে হাতখানেক বড়। বড়টির ভ্রমরকৃষ্ণ কোঁকড়ানো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে, ছোটটির মেঘের মত কেশ পিঠ ছাপিয়ে কোমরের নিচে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'জনেরই মসৃণ মুখে একজোড়া করে কালো ভুরু আর কালো চোখের পল্লব ছাড়া অন্য রঙের চিহ্নমাত্র নেই। কাপড় চাদর পরার ধরনও একরকম দু'জনের। তবু বুঝতে কষ্ট হ'ত না যে বড়টি পুরুষ, ছোটটি পুরুষ নয়। ওঁদের চলন দেখেই ধরা যেত। বড়টি চলতেন মাথা উঁচু করে, শিরদাঁড়া খাড়া রেখে, লম্বা লম্বা পা ফেলে। যাকে বলে সিংহের মত চলা, সেই চলনে চলতেন তিনি। ছোটটি চলতেন মাথা নিচু করে পথের দিকে চেয়ে। তাঁর চলন

দেখে মনে হ'ত, যেন ছন্দবদ্ধ একটি সাকার কবিতা, যেন একটি জীবন্ত সুর-হিন্দোল রাগের ললিতা বা পটমঞ্জরী। বড়টি চলতেন কয়েক পা সামনে এগিয়ে, ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করতেন ছোটটি। চলার সময় আশেপাশে কোনও দিকে ওঁরা তাকাতেন না। দেখবার মত কিছুই নেই কোথাও বলেই তাকাতেন না। দুনিয়ার সব কিছুই এত তুচ্ছ এত খেলো যে কোনও দিকে নজর দেবার ওঁদের প্রয়োজনই হ'ত না।

মাঝে মাঝে ওঁদের দর্শন পাওয়া যেত কাশীতে। একদিন সকালে দেখা গেল ওঁরা কেদারনাথ দর্শন করে বেরিয়ে আসছেন, আর একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল বটুক ভৈরবের বাড়িতে প্রদক্ষিণ করছেন। আবার হয়ত একরাত্রে বিশ্বনাথের আরতির সময় দেখা গেল—সকলের থেকে একটু তফাতে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে আরতি দেখছেন ওঁরা। আর সমবেত দর্শনার্থীরা বিশ্বনাথের দিকে না চেয়ে ওঁদের দিকেই চেয়ে আছেন।

ভক্তিমান-ভক্তিমতীরা ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলেন এবং দুঃখ পেলেন। ভক্তি দেখতে গিয়ে যদি শুনতে হয়—নিজের কাজে মন দাওগে যাও, তা' হলে মানুষ ক্ষেপবে না কেন। কিন্তু ওঁদের নিজস্ব পাঞ্জাবী গুজরাটী মাড়োয়ারী ভক্ত-ভক্তাদের বিপুল বপুগুলির বেষ্টনী ভেদ করে গায়ে আঁচ লাগে না। পরম নিশ্চিন্তে ওঁরা দেবতা দর্শন করে ফেরেন। বড় বড় টুকরি ভর্তি ফল আর ফুল আর ঘড়া ভর্তি দুধ নিয়ে ওঁদের পার্শ্বচররা সঙ্গে যান। দেবতাকে কাঁচা দুধে স্নান করিয়ে স্তূপাকার ফুলে ঢেকে দেন। অঞ্জলি ভরে ফল নিবেদন করেন। টাকা পয়সাও অঞ্জলি ভরে প্রণামী দেন। গোনা-গাঁথা হিসাব-নিকাশের ধার ওঁরা ধারেন না, অত ছোট কাজ ওঁদের পোষায়ও না।

কাশীতে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য হ'ল না আমার, জলুস দেখে ওঁদের কাছে ঘেঁসতে সাহস হ'ল না। বছর চারেক পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সৌভাগ্যের উদয় হোল। স্বামীজী মহারাজদের স্বর্গ খাস হরিদ্বারে। ওখানকার স্বনামধন্য শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ ভারতী মহারাজ আর শ্রীশ্রীবাগীশ্বরী

মাতাজীর সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হলাম। ধন্য না হয়ে উপায়ও ছিল না, এ হেন শোচনীয় অবস্থা আমার তখন।

বিহঙ্গ ব্রত, অজগর ব্রত আর কাষ্ঠ মৌনব্রত—এই তিনটি নেহাত গোবেচারা ব্রত পিঠে বেঁধে নিয়ে তিন তিনটে বছর হিমালয়ের মধ্যে কাটিয়ে সেদিনই সকালে পদার্পণ করেছি হিমালয়ের সদর দরজা হরিদ্বারে। এইবার নেমে যেতে হবে। সামনে আসমুদ্র ভারত পড়ে রয়েছে, হিমের আলয় নয়, তার চেয়ে ঢের সাংঘাতিক—মানুষের আলয়। হিমের দেশেও মানুষ থাকে, কিন্তু সেখানে সব মানুষই পরবাসী। ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিম আর ক্ষুধা, এদের সঙ্গে আমরণ সংগ্রাম করে টিঁকে থাকতে হয় সেখানকার মানুষকে। সেখানে মানুষের কাছে মানুষের দাম আছে। মানুষ পেলে সেখানকার মানুষ বর্তে যায়। সকলের শত্রু হিম আর ক্ষুধার সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে। না চাইতে সেখানে মাথা গোঁজার স্থান মেলে, দিনান্তে শুকনো রুটি আর নুন হাতে নিয়ে সেখানকার মানুষ মানুষের মুখে তুলে দিতে এগিয়ে আসে।

কিন্তু মনুষ্য-আলয়ে আছে হোটেল বাজার খাবারের দোকান খোলা। দেশময় রেল লাইন আছে পাতা। ট্যাঁকে রেস্ত থাকলে কোন কিছুরই অভাব নেই। কাজেই হিমালয়ের মানুষের মত এখানে কেউ কারও সেধে খোঁজ নিতে যাবে না, সে ফুরসতও নেই কারও।

হিমের দেশে তিন বছর কাটাতে যা' রসদ লেগেছে এখানে শুধু সেইটুকু জুটলে কিছুতেই চলবে না। সেখানে দিনান্তে 'শুখা রুখা' দু'খানি রুটি আর নুন জুটলেই যথেষ্ট। এখানে নাকের ডগায় লুচি মোণ্ডা পোলাও কালিয়া নাচছে, সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে শুকনো রুটি নুন মুখে রুচবে কেন! সেখানে শরীর আর শালীনতা ঢাকবার জন্যে হিম আর ধুনির কাঠ আছে, এখানে পায়ে পায়ে দর্জি বসে আছে কল কোলে নিয়ে। সেখানে ঘণ্টায় ষাট মাইল পার হবার কল্পনা কেউ করতে পারে না আর এখানে একটি রাত্তে মানুষ হাই তুলতে তুলতে কাশী থেকে কাঞ্চী পৌঁছে যায়। কাজেই মহা চিন্তায়

পড়ে গেলাম। অনায়াসে তিন বছর হিমের দেশে কাটিয়ে এসে মানুষের আলয়ে পা দিয়েই ঘাবড়ে গেলাম। সকাল থেকে ঘুরছি আর ভাবছি। ঘুরছি বাজারের মধ্যে আর মাঝে মাঝে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ওঠা গেলাসগুলোর দিকে চেয়ে ঢোক গিলছি।

হঠাৎ পেছন থেকে দু'কাঁধ ধরে কে টান দিলে। ভয়ানক চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে যাঁর চোখের সঙ্গে চোখ মিলল তাঁর দর্শন পাওয়ার স্বপ্ন মনের কোণে কখনও উদয় হয়নি। সেই রঙ, সেই মুখ, সেই টানা টানা দু'টি চক্ষু আর কাঁধ পযন্ত একরাশ কোঁকড়ানো চুল। চোখে মুখে সর্বাঙ্গে খুশির আলোর ঝলকানি।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। প্রথমে তিনিই কথা বললেন, কথা নয় যেন সঙ্গীত, সপ্তসুরের সম্পূরণ।

"কি ভাই, এখানে যে! এ কি অবস্থা তোমার!"

একটি কথাও বার হ'ল না আমার মুখ দিয়ে। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেন জানি না, আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

তৎক্ষণাৎ নিজের গা থেকে সিল্কের চাদরখানি খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। দিয়ে ডান হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চললেন। বাজারের লোক হাঁ করে চেয়ে রইল ওঁর দিকে। হঠাৎ একটা পথের ভিক্ষুককে ওভাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে দেখে সবাই ঘাবড়ে গেল। কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই মহারাজজীর। সামনে বড় রাস্তায় পৌঁছে একখানা টাঙ্গা থামিয়ে আমাকে নিয়ে চড়ে বসলেন। টাঙ্গা ছুটল।

অকপট আত্মসমর্পণ ব্যাপারটা ঘটে বোধ হয় চরম অসহায়তা বোধ থেকে। তিন বছর হিমালয়ে বাস করে যেদিন মনুষ্য-আলয়ের দরজায় ফিরে এসে দাঁড়ালাম সেদিনের সেই শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়। খালি পেট, এমন খালি যে পিঠে পেটে লেগে গেছে। সর্বাঙ্গ ফাটা, এ হেন ফেটেছে যে সাদা জলের মত রস বার হচ্ছে মুখ কপাল আর হাতের চেটো থেকে। দুই

চোখের ওপর নিচের পাতায় ঘা, হিমালয়-বাসের জীবন্ত ফল, পিসু পোকার দংশন থেকে যার উৎপত্তি। ঠোঁট দু'খানা ফোলা আর সোনাগোধার মত গায়ের রঙ্। সেই বিকট মূর্তির আবরণ মাত্র কৌপীন আর এক চিলতে ন্যাকড়া। এ হেন চমৎকার অবস্থায় আমায় পাকড়াও করে শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দজী মহারাজ সেদিন যখন টাঙ্গায় তুললেন তখন আমার দ্বিধা সংশয় বা ভাবনা চিন্তার না ছিল অবকাশ না ছিল সামর্থ্য। তখন একটি বারের জন্যেও স্মরণ হ'ল না আর একজনের সাবধান বাণী। সাড়ে তিন বছর আগে এই স্থান থেকে বিদায় দেবার সময় সেই বাণী শুনিয়ে তিনি আমায় বিদায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—"সাবধান বেটা, কখনও হরিদ্বারে বা হৃষিকেশে আটকা পড়িস নে। এ বড় ভীষণ দ', এখানের ঘূর্ণিজলে জাল ছেঁড়া বাঘা মাছেরা জন্মের মত আটকা পড়ে ঘায়েল হয়ে যায়। ওজনদরে ধর্ম বস্তুটার কেনাবেচার এত বড় বাজার ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই।" ভাগ্যের পরিহাসকে সেদিন সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছিল। দ'য়ে মজবার জন্যে রওয়ানা হলাম টাঙ্গায় চড়ে। পরম নিশ্চিন্তে তাঁর পাশে বসে রইলাম।

হরিদ্বার স্টেশনের ওধারে উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা বাগানের সামনে টাঙ্গা থামল। স্থানটি নির্জন, প্রসিদ্ধ তীর্থের প্রচণ্ড গোলমাল এতদূরে পৌঁছতে পারেনি। স্বামীজী নামলেন, নেমে আমাকেও টেনে নামালেন হাত ধরে। টানতে টানতেই নিয়ে চললেন আমায় গেটের ভেতর।

হিমালয়ের মধ্যে পাহাড়ী ঝর্ণা যে রকম অনর্গল বকতে বকতে ছুটে চলে সেই ভাবে অনর্গল কথার স্রোত ছুটতে লাগল তাঁর মুখ থেকে।

"কি ভয়ানক কাণ্ড! এই কিম্ভুত কিমাকার মূর্তি দেখে কার সাধ্য চিনবে। একেবারে ব্যাস বাল্মীকি বনে গেছে মানুষটা। সেই চার পাঁচ বছর আগে দেখেছিলাম কাশীতে। তারপর যতবার কাশী গেছি, খোঁজ করেছি। সবাই বলে পালিয়েছে। কেন পালিয়েছে, তাও কেউ জানে না। বদখত কিছু একটা ঘটিয়ে পালিয়েছে কি না? না তাও নয়। তবে খামকা মানুষটা গা ঢাকা দিতে

গেল কেন! তখন এই রকমই কিছু একটা ধারণা হয়েছিল আমাদের—নিশ্চয়ই কোথাও সাধন-ভজন বা তীর্থদর্শন করতে গেছে। একি অমানুষিক কাণ্ড! ভগবান রক্ষা করুন—আমার ভগবান দর্শন পাওয়ার দরকার নেই বাবা।"

হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল, পা যেন গেড়ে বসে গেল মাটির মধ্যে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন আমার একটা হাত ধরে। চেয়ে দেখলাম তাঁর মুখের দিকে। সর্বেন্দ্রিয় ষোলআনা সজাগ হয়ে উঠেছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কি যেন তিনি শোনবার চেষ্টা করছেন সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে।

একটু পরে আমার কানেও পৌঁছুল। শুনতে পেলাম সুরের মূর্ছনা। আরও ভাল করে শোনবার চেষ্টা করলাম। কান ঠিক নেই, অবিরাম পাহাড়ী নদীর গোঙানি শুনতে শুনতে কানের দফাও রফা হয়ে গেছে।

যেন একটি একান্ত গুহ্য কথা বলছেন, এইভাবে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে মহারাজ বললেন—"মধু মাধবী, মধু মাধবী সারঙ্গ।" বলে আবার আমায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন।

কয়েকটা বড় বড় গাছ পার হয়ে চোখে পড়ল একখানি দোতলা বাড়ি। দোতলায় ছাদের ওপর একখানি মাত্র ছোট ঘর। মনে হ'ল যেন সেখান থেকেই ভেসে আসছে সেই সুর।

বাড়ির সামনে টানা রোয়াক। রোয়াকে উঠতে স্পষ্ট শোনা গেল—

"দাদুর মোর পাপীহা বোলে
কোয়ল শবদ শুনাঈ।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
চরণকমল চিত লাঈ॥"

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে তিনি উঠে গেলেন দোতলার ছাদে। আমার হাত তখনও ধরাই রয়েছে তাঁর হাতে, সুতরাং আমাকেও যেতে হ'ল সঙ্গে। ছাদে যখন পৌঁছলাম তখন সুর থেমে গেছে, মীরা বোধ হয় প্রণতা হয়েছেন প্রভুর চরণে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ পাশে ঘরের দরজা। দরজাতেও কমলা রঙের পর্দা ঝুলছে। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় চুপি চুপি স্বামীজী ডাক দিলেন—"শ্রী!"

সাড়াশব্দ নেই।

আরও চাপা গলায় প্রায় রুদ্ধশ্বাসে আবার ডাক দিলেন স্বামীজী—"শ্রী, দেখ এসে, কাকে সঙ্গে এনেছি।"

পর্দা নড়ে উঠল। পরমুহূর্তে পর্দার গায়ে ফুটে উঠল একখানি ছবি। কমলা রঙের পর্দার ওপর এক রাশ তিমিরবরণ কেশের ঠিক মাঝখানে একখানি মুখ। শুধু দু'টি আঁখি। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম আঁখি দু'টির দিকে।

আঁখিই বটে। চক্ষু নেত্র লোচন নয়ন আঁখি এই জাতের কথাগুলি দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন নাম—এ মনে করা ভুল। চক্ষু নেত্র নয়ন লোচন এ সব দিয়ে শুধু দেখা যায়, আঁখি দিয়ে দেখা যায়, দেখানোও যায়। যার আঁখি তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়—টলটলে আঁখির অনাবিল স্বচ্ছতার ভেতর দিয়ে। তাই বোধ করি কবি-মানুষের আঁখি কথাটির ওপর অত বেশী ঝোঁক।

ধীরে ধীরে আঁখি দু'টির ভাষা বদলাতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোরলাগা মেঘের বুকে অকস্মাৎ চমকে উঠল বিদ্যুতের ঝিলিক। স্পন্দন দেখা দিল ঠোঁট দু'খানিতে। অতি মৃদু স্বর শোনা গেল—"কাশীর সেই ব্রহ্মচারী না!"

"চিনেছ—চিনতে পেরেছ তা' হলে! হাঁ, কাশীর সেই তিনিই, কতবার আমরা গেছি এঁর ঠাকুরবাড়িতে—"

"কিন্তু এ কি অবস্থা!"

"হিমালয়ে গিয়েছিলেন তপস্যা করতে। তপস্যার ফল লাভ করে ফিরে এলেন। এখন আর মানুষ বলে চেনাই যায় না।"

"কি ভয়ানক! তপস্যা করলে এই রকম অবস্থা হয় মানুষের!"

"হবে না কেন? এঁরা তো আনন্দের তপস্যা করেন না। এঁদের যে দুঃখের তপস্যা—দুঃখ নিঙড়ে আনন্দের রস বার করার সাধনা করেন এঁরা।

হলাহল মন্থন করেন—অমৃত লাভের আশায়। ফলে একটা সুস্থ সবল মানুষের এই হাল হয়েছে।"

কোথা থেকে জল এসে গেল সেই আঁখি দু'টিতে। আঁখি দু'টি ছাপিয়ে সেই জল বড় বড় মুক্তার মত গড়িয়ে নামতে লাগল গাল বেয়ে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল সেই দৃশ্য দেখে, মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

হঠাৎ মহারাজজী সচেতন হয়ে উঠলেন আমার সম্বন্ধে। হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন। আশ্রম-পরিচারকরা ছুটে এল। দুধ চা গরম জল—সব লে আও এক সঙ্গে। আমার হাত ধরে টান দিলেন—"চল ভায়া চল, নিচে চল আবার, আগে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দাও কিছু। তারপর অন্য কথা।"

পর্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। ছবিখানি কখন মিলিয়ে গেছে। নিচে নেমে গেলাম আশ্রম-অধিপতির সঙ্গে।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে হাল ফিরে গেল: প্রথমে এক হাজম ডেকে তার হাতে আমায় সমর্পণ করা হল। তারপর সাবান গরম জল আর তেল নিয়ে এল দুই জোয়ান। তাদের হাত থেকে যখন পরিত্রাণ পেলাম তখন সুদীর্ঘ তপস্যার ফল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে প্রায়। শুধু ঠোঁট দু'খানা রয়েছে ফুলে। তাতে এমন কিছু অসুবিধা হ'ল না সিগারেট টানবার। মহারাজজী ইতিমধ্যে তাঁর হাতের মূল্যবান সিগারেট টিনটা জোর করে আমায় গছিয়ে দিয়েছিলেন।

খাওয়ার সময় আবার তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। সেই একই বেশে আছেন তখনও। গলা থেকে পা পর্যন্ত চাদরখানি ঠিক জড়ানো আছে। আমাদের খাওয়ার তদারক করবার জন্যেই বোধ হয় বসে আছেন। কিন্তু বসে আছেন বেশ একটু তফাতে। অবশ্য কিছুই করবার নেই তাঁর। সন্ন্যাসীকে সব এক সঙ্গে খেতে দেওয়া নিয়ম। সন্ন্যাসী তো খান না কিছুই, সব ব্রহ্মে অর্পণ করেন। পুরী ভাজি চাটনি দই পেঁড়া সব এক সঙ্গে থালায় সাজিয়ে সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমরা ব্রহ্মে অর্পণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

অসীমানন্দজীর অসীম শক্তি। খাওয়া আর বকা দু' কাজই এক সঙ্গে চালাতে পারেন। বকতেই লাগলেন তিনি।

"দেখ শ্রী, এবার আমরাও যাব তপস্যা করতে। এতদিনে একজন ভালো লোক পাওয়া গেল। সদ্য সদ্য তপস্যা করে ফিরলেন ইনি, সুতরাং আমাদের পথ বাতলাতে পারবেন। বেশ শক্ত গোছের একটা তপস্যা-টপস্যা না করে এলে কেউ মানতে চায় না আজকাল। সবাই ভাবে আমরা স্রেফ ফাঁকি দিয়ে সাধুগিরি চালাচ্ছি। এবার দেখাচ্ছি মজা, ভায়ার কাছ থেকে সুলুক-সন্ধানটা ভাল করে জেনেশুনে নি। তারপর সোজা একেবারে হিমালয়ের চূড়ায় উঠে চেপে বসব সেখানে।"

অত্যন্ত ধীরে ধীরে তিনি বললেন—"কিন্তু অত উঁচুতে উঠলে পড়ে যাবার ভয় যে।" অকপট উদ্বেগ উপলে উঠল তাঁর গলায়।

আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম। ছোট্ট কপালখানি কুঁচকে গেছে। গভীর চিন্তায় পড়ে গেছেন যেন। চেয়ে আছেন মাটির দিকে।

দপ্ করে জ্বলে উঠলেন স্বামীজী মহারাজ।

"ভয়! ভয়টা কিসের শুনি! দু'জনে এক সঙ্গে আছি কিসের জন্যে? একজনের যদি পা পেছলায় আর একজন তাকে টেনে তুলতে পারব না?"

অপর পক্ষ থেকে কোনও জবাব এল না। এক ভাবে তিনি নত মুখে বসে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ এক মনে খেয়ে গেলেন স্বামীজী। তারপর বোধ হয় ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার জন্যে হালকা ভাবে বললেন—"দু'জন নয়, এখন আমরা তিনজন। পা যদি কারও পেছলায়, হুমড়ি খেয়ে যদি কেউ পড়েই খাদে, তখন তার দু'হাত ধরে টেনে তোলবার জন্যে দু'জন আরও রয়েছে! এরপর আর ভয়টা কিসের?"

আরও চাপা গলায় যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন, এই ভাবে তিনি বললেন, "কি দরকার অত সাহস দেখিয়ে, তার চেয়ে যেমন চলছে তেমনিই চলুক।"

তারপর আর কথা চলল না। খাওয়া চলল।

খাওয়ার পর একখানি ঘর পেলাম। বহুকাল পরে চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা দরজা বন্ধ করে শোবার স্বাধীনতাসহ একখানি ঘর আর একখানি চারপায়া পেয়ে নিজেকেও খানিকটা স্বাধীন বলে মনে হ'ল। পড়লাম স্বাধীনভাবে ঘুমিয়ে। এ রকম নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে ঘুমোতে পেলে স্বপ্নও দেখা যায়। সুতরাং বহুকাল পরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটা কিন্তু জুতসই হ'ল না, দেখলাম একটা ট্রেন ফেল করার স্বপ্ন—স্টেশনে পৌঁছে দেখি গাড়ি ছাড়ছে। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে ছুটলাম। ট্রেন ছেড়ে দিলে। প্রাণপণ দৌড়লাম, প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটলাম গাড়িটার পিছু পিছু। ধরি ধরি করেও ছুঁতে পারলাম না গাড়িখানা। কোনও রকমে টাল সামলে বিলীয়মান ট্রেনখানার দিকে চেয়ে হাঁফাচ্ছি। ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ট্রেন ফেল করার মন মেজাজ নিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। একটু সময় লাগল আত্মস্থ হতে। কোথায় আছি, কি করছি সব মনে পড়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না যে তখন দিন না রাত। বিছানা ছেড়ে নেমে অন্ধকারে আন্দাজ করে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাত কত তাই বা কে জানে! দশ বার ঘণ্টার ওপর এক ঘুমে পার করে দিয়েছি। একটি প্রাণীও জেগে নেই কোথাও। দূরে স্টেশনের আলোগুলো শুধু জেগে রয়েছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছে। আর কোথায় যেন জেগে রয়েছে একটি সুর। অত্যন্ত করুণ সুরের একটি মাত্র কলি বার বার এক ভাবে বেজে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে সেই সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলল। কান পেতে রইলাম, তারপর স্পষ্ট শুনতে পেলাম—

> "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ, পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
> জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ, দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
> আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ, আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
> আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল, টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজতে লাগলাম। বৃষ্টি নয়, সুরের ঝরনা-ধারা ঝরে পড়তে লাগল আমার মুখের ওপর। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মাথা গোঁজবার স্থানের চিন্তা আর কায়িক যন্ত্রণাবোধ, এগুলো ছাড়া যে আরও কিছু অন্য জাতের ব্যথা-বেদনা বোধ থাকতে পারে এ জগতে, এ যে ভুলেই গিয়েছিলাম! দেহাতীত একটা কিছুর আস্বাদ পেলাম বহুকাল পরে। দেহাতীত একটা কিছু আস্তে আস্তে জেগে উঠল ভেতরে আমার। শুনতে লাগলাম—

"সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ, লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত, তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ, ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥"

সুরাসুরের দ্বন্দ্বে সুরেরই জয় হয় চিরকাল। সুরের নেশায় অসুর মাতাল হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে অসুরের অসুরত্ব পায় লোপ। তখন অসুরের মধ্যে সুর জন্মলাভ করে।

এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। ধীরে ধীরে সুরটি জন্মলাভ করল আমার মধ্যে। সেই সুরের মাঝে কখন যে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছি তা' জানতেও পারিনি।

হঠাৎ তাল কেটে গেল। ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ—এক রাশ বাসন পড়ল কোথায়। সেই ধাক্কায় সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলাম। কান পেতে রইলাম। গান বাজনা থেমে গেছে ওপরে। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্—এক ঘেয়ে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ হচ্ছে শুধু। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট আমাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। আরও কিছু শোনবার আশায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে—দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে খুব চাপা গলায় বলা হ'ল—"কৈ, কি করতে পারলে তোমার গিরিধারীলাল? মুখ থেঁতলে দিয়েছি এক ঘায়ে, কিছুই করতে পারলে না। পেতলের পুতুল, ঐ পুতুল তোমায় বাঁচাবে?

ও তোমার লজ্জা রাখবে ? দূর করে ওটাকে এবার টেনে ফেলে দোব নিচে। ও আপদটাকে বিদেয় না করতে পারলে—

একটা বুক নিঙ্‌ড়ানো সুরে চাপা পড়ে গেল আস্ফালনটা—

হরি তুম হরো জন কী ভীর।

দ্রৌপদী কো লাজ রাখ্যো তুম বড়ায়ো চীর ॥

আবার ঝন্ ঝন্ শব্দে কি একটা আছড়ে পড়ল ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সাপের মত ক্রুদ্ধ ফোঁসফোঁসানি—"দ্রৌপদীর লজ্জা রেখেছিলো—এবার ও নিজের লজ্জা রাখুক, আজ ওকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।" কয়েকটি মুহূর্ত পরেই আমার মুখের এক হাত দূর দিয়ে কি একটা তীর বেগে নেমে গেল নিচে। রোয়াকের ওপর প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল সেটা। সেই সঙ্গে একটা বাজ পড়ল কোথায়। কড় কড় কড়াৎ—কানে তালা লেগে গেল, চোখ দুটোও গেল ঝলসে। বেশ কিছুক্ষণ কিছু শুনতে পেলাম না। তারপর আবার কানে গেল—

ভকত কারণ রূপ নরহরি ধর্‌য্যো আপ সরীর।

হিরণকস্যপ মারি লীনহো ধর্‌য্যো নাহিন ধীর ॥

বুড়তে গজরাজ রাখ্যো কিয়ো বহার নীর।

দাসী মীরা লালা গিরিধর দুখ জহাঁ তহঁ পীর ॥

আবার একটা বাজ পড়ল কোথায়। এবার কাছে নয়, অনেক দূরে। বাতাসের জোরও বেশ বাড়ল। বাইরের সেই দুর্যোগের সঙ্গে "দুখ জহাঁ তহঁ পীর" মিলিয়ে গেল। তারপর বেশ থেমে থেমে বলা হ'ল—"আচ্ছা, মীরা দাসীকে যেন তার প্রভু গিরিধারীলাল এবার বাঁচান। আর আমার কিছুই করবার নেই। শুধু এই বেহালাখানা, তোমার জন্যেই এখানা আমি ছুঁই, শেষ করে যাই এখানাকেও।"

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচবার আছড়াবার শব্দ শোনা গেল। কে যেন একটা কি মেঝের ওপর বারবার আছড়ে ভাঙ্‌লে। তারপর পায়ের

আওয়াজ পেলাম সিঁড়িতে, কে নেমে আসছে। তাড়াতাড়ি পিছু হেঁটে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। পায়ের আওয়াজ নিচের তলায় গিয়ে মিলিয়ে গেল। আর বেরোলাম না। কি হবে এদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে। রাতটা কোনও রকমে কাটলে হয়, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পথে পা চালাব। ভিজে কাপড় চাদর খুলে ফেলে চারপায়ার ওপর শুয়ে পড়লাম এবং আশ্চর্য—ঘুমিয়েও পড়লাম আবার নিশ্চিন্তে।

পরদিন ঘুম ভাঙল দরজায় ধাক্কা পড়তে। দরজা খুলে দিতে একটু দেরি হ'ল। কাপড়খানা কোমরে জড়িয়ে চাদরখানা গায়ে দিয়ে দরজা খুলে দিলাম। সামনেই তিনি, সেই এক ভাবে কাপড়-চাদর জড়িয়ে আছেন। কিন্তু কি রকম যেন সব রুক্ষ, সব এলোমেলো হয়ে গেছে। কেশ বেশ চোখমুখের অবস্থা সবই যেন কেমন বিপর্যস্ত গোছের। যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটার ভেতর দিয়ে উনি এলেন। বোধ হয় বোকার মত হাঁ করে চেয়ে ছিলাম ওঁর মুখের দিকে। চেষ্টা করে অল্প একটু হেসে তিনি বললেন—"অত ভিজে কাপড় চাদর পরে থাকলে অসুখ করবে যে। আসুন আমার সঙ্গে, আগে ওগুলো ছেড়ে ফেলুন।"

চললাম তাঁর সঙ্গে। একটা কিছু বলা প্রয়োজন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম—"স্বামীজী কোথায় ?"

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর হ'ল—"বেরিয়েছেন বোধ হয় কোথাও।"

এরপর আর কি বলা যায়। তাই ভাবতে ভাবতে তাঁর পিছু পিছু নিচে নেমে এলাম।

সিঁড়ি শেষ হতেই রোয়াক। হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল আমার মাথার মধ্যে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম রোয়াকটার মাঝামাঝি একটা জায়গায়। বেশ খানিকটা সিমেণ্ট উঠে গেছে সেখান থেকে। বেশ বোঝা যায় যে সিমেণ্টটা উঠে গেছে সদ্য সদ্য, তবে কিছুক্ষণ আগেই বেশ করে ঝাড়ু দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছে জায়গাটা। কাজেই অন্য কিছুর চিহ্নমাত্র নেই সেখানে।

না থাকুক, কিন্তু সেই জায়গাটার দিকে চেয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম নিষুতি রাতের আকুল কান্না। চোখ ঝলসানো রোদ উঠে গেছে তখন, কিন্তু আমার চোখের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। বুকের ভেতর কে যেন গাইতে লাগল—

দাসী মীরা লালা গিরিধর—দুখ জহাঁ তহঁ পীর ॥

হঠাৎ পেছনে—নমস্তে, নমস্তে, নমস্তে।

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে যাঁদের দর্শন পেলাম তাঁরা মুরারির তিন কুলের কেউ নন। পাগড়ি পাজামা পাঞ্জাবি চড়ানো পঞ্চনদের তীরবাসী জনাতিনেক ভদ্রলোক—তাঁদের সুউচ্চ শিরগুলি নুইয়ে ভক্তি নিবেদন করছেন।

ভক্তি বস্তুটা ভাল না মন্দ এ নিয়ে কোনও তর্ক চলে না। ভক্ত যাঁরা, তাঁরা যে সকলের প্রণম্য, এ কথাও মাথা পেতে স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু এই অতি পবিত্র বস্তুটির যত্রতত্র বেহিসেবী ব্যবহার সম্বন্ধে ভক্তিমান-ভক্তিমতীদের একটু সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় যে অপাত্রে ভক্তি অর্পণের ফলে পাত্রটা তো ফেটে চৌচির হয়ই, উপরন্তু তাঁরা নিজেরা বেকায়দায় পড়ে অপ্রস্তুত হন সব চেয়ে বেশী। [দুনিয়ার ভাল ভাল জিনিসগুলোর দোষই এই, ভাল ভাবে ব্যবহার করতে না জানলে ফল হয় মারাত্মক।]

চাওলা চোপরা রমানী মহোদয়গণ পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করেই ভক্তি দেখাতে এসে মহা অপ্রস্তুত হলেন। ওঁদের দিকে আর একটিবারও না তাকিয়ে আমি এক রকম ছুটে পালিয়ে গেলাম। স্নানের ঘরে ঢুকে দিলাম দরজা বন্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে যখন কলের নিচে মাথা পেতে বসেছি, তখন খেয়াল হ'ল যে কাজটা ভাল করিনি। ওঁরা হয়ত আমায় পাগল ভাবলেন। নারায়ণ জানেন, তখন ওঁদের মুখের অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছিল!

কলের নিচে মাথা পেতে বসে আর কতটা সময় কাটানো যায়, বিশেষতঃ হরিদ্বারের মত স্থানে। কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়তে হ'ল, মাথায় তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত হিম হয়ে গেছে। তখন খেয়াল হ'ল—শুকনো কাপড় কই? একটা ঢাকবার মত কিছু না পেলে চলে না তখন। কাঁপুনি ধরে গেছে শরীরে। দরজা খুলে বেরোতে হ'ল। সামনেই তিনি, একটু দূরে একখানা ছোট বেতের মোড়া পেতে বসে আছেন। তাঁর কোলের ওপর কাপড়-চাদর। উঠে দাঁড়ালেন কাপড়-চাদর হাতে নিয়ে। বেশ মিনতি করে বললেন—"তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে আসুন। চা তৈরী রয়েছে, ওধারে ভক্তরা বসে আছেন আপনার জন্যে।"

কাপড়-চাদর নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলাম। হাতটা টেনে নিয়ে বললাম—"আমার জন্যে। কেন?"

আরও নরম গলায় তিনি বললেন—"এখন যে গীতাক্লাস হয় এক ঘণ্টা, আপনিই যে বলবেন আজ।"

আঁতকে উঠলাম—"আমি! তার মানে?"

এবার আর নরম গলায় নয়, অনেকটা হুকুমের মত শোনাল তাঁর জবাব।

"আশ্রম পরিচালনা করবার ভার যখন আপনার ওপর, তখন কিছু বলতে হবে বৈকি গীতা ক্লাসে। অতগুলি ভক্ত এসে বসে আছেন, ওঁদের তো আর নিরাশ করা যায় না। নিন, আগে কাপড় ছাড়ুন, চা খান। চা খেতে খেতে কথা হবে।"

বলে কাপড়-চাদর আমার হাতে এক রকম গুঁজে দিয়ে পিছন ফিরে চলে গেলেন। কাপড়-চাদর হাতে নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। এ কি ফ্যাসাদ রে বাবা! আমার ওপর আশ্রম পরিচালনার ভার! ভার দিলে কে? দিলেই যে তা' আমায় নিতে হবে ঘাড় পেতে, তার কি মানে আছে? এ তো আচ্ছা প্যাঁচে পড়ে গেলাম দেখছি।

ভাবতে ভাবতে কাপড়-চাদর নিয়ে আবার স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

কাপড়-চাদর দুই-ই মহামূল্য কমলা রঙের সিল্ক। কাঁধের ওপর থেকে পিছলে পড়ে। এরা কি সিল্ক ছাড়া অন্য কিছু পরেই না নাকি! দূর ছাই আমার সেই কৌপীন আর ছেঁড়া ন্যাকড়াই ছিল ভাল। সেগুলোর খোঁজ পেলে হয়। এক ফাঁকে এই রাজবেশ ছেড়ে ফেলে দিয়ে আমার নিজস্ব সাজ-পোষাক পরে গা ঢাকা দোব। আবার বলে গীতাক্লাস করতে হবে। মাথায় থাকুন গীতা, এখন পরিত্রাণ পেলে বাঁচি।

দরজায় করাঘাত পড়ল। এবার আর তিনি নন, আশ্রমের ভোগ বানান যিনি, তিনি। লোকটি বৃদ্ধ, কাল ইনিই থালি ধরে দিয়েছিলেন সামনে। অনেকটা নত হয়ে 'নমস্তে' জানিয়ে তিনি নিবেদন করলেন—"চা দেওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ এবং মাতাজী বসে আছেন সেখানে।"

অতএব আবার দোতলায় উঠতে হ'ল তাঁর পিছু পিছু। চা দেওয়া হয়েছে একটা ঘরের মধ্যে। পিঁড়ি পেতে দস্তুরমত আইন মাফিক ব্যবস্থা করে এক থালা কচুরি মেঠাই আর ফলমূল দেওয়া হয়েছে। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে তিনি সামনে বসে আছেন।

সাদাসিধে গলায় দস্তুরমত তাড়া দিলেন আমায়—"বসুন, বসুন। বসে পড়ুন টপ্ করে। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আপনার জন্যে আমিও চা মুখে দিতে পারছি না।"

তাড়ার চোটে টপ্ করে বসেই পড়লাম। থালাখানায় টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু আপনার? আপনার কই?"

মাথা নিচু করে চা ঢালতে ঢালতে বললেন—"সকালে শুধু চা খাই আমি। আপনি আরম্ভ করুন, সেই তো কাল দুপুরে কিছু পেটে গেছে—তারপর এই —বিশ ঘণ্টা পার হতে চলল। খিদে-তেষ্টাও জয় করেছেন বুঝি? আচ্ছা, হিমালয়ে যাঁরা তপস্যা করেন তাঁরা বুঝি কিছুই খান না?"

কোনও কথা না বলে কচুরি একখানা মুখে পুরলাম। তিনিও বোধ হয় জবাব আশা করেননি। বলেই চললেন একভাবে—"উৎকট কষ্ট করে মানুষ

কি যে পায়? কিছুই লাভ হয় না কারও। নিজেকে যতই টিপে মারবার চেষ্টা করুক, মানুষ মানুষই থাকে চিরকাল। ছাই চাপা আগুন। একটু হাওয়া পেলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে।"

কচুরিখানা গলাধঃকরণ করে বলে ফেললাম—"ফ্যাসাদে না পড়লে কিছুই হয় না। এই জন্যে আপদ বালাই এড়িয়ে চলতে হয়।"

"সোজা কথায়, নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো।" বলে তিনি অল্প একটু হাসলেন। তারপর যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু পালিয়ে বেড়াতে লজ্জা করে না? আশ্চর্য!"

জবাব দিলাম না। আর একখানা কচুরি শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু স্বামীজী পালালেন কোথায়?"

বেশ বাঁকা সুর বার হ'ল তাঁর কণ্ঠ দিয়ে—"তপস্যা করতে বোধ হয়। জানব কি করে বলুন, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তো যাননি।"

গা জ্বলে উঠল উত্তর শুনে। বোধ হয় একটু ঝাঁজও বার হ'ল আমার গলা দিয়ে। বললাম—"তা' যান তাঁর যেখানে খুশি। কিন্তু আশ্রমের ভারটা আমার মাথায় চাপিয়ে গেলেন কেন? আর কখনই বা বলতে গেলেন সে কথা? এ কি ঝঞ্ঝাটে পড়লাম আমি খামকা!"

চায়ের কাপটা একটু ঠেলে দিয়ে খুব সহজ হালকা সুরে বললেন—"মহাপুরুষদের মনের কথা জানব কেমন করে। এক মহাপুরুষ আর এক মহাপুরুষকে ভার দিয়ে গেছেন। এতে বোধ হয় সম্মতি অসম্মতির প্রশ্নই ওঠে না। একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন আপনাকে, পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। তাঁর অবর্তমানে আপনিই আশ্রম-স্বামী। এখন আপনি যে ভাবে চালাবেন সেই ভাবেই চলবে আশ্রম।"

তাঁর কথার মাঝখানেই বললাম—"কই সে চিঠি—দেখি।"

চাদরের খুঁট থেকে একখানি ছোট কাগজ বার করে আমার বাঁ হাতে দিলেন। দিয়ে নিজের কাপটা মুখে তুললেন। বাঁ হাতেই

কাগজখানা মেলে দেখলাম। মাত্র তিন লাইনের চিঠি, বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত।

"ভায়া,

কয়েক দিন ছুটি নিচ্ছি। আশ্রম রইল, শ্রী রইল, তুমি রইলে। আমার বিশ্বাস তোমার হাতে আশ্রম ভালভাবে চলবে। আশ্রম খরচার জন্যে কিছু রেখে গেলাম। ইতি

অসীমানন্দ—"

চিঠিখানি পড়ে মুখ তুলে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। এক মনে চা খাচ্ছেন নত চোখে। চা খাওয়া শেষ করে কাপ নামিয়ে রেখে বললেন—"হাজার খানেক টাকা রেখে গেছেন। চা খান আপনি। এনে দিচ্ছি আমি টাকা।"

এবার সত্যি সংযম হারালাম। প্রায় চীৎকার করে উঠলাম—"টাকা! টাকা নিয়ে করব কি আমি? দেখুন এ সমস্ত চালাকি আমি বুঝি, ও সমস্ত চাল চলবে না আমার সঙ্গে।"

ত্রস্ত আঁখি দু'টি বিস্ফারিত করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। থরথর করে কাঁপতে লাগল পাতলা ঠোঁট দু'খানি। নাকের ডগাটি লাল হয়ে উঠল। কাল প্রথম যেমন দেখেছিলাম তেমনি কোথা থেকে জল এসে আঁখি দু'টি ছাপিয়ে গেল। সেই আঁখি দু'টির দিকে চেয়ে কালকের মত অস্বস্তি বোধ করলাম। বাধ্য হয়ে মুখ নামাতে হ'ল আমাকে।

তারপর অনেকক্ষণ কাটল নিঃশব্দে। চা ঠাণ্ডা হতে লাগল। বিশ্রী অবস্থা, সামনাসামনি বসে আছি, অথচ তাকাতে পারছি না তাঁর দিকে। একটা কিছু জোগাচ্ছেও না মুখে যে বলে ব্যাপারটাকে হালকা করে ফেলি। কি অস্বস্তি!

তিনিই প্রথম মুখ খুললেন। খুব স্বাভাবিক সুরে বললেন—"চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বদলে দি।"

তাড়াতাড়ি যা মুখে এল তাই বলে ফেললাম ওঁর দিকে চেয়ে।

"আপনার জন্যেও এক কাপ ঢালুন। অন্যায় হয়ে গেছে আপনাকে ধমকানো।"

নত মুখে তিনি শুধু বললেন—"কিছু না, কিছু না, ও আমার অভ্যাস আছে শোনা।" তারপর চা-পর্ব শেষ হ'ল নিঃশব্দে।

নিচের একখানা বেশ বড় ঘরে গীতাক্লাস বসেছে। ঘর জোড়া কার্পেট পাতা। ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রিগণ বসে রয়েছেন কার্পেটের ওপর। দশ বার জনার বেশী নন তাঁরা। কিন্তু ওজনে তাঁরা যে কোনও স্কুলের দশ বার জন ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে অন্তত পাঁচ গুণ বেশী। আর তাঁদের বয়স যোগ করলে ফল যা দাঁড়ায় তা' যে কোনও স্কুলের পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রীর বয়সের যোগফল ছাড়িয়ে যাবে। তাঁদের দিকে একটি বার মাত্র তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেলাম মাস্টার মশায়ের আসনের দিকে। আসন চিনতে কষ্ট হ'ল না। ওঁরা যেদিকে মুখ করে বসে আছেন—সেই দিকে দেওয়ালের ধারে এক হাত উঁচু একখানা চৌকির ওপর লাল কার্পেট। তার ওপর বাঘছাল পাতা রয়েছে। দু' পাশে দুই ফুলের তোড়া। ধুপদানে ধুপ জ্বলছে। ফুলের তোড়া দুটোর মাঝখানে লাল কাপড় মোড়া একখানি ছোট জলচৌকি। তার ওপর রূপার থালায় ফুলের মালা জড়ানো শ্রীশ্রীগীতা। পেছনে দেওয়ালের মাথায় ঝুলছে মুণ্ডিতমস্তক দণ্ডধারী গুরু শঙ্করের ছবি একখানি।

আসনের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। এবার কি কর্তব্য! আসনটাকে প্রণাম করে তবে উঠে বসতে হয় নাকি? জানি না ছাই কিছুই। যা' থাকে বরাতে—আসনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আসনে মাথা ঠেকিয়ে কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তারপর চৌকির ওপর চড়ে আসনে গিয়ে বসলাম। বসে নিচু হয়ে গীতায় কপাল ঠেকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ব্যাস— এবার বোধ করি আদবকায়দা মাফিক যাবতীয় কর্তব্য সমাধা হয়ে গেল। এবার খানিক গীতা পাঠ।

মাথা তুলে গীতার দিকে চেয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। কি সর্বানাশ। এ যে দেখছি দেবনাগরী অক্ষর! অজানা অচেনা অক্ষরগুলো আমার চোখের সামনে দাঁত ভেঙ্চে হাসতে লাগল। মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম বইখানার দিকে চেয়ে।

পিড়িং পিড়িং।

মুখ ঘুরিয়ে ডান দিকে চেয়ে দেখি সরোদের কান মোচড়াচ্ছেন এক মিংজী। তাঁর পাশে আর একজন বাঁয়া তবলা নিয়ে প্রস্তুত। তাঁদের ওধারে ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁসে তানপুরা কোলে নিয়ে যিনি চোখ বুঁজে বসে আছেন, তাঁকেই মাত্র চিনি আমি এতগুলি লোকের মধ্যে। কিন্তু উনি এসে পৌঁছলেন কখন! এই মাত্র তো আমায় এক রকম জোর করে পাঠিয়ে দিলেন এখানে। তখন চোখে পড়ল, তিনি যেখানে বসেছেন তার একটু দূরে একটি দরজা। দরজার যথারীতি পর্দা ঝুলছে। বুঝলাম, ঐ দরজা দিয়েই ওঁর আবির্ভাব হয়েছে।

এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম নিমীলিত আঁখি মুখখানির দিকে। মনে হ'ল মানুষটি যেন নেই ঐ শরীরের ভেতর, উধাও হয়ে গেছে কোথাও। কিংবা কোথাও তলিয়ে আছে ঐ শরীরটির মধ্যে। ধীরে ধীরে আঙুল চলতে লাগল তানপুরার তারের গায়ে। ধীরে ধীরে সুর উঠল সরোদে। খুব আস্তে আস্তে ঠোঁট দু'খানি একটু ফাঁক হ'ল। তারপর শোনা গেল প্রায় চুপি চুপি দু'টি কথা—

"প্রীতম প্যারা—"

সঙ্গে সঙ্গে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল বাতাস। প্রত্যেকটি মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে এল। সবাইয়ের চক্ষু তাঁর দিকে, সবাই স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। জেগে আছে শুধু ধূপের ধোঁয়া, কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। সুরটাও ঠিক ধূপের ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীর

"প্রীতম প্যারা,

তুম বিন জগ সব খারা।

ম্হাঁরে ঘর আজ্যো প্রীতম প্যারা ॥

তন মন ধন সব ভেঁট করূঁ মৈঁ, ঔর ভজন করি থাঁরা।

তুম গুণবংত বড়ে গুণসাগর, মৈ হুঁ জী ঔগনহারা ॥

প্রীতম প্যারা,

ম্হাঁরে ঘর আজ্যো প্রীতম প্যারা,

তুম বিন জগ সব খারা ॥

তোমার বিহনে সারা জগতটাই আমার কাছে বিষিয়ে উঠেছে। অতএব হে প্রিয়তম, তুমি এস আমার ঘরে।

এ কি ডাক! কার সাধ্য ধরা না দিয়ে পারে এই ডাকে! বেদনা না মধু উথলে ওঠে বিরহ থেকে? এই আদর আকুলতা আবেশ অশ্রু, এগুলো কি শুধুই মায়া, মিথ্যা আর অভিনয়? এ যদি অভিনয় হয়, এই ডাক যদি ডাকের মত ডাক না হয়, তা' হলে খাঁটি বস্তু কি এই দুনিয়ায়?

স্থান কাল সব ভুলে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম দু'টি নির্মালিত আঁখির দিকে। ততক্ষণে আবার আরম্ভ হয়েছে—

মৈঁ নিগুণী গুণ একো নাহীঁ, তুম মেঁ জী গুণ সারা।

মীরা কহে প্রভু কবহি মিলোগে, বিন দরসন দুখিয়ারা ॥

মীরা যাই বলুন, তাতে কে কান দেয়! কান দেবার অবকাশই বা কোথায়! সুরের নেশায় তখন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মন বুদ্ধি সব। শুধু একটা বোবা বেদনায় টনটন করছে বুকের ভেতরটা। সত্যি সত্যিই যেন একজনের বিহনে জগতটা বিষিয়ে উঠল। একান্ত অসহায়ের মত হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে লাগলাম সুরের স্রোতে। কখন অজ্ঞাতসারে গায়িকার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছি তাও জানি না। বোধ হয় তখন তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলাম নিজের বুকের ভেতরটা, কোনও "প্রীতম প্যারা" কোথাও লুকিয়ে

আছে কি না সেই তল্লাসই করছিলাম বোধ হয় সব কিছু ভুলে গিয়ে। কিন্তু ভক্তরা ভাবলেন উল্টো। তাঁরা ধরে নিলেন যে আমার ভাবাবেশ হয়েছে। সুতরাং আর কোনও কথা নয়, গীতাভাষ্য শোনার আর প্রয়োজনই হ'ল না কারও। পাছে—আমার ভাব ভঙ্গ হয় এই ভয়ে পা টিপে টিপে সবাই সরে পড়লেন।

হঠাৎ কানে গেল উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ। চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম, একটি প্রাণীও নেই সামনে। শুধু তিনি আছেন ডান ধারে বসে। বসে নেই ঠিক, তানপুরার ওপর হুয়ে পড়ে প্রাণপনে হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন।

একেবারে তেরিয়া হয়ে উঠলাম—"হাসছেন যে বড় ? হয়েছে কি ? এঁরা সব গেলেন কোথা ?"

তৎক্ষণাৎ হাসি সামলে ফেলে সোজা হয়ে বসলেন। চোখ মুখ কিন্তু লাল হয়ে উঠেছে।

বললেন—"খুব হয়েছে। এবার নেবে আসুন। এমন ব্যাখ্যা করেছেন গীতার, যে ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল।"

সত্যই আশ্চর্য হয়ে গেলাম—"পালিয়ে গেল ! পালাল কেন ?"

নেহাৎ ভাল মানুষের মত উত্তর দিলেন—"কি করবে বলুন ? ধ্যানস্থ মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ করে কে পুড়ে মরতে যাবে তাঁর রোষবহ্নিতে। বাপরে বাপ—এমন ওষুধ যে জানেন আপনি, এ আমি ভাবতেও পারিনি।"

একান্ত লজ্জিত হয়ে গেলাম, অনুতপ্তও হলাম খানিকটা। সেই কথাই বলতে গেলাম তাঁকে।

"দেখুন—সত্যি বলছি, ধ্যান ট্যান কিচ্ছু নয়, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ওঁরা যে উঠে যাবেন তা' আমি—"

এবার বেশ সংযত কণ্ঠে বললেন—"তা'তে কোনও দোষ হয়নি, কাল আবার ঠিক আসবেন ওঁরা। এবার নেমে আসুন আপনি ওখান থেকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলা যাক তাড়াতাড়ি। বিকেলের দিকে হয়ত আবার

ওঁরা আসবেন আপনাকে দর্শন করতে। এতবড মহাপুরুষ হাতের মুঠোয় পেয়ে সহজে কেউ ছাড়বেন বলে মনে হয় না।"

সুতরাং নেমে গেলাম আসন থেকে। যে দরজা দিয়ে এসেছিলাম সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেলাম আমি, তিনি অদৃশ্য হলেন তাঁর পিছনের পর্দার আড়ালে। ভয়ানক ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। দোতলায় উঠে সেই ঘরখানায় ঢুকে চার পায়ায় শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই খাওয়ার ডাক এল। খেতে গিয়ে দেখলাম কেউ নেই সামনে বসা। সেই বৃদ্ধ লোকটি থালি এনে নামিয়ে দিলে সামনে। একবার মনে হ'ল জিজ্ঞাসা করি বৃদ্ধকে তিনি কোথায়। কিন্তু প্রশ্নটা বেধে গেল মুখে। তাই তো! কেন আমি করতে যাব ঐ অনাবশ্যক প্রশ্ন? কি আমার প্রয়োজন তাঁকে? তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবার অধিকারই বা কই আমার? আর সবচেয়ে বড কথা, আমার খাওয়ার সময় তাঁকে যে সামনে বসে থাকতে হবেই তারই বা মানে কি?

মানে কিছু না থাকুক কিন্তু মনের ভেতর কোথায় যেন একটু খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। বেশ একটু রেগেও গেলাম—বোধ হয় নিজেরই ওপর। ঠিক করে ফেললাম যে ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতেই হবে। আর একটা রাত কিছুতেই কাটানো যেতে পারে না এখানে। সন্ধ্যার পর যে ট্রেন ছাড়বে হরিদ্বার থেকে তাতেই চড়ে বসব গিয়ে। তারপর বিনা টিকিটে যতদূর যাওয়া যায়। রাত্রে যদি গাড়িতে চেকার না ওঠে তাহলে সারা রাতে কয়েকশ' মাইল পার হয়ে যাব। কাল সকালে যেখানে নামিয়ে দেবে সেখানে নেমে চিন্তা করা যাবে তখনকার কথা। আপাততঃ এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই সব চেয়ে বড় কথা।

অন্যমনস্ক হয়ে থালাটা খালি করে ফেললাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে বেচারা হায় হায় করতে লাগল। নিশ্চয়ই কম পড়ল, পেট ভরল না আমার। কিন্তু দ্বিতীয়বার কিছু দেবারও তো নিয়ম নেই সন্ন্যাসীর পাতে। কাজেই বৃদ্ধের আপসোসের অন্ত রইল না। যত তাকে বলি যে

কম পড়েনি মোটেই ততই সে ঘাড় নাড়তে থাকে। তার সব থেকে বড় দুঃখ যে সে আর আমাকে খাওয়াতে পারবে না। কারণ আর ঘণ্টা দু'য়েক পরেই সে তার দেশে অর্থাৎ গোরখ্‌পুরে রওয়ানা হচ্ছে। তার ছুটি হয়ে গেছে কাজ থেকে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল কেন? এখানে ভোজন বানাবে কে?"

কেউই বানাবে না। মহারাজজী তো চলেই গেছেন তীর্থ করতে। মাতাজীও যাচ্ছেন কাল সকালে। আশ্রম বন্ধ থাকবে এখন। আজ সকালে মাতাজী তার টাকা কড়ি সব মিটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দয়ার শরীর তাই গোরখ্‌পুরের টিকিটও একখানি কিনে আনিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সে দু'ঘণ্টা পরেই গাড়িতে চেপে বসছে।

বেশ একটি ধাক্কা খেলাম বুকের মধ্যে। তাহলে উনিও চললেন। ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সবই হয়ে গেছে দেখ্‌ছি এবং আমাকে এ সমস্ত ব্যাপার ঘুণাক্ষরে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেই শুনিয়েছেন—তাঁর অবর্তমানে আমিই আশ্রম-স্বামী। এখন আমি যেভাবে চালাব সেই ভাবেই চলবে আশ্রম। হুঁ—একেই বলে স্ত্রীলোক। এঁদের মুখে এক, মনে এক। সাধে কি আর মহাপুরুষেরা বলেছেন যে ওঁদের অন্ত পাওয়া ভার।

হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে গেলাম আবার। কয়েক ঘণ্টা তখনও দেরি আছে সন্ধ্যা হতে। একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক। ভরা পেট নিয়ে এখন কোথায় ঘুরে মরতে যাব। আর প্রবৃত্তিও নেই হরিদ্বারে ঘোরবার। শেষে আবার কোনও ভক্তটক্তর সঙ্গে দেখা হয়ে যাক, আর আবার কোনও ফ্যাসাদে পড়ি। মনে পড়ে গেল, হরিদ্বার বড় বিষম দ'। এখানের ঘূর্ণিজলে জাল ছেঁড়া বাঘা মাছেরা জন্মের মত আটকা পড়ে ঘায়েল হয়ে যায়।

থাকুক হরিদ্বারের দ' হরিদ্বারে পড়ে। আমি রেহাই পেয়ে গেলাম সেইটেই আসল কথা। বাধা-বিপত্তির আর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

যেদিকে দু' চক্ষু যায় চলে যাব। দুর্গা বলে আজ রাতের গাড়িতেই চড়ে বসব। তারপর যা' থাকে কপালে।

কিন্তু আমার কপালে যাই থাকুক ওঁর কপালে এবার কি আছে? রাত্রে যেটুকু কানে গেছে তাতে এটুকু স্পষ্ট বুঝেছি যে মহারাজজী আর সহজে ফিরছেন না। ফেরবার হলে নিজের হাতের বেহালাখানিও আছড়ে ভেঙ্গে যেতেন না। কিন্তু কি এমন ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল ওঁদের জীবনে, যার জন্যে এভাবে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল হরপার্বতীর কথা। কাশীতে এঁদের লোকে হরপার্বতী বলত। বলে নিঃশ্বাস ফেলত। বলত— 'আহা, এমন সোনার কপাল মানুষ কত পুণ্যে করে আসে গো।' হাসি পেয়ে গেল—সোনার কপালই বটে। সোনার বলেই এ ভাবে ভেঙে গেল কপাল। অন্য কিছুর হলে হয়ত আরও কিছুদিন খোপে টিকত।

কিন্তু এবার ইনি করবেন কি? যাচ্ছেন কোথায়? কার কাছেই বা চলেছেন? কে জানে আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও আছে কি না! থাকলেও তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ আছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে। হরের সঙ্গে পার্বতীর কোনও লৌকিক সম্বন্ধ আছে কি না, তাও তো ছাই জানি না! রহস্যময় এঁদের জীবন। রহস্যময় বলেই হরিদ্বারের রহস্য-জগতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। দূর হোগ গে ছাই—কেন মিছে মাথা ঘামিয়ে মরছি ওঁদের নিয়ে? যেখানেই যান, যা' ইচ্ছে করুন আমার কি তাতে?

বিষম বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলাম। এবং বোধ হয় পেট-ভরা থাকার দরুনই তন্দ্রা এসে গেল। দরজাটা খোলাই রইল। তা' থাকুক, ঘুমচ্ছি না তো আর আমি। শুধু একটু গড়িয়ে নোব। সন্ধ্যা হলেই চলে যাব স্টেশনে। তারপর যে ট্রেনখানা প্রথমে ছাড়বে তাতেই উঠে পড়ব কোনও রকমে।

চলেই গেলাম শেষ পর্যন্ত। ট্রেনে চড়ে নয়, অন্য এক জাতের যানে চড়ে। সেখানে চড়ে যত্রতত্র উধাও হয়ে যাওয়া যায়। টিকিট কাটতে হয় না, চেকার উঠে নামিয়ে দেবার ভয় নেই, নেই গুঁতো খাবার ভয়। সে যানে

ভিড় হয় না মোটেই, আরামে শুয়ে নাক ডাকিয়ে চলে যাওয়া যায়। শুধু পেটটা ভর্তি থাকলে আর মশায় না কামড়ালে সহজে সে যাত্রায় ছেদ পড়ে না। তবে বিপদ হচ্ছে এই যে সে যান কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা' জানবার উপায় নেই। নিমেষের মধ্যে নাম-না-জানা আজগুবী রাজত্বে নিয়ে যদি নামায় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার ভাগ্যেও তাই ঘটে গেল। হঠাৎ দেখি এমন এক দেশে পৌঁছে গেছি যেখানে না আছে শোক-দুঃখ না আছে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। আছে শুধু সুর। সুরে সুরে সেখানের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ। সপ্ত সুরের সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে সে দেশের সুরেশ্বরীতে ভেসে চলেছেন সুরলোকের মেয়েরা। তাঁদের মধ্যে একজনের আঁখি দু'টির দিকে চেয়ে বুকের ভেতরটা ভয়ানক মুচড়ে উঠল। কি জানি কেন মনে হ'ল যে সেই সুরলোকেও উনি বড় একা, বড় অসহায়।

সেই মোচড়েই আবার ফিরে এলাম যেখানকার মানুষ সেখানে। মনে হ'ল মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন হাঁফাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দু' হাতে চোখ কচলে ভাল করে চেয়ে দেখলাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন—"সন্ধ্যা হয়ে গেল যে। আপনি যাবেন কখন?"

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়?"

একটা ঢোঁক গিলে বেশ ঝাঁজিয়ে উঠলেন—"তা' আমি কি জানি।" বলে আবার একটা ঢোঁক গিলে পাশের দেওয়ালটা ধরে ফেললেন। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি আমি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি তাঁর দিকে। হয়েছে কি! ওরকম করছে কেন?

মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এক হেঁচকায় মুখ তুলে বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—যান—বেরিয়ে যান শিগ্‌গির ঘর থেকে। আমি একলা মেয়েমানুষ, আর কেউ নেই বাড়িতে, যান।"

অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। চোখেও জলে উঠল আগুন। জলন্ত চোখে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। নিশ্চয়ই কিছু টেনেছে। কিছুই অসম্ভব নয় এঁদের পক্ষে। ভোগ ঐশ্বর্য গান বাজনার মধ্যে ভাসবার জন্যে ঘর ছেড়ে এ পথে নেমেছে যে, তার পক্ষে ও জিনিস অচল নয়। একটু স্ফূর্তি-টুর্তি করবার জন্যেই বামুনটাকে পর্যন্ত বিদেয় দিয়েছে। বোধ হয় এবার মনের মানুষ কেউ আসবে। শুধু শুধু কি আর মহারাজজী সরে পড়েছেন!

দরজার বাইরে পা দিয়েছি হঠাৎ কানে গেল হিক্কার শব্দ। পর পর কয়েকটা হিক্কা উঠল। তার সঙ্গে একটু যেন চাপা গোঙানিও শোনা গেল। একবার—পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরের বাইরে তখনও যেটুকু আলো ছিল তা' গিয়ে পড়েছে মুখের ওপর। কিন্তু ও কি! ও কি রকম চাহনি! ও রকমই বা করছে কেন লোকটা!

তাড়াতাড়ি আবার ঘরের মধ্যে পা দিলাম। তৎক্ষণাৎ একটা আর্তনাদ করে উঠল প্রাণপণে—"যান, যান, যান বলছি শিগ্‌গির এ বাড়ি থেকে। যদি বাঁচতে চান—পালান।"

আর বলতে পারলে না, মাথাটাও খাড়া করে রাখতে পারলে না। লটকে পড়ল মাথাটা বুকের ওপর।

যাব কি, ব্যাপার দেখে কেমন যেন ঘুলিয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে। আরও একটু কাছে এগিয়ে বললাম—"দেখুন—শুনছেন।"

সাড়া নেই।

এক পা সামনে এগিয়ে আবার ডাক দিলাম—"দেখুন—শুনছেন।"

আবার উঠল গোটা দুই হিক্কা। দু' হাতে নিজের বুক চেপে ধরে অতি কষ্টে মাথা তুললে। তুলে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাইতে লাগল চতুর্দিকে। হঠাৎ নজর পড়ল আমার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল—"তুমি কে? কে তুমি?"

আমিও কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। আরও এক পা কাছে এগিয়ে বললাম—"আমি—আমি—আমাকে চিনতে পারছেন না?"

আবার চিৎকার করে উঠল প্রাণপণে—"না, পারছি না। চিনি না তোমাকে। যাও, যাও বলছি ঘর থেকে বেরিয়ে—"

শেষ করতে পারলে না। টলে পড়ল মেঝের ওপর। পড়ে মুখ রগড়াতে লাগল মেঝেয়।

কি করব, কি না করব বুঝতে না পেরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন কেউ নেই বাড়িতে যাকে ডাকতে পারি। গায়ে হাত দোব, না দোব না তাও ঠিক করতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি, দু' হাতে ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। আর থাকতে পারলাম না। দু' হাতে দু' কাঁধ ধরে বসাবার চেষ্টা করলাম। কানে গেল কি যেন বলছে বিজ বিজ করে। দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে মুখটা সোজা করে রাখবার চেষ্টা করলাম। তখন বেশ বুঝতে পারলাম কি বলছে জড়িয়ে জড়িয়ে।

"এলে, ফিরে এলে, জানি তুমি থাকতে পারবে না আমায় ছেড়ে। আর একটু আগে এলে আমি এ জিনিস খেতাম না গো—কিছুতেই খেতাম না।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কি খেয়েছ, কি খেয়েছ তুমি?"

কোনও উত্তর নেই। মাথাটা সোজা রাখারও উপায় নেই। ঘাড়টা ভেঙে গেছে যেন, ছেড়ে দিলেই মাথাটা বুকের ওপর এসে পড়ছে।

হঠাৎ আমার মাথায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। বিষ খায়নি তো! নিচু হয়ে মুখ শুঁকে দেখলাম। হাঁ—এই তো, কিসের যেন গন্ধ বার হচ্ছে! এ কি মদের গন্ধ! না, কিছুতেই নয়। মালিশের ওষুধের গন্ধের মত বলে মনে হচ্ছে, এখন কি করা যায়!

কাছাকাছি মানুষজন নেই যে ডাকব। ছুটে একবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম। না একটা প্রাণীও আসছে না এদিকে। আবার দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম ঘরের মধ্যে। ওকে তুলে নিয়েই নিচে নেমে যাব।

নিচের রোয়াকে শুইয়ে লোক ডাকব। না হয় নিজেই বয়ে নিয়ে যাব—যতক্ষণ না একটা গাড়ি-টাড়ি দেখতে পাই। আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

হাঁটুর নিচে এক হাত আর ঘাড়ের নিচে এক হাত দিয়ে তুলে নিলাম বুকের কাছে। তারপর সাবধানে নামতে লাগলাম সিঁড়ি দিয়ে। আমার হাতের ওপরেই জ্ঞান ফিরে এল। শক্ত হয়ে উঠল শরীরটা। মাথাটা পিছন দিকে ঝুলছিল। ঘাড় সোজা করে ঘোলাটে চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর জোর করতে লাগল নামিয়ে দেবার জন্যে। আর সামলাতে পারলাম না, সিঁড়ির ওপরই নামাতে হ'ল।

নামাতেই দু' হাতে চেপে ধরলে আমার গলা। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে বললে—"শেষ করে দোব আজ তোমায়। শত্রু, তুই আমার সর্বনাশ করেছিস। আমার পেটে যে এসেছে তাকে আমি কিছুতেই মারতে দোব না। কিছুতেই না। কেন তুই তাকে আনলি? কেন আনলি—কেন?"

আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। প্রাণপণে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলাম। সহজ নয় মরণ-কামড় ছাড়ানো। চোখ দুটো তখন আমার ঠেলে বেরিয়েছে। আর সহ্য করতে না পেরে মরিয়া হয়ে মারলাম এক ধাক্কা। হাত ছুটে গেল আমার গলা থেকে। আর হুড়মুড় করে সে গিয়ে পড়ল একবারে নিচে।

দু' মিনিট দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিলাম। তারপর ছুটে নেমে গেলাম নিচে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি চিত করে শোয়ালাম। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

সামনেই স্নানের ঘর। এক বালতি জল এনে মাথায় মুখে ঝাপটা দিতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল। আর এক বালতি জল এনে ঢালতে লাগলাম মাথায়।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল। ঘোলাটে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে চতুর্দিকে। তারপর—দু' চোখ বুঁজে প্রায় চুপি চুপি বলতে লাগল—

"ডাক, একবারটি ডাক গো আমায় সেই নামটি ধরে। একটি বার ডাকলেই আমি গান গাইব। শ্রী বলে না ডাকলে বাগেশ্রী গাইব না আমি কিছুতে—ডাক।" বলে আদুরে মেয়ের মত ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম। অন্তিম অনুরোধ, এ অনুরোধ আমিই রাখব। কানের কাছে মুখ দিয়ে খুব চাপা গলায় খুব ধীরে ধীরে দু'বার ডাকলাম—"শ্রী, শ্রী।"

আর চোখ খুললে না। একটু পরে গুনগুনিয়ে উঠল গলা। প্রথমে ভয়ানক জড়িয়ে গেল কথার সঙ্গে সুর। তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠল কথা।

"সুখের গৃহ শ্মশান করে বেড়াস মা তুই আগুন জ্বালি।
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর ভুবন-ভরা রূপ দেখালি।
আর লুকাবি তুই কোথায় কালী॥"

হঠাৎ ঘড় ঘড় করে উঠল গলার মধ্যে। কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রাণপণে ডাক দিলাম—"শ্রী, শ্রী, শ্রী।"

বাগেশ্রী মিলিয়ে গেল।

তারপর অন্ধকার। কে জ্বালাবে সন্ধ্যা আশ্রমে! অন্ধকারেই চুপ করে বসে রইলাম সিঁড়ির শেষ ধাপটার ওপর। সামনে অন্ধকারের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে বাগেশ্রী সুর। আর জাগবে না।

অনেক রাতে অন্ধকারেই আঁচলখানি মুখের ওপর টেনে দিয়ে চোরের মত চুপি চুপি বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। হরিদ্বারের দ' থেকে উদ্ধার পেলাম

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

চিঠি পেলাম।

বন্ধু লিখেছেন, বিয়েয় না গেলে তিনি আর কখনও আমার মুখ দর্শন করবেন না।

শেষ রাত থেকে বৃষ্টি নেমেছে। যাকে বলে অঝোর ঝরা। অনেক সাধ্য সাধনার বৃষ্টি। আকাশ বাতাস আলো, মন মেজাজ ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। এমন দিনে ঘরের কোণ ছেড়ে বেরুতে কার প্রাণ চায়! কিন্তু উপায় কি! নিশ্চয়ই আর একবার বন্ধু বিয়ে করতে সাহস করবে না। যা' দিনকাল পড়েছে, লোকে একবারই ও কর্মটি করবার সাহস পায় না। সুতরাং রওনা হলাম।

এক কাঁড়ি টাকা দণ্ড দিতে হ'ল। স্ব-শ্রেণীতে ঠাঁই নেই। দেশসুদ্ধ সবাই আজিমগঞ্জ চলেছে। ইণ্টার ক্লাশ নেই এ ট্রেনে। মরিয়া হয়ে টাকা গুণে দিয়ে টিকিট পাল্‌টাতে হ'ল। বেলা সাড়ে বারটায় গাড়ি ছাড়ল।

মাত্র সাড়ে চারজন এই কামরায়। ওপাশের আসনে বসেছেন রাজস্থানের এক দম্পতি আর তাঁদের চার বছরের কন্যা। গাড়িতে উঠেই ওরা চর্বণ করতে আরম্ভ করেছেন। মস্ত বড় বেতের টুকরি ভরে এনেছেন তার রসদ। এপাশের আসনে আমার সঙ্গে যিনি বসেছেন, তাঁর কোলের ওপর খোলা একখানি আড়াই সেরি কেতাব। ভদ্রলোক ডুবে গেছেন তার পাতায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিশ্চয়ই। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কি নাম বইটির। ট্রেনে পড়বার মত বই-ই বটে। কিছুতেই ফুরাবে না জীবন ভোর গাড়ি চেপে চললেও। বইখানি চেম্বার্স ডিক্সনারী।

আমার সম্বল এক টিন সিগারেট। না যায় চিবানো, না যায় পড়া। পোড়ান যায়। তাই করতে করতে অভিনিবেশ সহকারে ডিক্সনারী পাঠক ভদ্রলোকটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।

নেহাৎ গোবেচারা গোছের রোগা মানুষটি। কনুই কাটা সাদা সার্ট আর ধুতি পরে আছেন। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। সাধারণ বাঙালীর মত গায়ের রঙ, গোঁফ দাড়ি চাঁচা, মাথার মাঝখানে সিঁথি। বেশ একটু লম্বা ছাঁদের নির্বিকার মুখ। বই থেকে চোখ তুলে দু' একবার আমার দিকে চাইলেন। মুখের অনুপাতে বেশ বড় আর ভাসা চোখ। চোখের দৃষ্টি কিন্তু বোবা নয় বরং বলা চলে খুব বেশী ইঙ্গিতময় আর মুখর সেই চাহনি। আধঘণ্টা সমানে ছুটে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল শ্রীরামপুর স্টেশনে। দাঁড়াল তো দাঁড়ালই। নড়বার আর নামটি নেই। নামবার যারা, তারা নেমে গেল—যারা ওঠবার, তারা উঠে এল। চা গরম আর গরম চা দুই মিলিয়ে এল। পাঞ্জাবের হাতকাটা বাসন্তী ভাস্কর, রামপ্রসাদী গান বার পাঁচ ছয় জানালার সামনে চেঁচিয়ে গেল। ওপাশের কর্তা লোটা হাতে নেমে গিয়ে পানি নিয়ে ফিরলেন। এপাশের ইনি একটি বিড়ি ধরালেন। গাড়ি কিন্তু ঘুমিয়েই রইল। বাইরে একটা গোলমাল উঠল। জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে দেখি ভিড় জমেছে সিঁড়ির নিচে। বাঁ হাতের চেটোয় মাটির গ্লাস বোঝাই এলুমিনিয়মের থালা মাথার ওপর উঁচু করে ধরে, ডান হাতে সাদা কেটলি ঝুলিয়ে খাকী কোর্তা পরা 'চা গরম' ভেইয়ারা ঘিরে রয়েছে জায়গাটা। অশ্রাব্য গালাগালি আর পটাপট মারের আওয়াজ আসছে সেখান থেকে।

আড়াই সেরি কেতাবখানি ফেলে আমার সহযাত্রী দরজা খুলে নেমে গেলেন। তিন লাফে সেই জটলার কাছে পৌঁছে অদ্ভুত কায়দায় সকলকে গুঁতিয়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েও এলেন একটা মেয়েকে নিয়ে। টানতে টানতে এনে তুলে ফেল্লেন আমাদের কামরায়। তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গী করে গালাগাল। সে ভাষা শুনে চোখ বুঁজে কানে আঙুল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওধারে হাসির রোল উঠেছে। ভিড় করে যারা মজা দেখছিল, তারা

বাঙালী বাবুর কাণ্ড দেখে হেসে অস্থির। তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি চোয়াড় ছোকরা, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে গাড়ির দিকে। তার হাতে একপাটি সৌখিন স্যাণ্ডেল। আর এগোতে সাহস হচ্ছে না তার। ছোকরার পোষাক আর চুলের বাহার যথেষ্ট। গোলাপী রঙের সার্ট, সবুজ রঙের পাজামা, গলায় একখানি রামধনু রঙের রুমাল বাঁধা। দু'চোখের কোলে কালি পড়েছে। গলার হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে। বেশ বোঝা গেল ছোকরার প্রাণে স্ফূর্তি আছে, বর্ষার দিনে সে একটু উড়ছে।

সেই হট্টগোলের জন্যেই বোধ হয় গাড়ির নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল। ট্রেনখানা প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলে মুখ চালানো বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে এসে বসলেন নিজের জায়গায় আমার সহযাত্রী। তাঁকে দেখে তখন কে বলবে এই মানুষটি এইমাত্র নেহাৎ বেলেল্লার ভাষায় মুখ ছোটাচ্ছিলেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে গাড়ির দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। পোষাকের বাহার তারও কম নয়। লাল সবুজ কালো গোলাপী সব রকম রঙের কাপড় জামা পরেছে সে। সবুজ রঙের জামা, তার নিচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লাল রঙের কাঁচুলি। কালো রঙের কাপড়ের ভেতর গোলাপী সায়া। এত পাতলা কাপড়খানা, মনে হয় শুধু যেন সায়া পরেই আছে। রোগা হাত দু'টিতে অনেকগুলো করে কাঁচের চুড়ি। কানে ঝুলছে কাঁধ পর্যন্ত ঠেকানো দুল। দু'টি হাতের দশটি আঙুলের নখে লাল রঙ মাখানো।

সেওড়াফুলি থেকে গাড়ি ছাড়ল। পকেট থেকে দু'টি টাকা আর একখানি টিকিট বার করে সহযাত্রী সদয় কণ্ঠে ডাক দিলেন মেয়েটিকে।

"শোন—কোথায় পালাচ্ছিলে তুমি ?"

মুখ থেকে হাত নামালে সে। বাঁ দিকের চোখ আর গলাটা ফুলে উঠেছে। ঐখানেই পড়েছে নিশ্চয়ই জুতোর বাড়ি। চোখের জলের সঙ্গে কাজল আর গালের রঙ মিশে কিম্ভূত কিমাকার দেখাচ্ছে মুখখানা মেয়েটার। ভীতিবিহ্বল চোখে সে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তিনি টিকিটখানা আর টাকা দুটো ছুড়ে দিলেন ওর পায়ের কাছে বললেন, "ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত যেতে পারবে এই টিকিটে। পরের ট্রেনে সে ছোঁড়া আসতে পারে। আবার যেন তার হাতে ধরা পোড় না।"

গাড়ি দাঁড়াল চন্দননগর স্টেশনে। ডিক্সনারী বগলে চেপে নেমে গেলেন তিনি। মেয়েটি সেইখানেই মেঝের উপর বসে পড়ল।

ব্যাণ্ডেলে গাড়ি থামতে সে নেমে গেল। বাঁচা গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসলাম। ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চাইলাম এই নোংরা ব্যাপারটা মন থেকে। কিন্তু যিনি চন্দননগরে নেমে গেলেন তাঁর নির্বিকার মুখখানা মন থেকে মুছে যেতে চাইলে না অত সহজে।

মাস তিনেক পরে।

বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে আমাদের ক্লাবে। নামকরা গাইয়ে বাজিয়ে যোগাড় করা হয়েছে। ভিড়ও হয়েছে তেমনি। প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক পরাশর বোস আসছেন। আমি কখনও দেখিনি তাঁর ক্যারিকেচার। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বিনা নিমন্ত্রণে এসে ভিড় করেছেন। বাইরে দাঁড়াবার স্থান নেই। স্টেজে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। পরাশর বোসকে নিয়ে সেক্রেটারি ভাস্কর রায় ঢুকলেন। আমার পাশেই একখানা টিনের চেয়ার দিয়ে বললেন, "এখানেই বসুন পরাশরবাবু। কি খাবেন? চা না সরবৎ?

চমকে উঠলাম। কখনও ভুল হবে না এ মুখ। সামলাতে পারলাম না. বলে ফেল্‌লাম, "নমস্কার, চিনতে পারছেন?"

হেসে জবাব দিলেন, "খুব পারছি। সে মেয়েটা নেমে গিয়েছিল তো ব্যাণ্ডেলে?"

বললাম, "গেল বৈ কি।" বলে বোকার মত প্রশ্ন করে ফেললাম—"ও কি আপনার চেনা লোক নাকি?"

"চেনা! চেনা হবে কি করে?"

"তবে যে ওকে ধরে এনে গাড়িতে তুললেন হঠাৎ।"

"তা' না হলে আরও জুতো খেয়ে মরত যে। ছোঁড়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মারটা থেকে তো বাঁচিয়ে দিলাম, ব্যাস্।"

এমন হাল্কা ভাবে কথাটা বললেন যেন ওরকম কাজ করাটা একেবারে কিছুই নয়। এক গাড়ি লোকের চোখের ওপর সেই রকম একটা মেয়ের হাত ধরে টেনে এনে গাড়িতে তুলতে যে সে পারে! তারপর সেই মুখখিস্তি আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা ছোড়াটাকে—"আয় না দেখি শালা—দে আর একবার হাত ওর গায়ে, তাহলে—" তাহলে যে তার কি দশা করে ছাড়বেন, তার জলজ্যান্ত কাঁচা কাঁচা ফিরিস্তি দেওয়া এ সমস্ত কর্ম সকলের পক্ষেই জলের মত সহজ আর সোজা! কে কি ভাবছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। হাঁ করে চেয়ে রইলাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে। তিনি তখন আরামে সরবতে চুমুক চালাচ্ছেন।

তারপর তিন বছর কেটে গেল। যেখানে পরাশর সেখানেই আমি। কবে যে আমাদের সম্বন্ধটা তুই পর্যন্ত নেমে গেল তা' টেরও পেলাম না। হাজার হাজার জোড়া চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নিতান্ত গোবেচারা পরাশর যখন মানুষের ন্যাকামি আর হামবড়াপনার হুবহু নকল করে উদ্ভট বক্তৃতা দিতে থাকে শ্রোতাদের—তখন হাসির চোটে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। আর নেপথ্যে বসে হাজার হাজার জোড়া হাততালির তালে আমিও ফুলে উঠি বন্ধুগর্বে। সিনেমার ষ্টুডিও, স্টেজ, রেডিও আর এখানে ওখানে জলসা, সর্বত্র ঘুরছি ওর সঙ্গে। চপ কাটলেট লুচি পোলাও খাচ্ছি। এক পয়সা খরচা নেই। কেউ না কেউ খাওয়াচ্ছেই। বাড়ির খাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। পরাশরের বাড়ি ঘর আত্মীয়স্বজনের হাঙ্গামা নেই। থাকলে এতদিনে জানতে পারতাম। একটা নামজাদা হোটেলের একখানা সাজানো ঘরে সে থাকে। তারও ভাড়া লাগে না। হোটেলের মালিক বিজ্ঞাপন দেন

কাগজে—এই হোটেলের রুচি এতই উচ্চস্তরের যে বিখ্যাত পরাশর বোস এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

ভাবি এত খেটে ওর লাভ কি! কে খাবে ওর টাকা। বিয়ে থা করেনি, করবেও না কখনও। বলে, লোক হাসিয়ে পেট চালাই। কার এমন গরজ পড়েছে এই হতচ্ছাড়াকে বিয়ে করবে? নেশার মধ্যে নিজে কিনে খায় বিড়ি। পরের পয়সায় ফোঁকে সিগারেট। অন্য কিছু পরের নিজের কারও পয়সাতেই ছোঁয় না। তবে আছে বটে আর একটি নেশা। সেটি হচ্ছে খামকা পরের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া। তখন অনর্থক বহু টাকা বেরিয়ে যায়। সেবার একটা কুকুরের জন্যে কি কাণ্ড করে বসল।

খুব ভোরে দু'জনে ফিরছি স্টুডিও থেকে। টালিগঞ্জের রাস্তায় তখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি। ট্রাম ডিপো পর্যন্ত গেলে ট্যাক্সি রিক্সা যাহোক একটা পাব এই আশায় হাঁটছি। আমাদের উল্টা দিক থেকে সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ সাড়ে তিনমন ওজনের এক দেশী সাহেব আসছেন কাঁধে দোনলা বন্দুক ঝুলিয়ে। আরও কাছাকাছি হতে দেখা গেল একটি বড় লোমওলা বিলিতি কুকুরের গলায় দড়ি বেঁধে তিনি টেনে নিয়ে আসছেন। কুকুরটার জিভ বেরিয়ে গেছে আধ হাত, প্রাণপণে চেষ্টা করছে দড়ির ফাঁস থেকে গলাটা খোলবার জন্যে। সাহেবও প্রাণপনে টানছেন দড়ি ধরে। কুকুরটা শুয়ে পড়ল। তাতে কি, সেই অবস্থায় তাকে হিঁচড়ে নিয়ে চললেন সাহেব।

পরাশর সামনে গিয়ে বিনীত ভাবে জানতে চাইলে—"কি হয়েছে? অমন করছে কেন কুকুর? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি কুকুরটাকে?"

দাঁতে পাইপ কামড়ানো সেই দুশমন-মুখ থেকে গোঁ গোঁ করে জবাব এল, "ওটা খেপেছে। ফাঁকা মাঠে গুলি করে মারতে নিয়ে যাচ্ছি। জবাব দিয়েই এক লাফে কুকুরটার পিছনে এসে সজোরে দিলেন এক সবুট লাথি কুকুরের

পাঁজরায়। মর্মন্তুদ আর্তনাদ করে কুকুরটা নিথর হয়ে গেল। তার দুটো চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরাশর কুকুরের ওপর।

সাহেব তেড়ে এসে পরাশরের কাঁধ খামছে ধরলেন। "বেল্লিক বেয়াদব, ছাড় আমার কুকুর। যা' খুশি করব আমার কুকুরকে। তুই বাধা দেবার কে ?"

পরাশর উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই লাগালে এক ঘুষি সাহেবের থ্যাবড়া নাকে। তিনি ঘুরে পড়লেন, বন্দুকটা ছিটকে পড়ল এক ধারে। চক্ষের নিমেষে সেটার নল ধরে তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে পরাশর। রাস্তার বাঁ পাশে একটা পুকুরের মধ্যে পড়ল সেটা ঝপাং করে। ততক্ষণে কুকুরের গলার দড়িটা আমি খুলে দিয়েছি।

তারপর দৌড়। খানিক পরে দেখি কুকুরও ছুটে আসছে আমাদের সঙ্গে। পাওয়া গেল একখানা খালি রিক্সা। কুকুরকে রিক্সায় চাপিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম আমরা।

পরামর্শ দিলাম পরাশরকে—"কুকুরটা সরিয়ে ফেলি। নিশ্চয়ই পুলিশ আসবে কুকুরের খোঁজে।"

ও গ্রাহ্যই করল না। হোটেলের মালিকের ওপর হুকুম হয়ে গেল: রোজ আধ সের মাংস আর আধ সের দুধ চাই কুকুরের জন্যে। কুকুর শুয়ে রইল খাটের তলায়।

যথাসময়ে দু'জন গ্রেপ্তার হলাম। লাইসেন্স করা বন্দুক ছিনিয়ে এনেছি আমরা। পুলিশের বড় কর্তারা পরাশরকে চিনতেন। সব ব্যাপার তাঁদের বলা হ'ল। তখন টাকার শ্রাদ্ধ করে অত বড় পুকুরটা ছেঁচে ফেলা হ'ল। পুকুরের মালিকও বেশ কিছু টাকা নিলেন তাঁর মাছের জন্যে। পাঁকের ভেতর পাওয়া গেল বন্দুক। গেল তাই রক্ষে। নয়ত সে যাত্রা নির্ঘাত শ্রীঘর বাস করতে হ'ত।

কিছুতেই কুকুর দেওয়া হ'ল না সাহেবকে। পুলিশ সাহেবের সামনে এক গোছা নোট তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলে পরাশর। জানতে পারা গেল লোকটারই মাথা খারাপ, কুকুরের নয়। সে ভাল ভাল বিলিতি কুকুর পোষে আর কিছুদিন পরে গুলি করে মেরে ফেলে।

হাসি ঠাট্টা নিয়ে যার কারবার সেই লোক সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমন মেতে ওঠে তখন ওকে ফেরায় কার সাধ্য। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করে কিছুতেই ছাড়বে না পরাশর বোস।

মফঃস্বল থেকে একটা বহু টাকার ডাক এল। মহামহোৎসব লাগিয়েছেন এক কুমার বাহাদুর। তাঁর মা মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন গুরুদেবের নামে। সারা দেশের গুণী লোক জমা হচ্ছেন সেখানে। এক পক্ষ ধরে উৎসব চলবে। এক সপ্তাহ ওঁরা রাখতে চেয়েছিলেন পরাশরকে। কিন্তু তা' সম্ভব নয়। সিনেমার ছবি তোলা বন্ধ করা যায় না। দিন ছয়েক পরে রেডিওর প্রোগ্রাম রয়েছে। তিন দিনের জন্যে বায়না নেওয়া হ'ল।

তল্পিতল্পা বেঁধে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল সে এক ইলাহী কাণ্ড। যাত্রা থিয়েটার কবিগান ম্যাজিক। বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন কাশী লক্ষ্ণৌ বোম্বাই থেকে। নাম করা আধুনিক আধুনিকারা তো আছেনই। বিরাট এক মেলা বসে গেছে। লোকও জমেছে তেমনি। ছই বাঁধা গরুর গাড়িতে সংসার চাপিয়ে এসেছে দূর গ্রাম থেকে। আর এসেছেন কয়েক হাজার সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। রোজ কত হাজার লোককে এঁরা খাওয়াচ্ছেন কে তার হিসেব দেয়।

বহু টাকা খরচা করে হাজার পাঁচেক লোক বসতে পারে এতবড় প্যাণ্ডেল বানানো হয়েছে। সাজানোও হয়েছে তেমনি ভাবে, চোখ ধাঁধিয়ে যায় আলো আর রঙের খেলায়। প্রথম রাতেই পরাশর একেবারে পাগল করে তুললে লোককে। তার পরদিন আর প্যাণ্ডেলের ভেতর পরাশরের স্থান হ'ল না। খোলা জায়গায় হাজার-হাজার লোকের সামনে উঁচু মাচার ওপর দাঁড়িয়ে

সে চালালে তার বক্তৃতা। অর্ধেক কথা কারও কানেই ঢুকল না এমন উৎকট হাসির রোল উঠল। খোদ মালিক আর তাঁর অন্তঃপুরবাসিনীরা মেতে উঠলেন। আমাকে পর্যন্ত খোশামোদ, যত টাকা লাগে লাগুক আরও কয়েকটা দিন পরাশরকে আটকে রাখতে হবে!

পরদিন খুব সকালে বাইরে থেকে খবর এল এক বৈষ্ণব বাবাজী পরাশরের দর্শন প্রার্থী। পরাশরের হুকুম নিয়ে বাবাজীকে ভেতরে আনা হ'ল। সাধারণ লোকের চেয়ে লোকটি বেশ লম্বা। চুল দাড়ি সমস্ত সাদা, দুধের মত সাদা। মাথার মাঝখানে চুড়ো বাঁধা। পা পর্যন্ত লম্বা সাদা আলখাল্লা। দু'টি চোখে যেন প্রসন্নতা উপছে পড়ছে। পরাশরের সামনে এসে তিনি এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন মিলিয়ে নিলেন মনে মনে। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন, "তোমার নাম প্রহ্লাদ নয়? বিলোনিয়ার প্রহ্লাদ বোস তুমি, কেমন কি না?"

পরাশর ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেও এক দৃষ্টে চেয়ে আছে বাবাজীর দিকে। কোনও কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে। শুধু একবার মাথা দোলালে। বাবাজী কাঁধের ঝোলার ভেতর থেকে একটি ছোট পোঁটলা বার করে পরাশরের দিকে এগিয়ে ধরলেন। মুখে শুধু বললেন, "ধর তোমার জিনিস।" পরাশর হাত বাড়িয়ে ধরলে জিনিসটা। তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বাবাজী।

অনেকক্ষণ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল পরাশর কাপড়ে জড়ানো পোঁটলাটার দিকে, আমিও। তারপর খুলতে আরম্ভ করা হ'ল পোঁটলাটা। সেও বড় সহজ ব্যাপার নয়। সাতপুরু কাপড় জড়ানো। খুলছি আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি কি বেরুবে এর ভেতর থেকে! পরাশর নিচু হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছে। বেরুল একটা বালির কৌটো, কৌটোর ঢাকনা খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করে ঝাকানি দিলাম। লাল কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট একটি পুঁটলি ঠক্ করে উঠল। সেটা খুলে ফেললাম। কয়েকটা ছোট বড় সিন্দুর মাখানো কড়ি,

কিছু শুকনা ফুল আর ছোট্ট দু'গাছি সোনার বালা। বালা দু'গাছি হাতে তুলে নিয়ে পরাশর কি দেখলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, মুখে এক বিন্দু রক্ত নেই, আর সে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। স্বয়ং কুমার বাহাদুর ছুটে এলেন। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল সমস্ত মেলা। কোথাও বাবাজীর চিহ্ন মাত্র নেই। তখন কুমার বাহাদুর আমাদের তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে ছুটলেন স্টেশনে। এখনই একখানা ট্রেন ছাড়বে।

স্টেশনে পৌঁছালাম যখন আমরা, তখন ট্রেন এসে গেছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটল পরাশর প্লাটফরমের দিকে। তাড়াতাড়ি আমরাও এলাম। কুমার বাহাদুরকে দেখে স্টেশন মাষ্টারও ছুটে এলেন। একটা কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে। সেখান থেকে মার মার আওয়াজ উঠছে। সহজ ব্যাপার নয়, প্রকাশ্য দিনের বেলা এক গুণ্ডা একটা আট ন বছরের মেয়েকে গাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ স্টেশন মাষ্টার গার্ড জোর করে লোক সরিয়ে কামরার সামনে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁদের পেছন পেছন আমরাও।

পরাশর দু'হাতে একটা আট ন বছরের মেয়েকে আঁকড়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। গাড়ির দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন সেই বাবাজী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা মাতাজীও হাউমাউ করে কাঁদছেন।

পুলিশ স্টেশন মাষ্টার গার্ডকে দেখে গোলমালটা একটু থামল। তখন শোনা গেল বাবাজীর ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। "তোমার মেয়ে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে প্রহ্লাদ। আট বছর আমরা ওকে বুকে করে রক্ষা করেছি, ওর মায়ের শেষ কথাটিও রাখতে পেরেছি আমি। তোমাদের বিয়ের কড়ি আর ফুল তোমার হাতে দিতে পেরেছি। কিন্তু ঐ মেয়ে তুমি বাঁচাতে পারবে না। ও কিছুতেই তোমার সহ্য করতে পারবে না।

লোক হাসিয়ে পেট চালাও তুমি। ও মেয়ে আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে মাধুকরী করে আর কৃষ্ণ নাম গায়। ওকে আপনার করে পেতে হলে তোমাকেও লোক হাসানো ছেড়ে মেয়ের সঙ্গে এই পথে আসতে হবে। নয়ত ওকে নিয়ে শান্তি পাবে না।"

মাথায় চুড়া বাঁধা, নাকে তেলক কাটা, গলায় কন্ঠি পরা, বৃন্দাবনী ঢঙে ছাপান শাড়িখানা গলায় গিট দিয়ে বাঁধা ফুটফুটে মেয়েটি পরাশরের হাত ছাড়াবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চেঁচাতে লাগল। পরাশর আরও জোরে তাকে বুকে আঁকড়ে ধরে রইল।

হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে গার্ড সাহেব হুইসিল মুখে পুরলেন। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে স্টেশন মাষ্টারের ইসারায় কি কথা হ'ল। স্টেশন মাষ্টার গার্ড সাহেবের দিকে চেয়ে হাত নাড়লেন। সবুজ নিশান দুলে উঠল গার্ড সাহেবের মাথার ওপর।

ওধারে চেয়ে দেখি, দু'হাতে গাড়ির দরজা ধরে বাবাজী রুখছেন মাতাজীকে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেনই গাড়ি থেকে। ইঞ্জিনের বাঁশী ককিয়ে উঠল লম্বা টানে। নিচে মেয়েটি পরাশরের হাত থেকে, ওপরে মাতাজী বাবাজীর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

পরাশর আর কিছুতে ফিরলে না স্টেশন থেকে। কুমার বাহাদুর সমস্তই বুঝলেন। বাস্তবিকই এখন পরশারের পক্ষে ক্যারিকেচার করা সম্ভব নয়। তিনি গিয়ে আমাদের জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন। এক ঘণ্টা পরে আমরা কলকাতার গাড়িতে চাপলাম। পরাশরের মেয়ের কান্না থেমেছে বটে। কিন্তু সে একভাবে জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল। কিছুতেই মুখও ফেরালে না, একটি কথাও বললে না আমাদের সঙ্গে। এমন কি এক বিন্দু জলও খাওয়ান গেল না অতটুকু মেয়েকে।

গাড়িতেই দু'-কথায় বললে পরাশর ব্যাপারটা। আট বছর আগে মস্ত বড় অভিনেতা হবার আশা বুকে নিয়ে যেদিন সে গ্রাম ছাড়ে, তখন এই মেয়ে

তার সাত আট মাসের ছিল। ঐ বালা দু'-গাছা মেয়ের অন্নপ্রাশনে গড়ান হয়। তারপর দেড় বছর পরে আবার যেদিন সে গাঁয়ে ফিরে গেল সেদিন পেল শুধু ছাই। বাড়িঘর যেখানে ছিল সেখানে পড়ে আছে ভস্ম। একটি লোকও গ্রামে নেই। মেয়ে বউয়ের সন্ধান দেবে কে?

আবার কলকাতায় ফিরে এল পরাশর। এবার সে অন্য মানুষ। নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার দুর্জয় সঙ্কল্প তার বুকের মধ্যে। প্রতিশোধ নেবে সেই দেবতাটির ওপর, যিনি নেপথ্যে বসে অজস্র কান্না ঢেলে দিচ্ছেন এই দুনিয়ার ওপর। হাসি, শুধু হাসি বিলোবে সে। হাসি বিলিয়ে ক্ষণিকের জন্যে হলেও লোকের চোখের জল শুকিয়ে ফেলবে। তাহলেই সেই নিষ্ঠুর দেবতা জব্দ হবেন যিনি শুধু কান্না ঢেলে দিয়ে আনন্দ পান!

সে প্রতিশোধ সার্থক ভাবে নিচ্ছিল পরাশর। কিন্তু মেয়ে ফিরে পেয়ে সে শক্তিটুকু সে খোয়ালে। দিবারাত্র এক চিন্তা এক ভাবনা, কি করে মেয়ের মুখে হাসি ফোটান যায়। সাজ পোষাক জিনিসপত্র দোকান উজাড় করে কিনতে লাগল। অষ্টপ্রহর মেয়ের কাছ ছাড়া হয় না। সিনেমা থিয়েটার চিড়িয়াখানা সর্বত্র নিয়ে ঘুরতে লাগল মেয়েকে। আলাদা বাড়ি ভাড়া করলে। সারা দিনরাতের জন্যে শিক্ষয়িত্রী রাখলে। কিছুতেই কিছু হ'ল না। বিশ্ব-সংসারকে যে হাসিয়ে বেড়ায়, সে একটা আট ন বছরের মেয়ের মুখে একটি বারের জন্যেও হাসি ফোটাতে পারলে না। মেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল।

আমিও পরাশরের কাছে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। গিয়ে কি করব? স্টুডিও স্টেজ জলসা সব ছেড়েছে পরাশর। একটি সন্ধ্যায়ও সে জলসায় যায় না। শুধু মেয়ে, মেয়ে আর মেয়ে।

শেষে একদিন তার চিঠি পেলাম। বেলা দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হাওড়া থেকে তুফান এক্সপ্রেস ছাড়বে। আমি যেন সেই গাড়িতে তার সঙ্গে শেষ দেখা করি—এই তার অনুরোধ।

চিঠি পেলাম সাড়ে নয়টার সময়। তৎক্ষণাৎ ছুটলাম।

খুঁজেই পাই না পরাশরকে। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে। শেষে তার নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে লাগলাম গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা।

একখানা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে পরাশর নেমে এল! মাথা কামানো, গলা থেকে পা পর্যন্ত সাদা আলখাল্লা পরা। গলায় কণ্ঠি, নাকে তেলক। সহজ এক ফালি হাসি তাঁর মুখে। আমার দু'হাত ধরে বল্লে, "এতদিনে শান্তির পথ খুঁজে পেলাম ভাই। মেয়ের মুখে এতদিনে হাসি ফোটাতে পেরেছি। এবার বৃন্দাবন যাচ্ছি, সেখানে মেয়ের সঙ্গে মাধুকরী করে জীবনটা কাটাবো। আর আমারও লোক হাসিয়ে পেট চালাতে হবে না।

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন ভিক্ষে করবি পরাশর? অত টাকা তোর কি হোল?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলে, "তার পাই পয়সা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি যক্ষা হাসপাতালে। ও টাকায় আমার কোনও উপকার হবে না। যদি একটা মৃত্যু পথযাত্রীর মুখেও হাসি ফোটে, তবেই ও টাকা সার্থক। লোক হাসিয়ে টাকা জমিয়েছি, ও দিয়ে লোকের মুখেই হাসি ফুটুক।"

আর একটি কথাও হয়নি তার সঙ্গে। কার সঙ্গে কথা কইব? এ তো পরাশর বোস নয়। এ হচ্ছে বাবাজী প্রহ্লাদ দাস। জলন্ত চোখে চেয়ে রইলাম গাড়ির ভেতর ওর মেয়ের দিকে। চুড়ো বেঁধে তেলক কেটে কণ্ঠি পরে গাড়ির ভেতর হাসি মুখে বসে আছে প্রহ্লাদ দাসের মেয়ে।

কয়েকদিন পরে রেডিওর প্রোগ্রামে দেখি রাত সাড়ে আটটায় পরাশর বোস হাসির নক্সা শোনাবেন। হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ নিশ্চয়ই সেদিন রাত সাড়ে আটটায় রেডিও খুলে কান পেতে বসেছিল পরাশরের গলার আওয়াজ শোনবার জন্যে। আমিও বসেছিলায় রেডিওর সামনে। সাড়ে আটটা বাজল।

"আকাশবাণী, কলিকাতা। নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে এখন"—খট করে চাবি ঘুরিয়ে দিলাম।

মনস্থির করে ফেললাম।

তবু আজ যাই কাল যাই করে আরও মাসখানেক কেটে গেল। বন্ধু-বান্ধবরা মুখ বাঁকাতে লাগলেন। একদিন যাঁরা শতমুখে বলতেন, "তোমার মত অমন গল্প কেউ কখনও লেখেনি। পাঠিয়ে দিয়ে দেখ—একেবারে লুফে নেবে" তাঁরাই যখন প্রতি সন্ধ্যায় এসে কোনও চিঠি আসেনি শুনে নিরাশ হতে লাগলেন, তখন আর ছেড়ে কথা কইলেন না। যাবার সময় শুনিয়ে গেলেন, "ছাপবে কেন বল? অমুকের অমুকের অত সব ভাল ভাল গল্প পেলে তোমার লেখা আগে ছাপবে কেন?"

শুনতে শুনতে মরিয়া হয়ে উঠলাম।

নাঃ, আর দেরি করা কোনও কাজের কথা নয়। একবার যেতেই হচ্ছে কলকাতায়। সবসুদ্ধ সাতাশটা গল্প সাতাশখানা মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাঠিয়েছি। উত্তর দেওয়ার জন্যে ডাক টিকিট দিয়ে দিয়ে চিঠির পর চিঠি দিচ্ছি। একখানারও যদি জবাব আসে। এবার একবার নিজে গিয়ে সম্পাদক মহাশয়দের কাছে তদবির তদারক করতেই হবে।

কিন্তু যাব বললেই তো আর হুট করে যাওয়া যায় না। তোড়জোড় করতে হবে তো। পঞ্চতীর্থ মশায়ের কাছে একটি দিন দেখাতে গেলাম। প্রথম দুটো দিন দরজার বার হয়েও আর এগুনো হোল না। কলকাতায় পৌঁছে যখন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব তখন।

সেই তখনকার কথা ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

শেষে তৃতীয়বার পঞ্চতীর্থ মশায়ের শরণাপন্ন হয়ে যে শুভদিনটি পাওয়া গেল সেটি আর ফসকাতে দিলাম না। পনেরোই ফাল্গুন বুধবার সকাল সাতটা তিপান্ন মিনিটের পর আটটা সাত মিনিটের মধ্যে যাত্রা। একসঙ্গে অমৃতযোগ এবং বামে যোগিনী। ফল সর্বার্থসিদ্ধি।

মঙ্গলবার রাত্রে ভাল করে ঘুম হোল না। চেয়ারে বসা সম্পাদক মশায়দের মূর্তি চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলে চোখে ঘুম আসবে কি করে।

তবু বেরুতে হোল সেই অমৃতযোগে। একান্ত বান্ধব যাঁরা তাঁদের মধ্যে দু'চারজন সেই সাত সকালেই যাত্রা করাতে এলেন।

"ত্থাখ অনুকূল, অত মুখচোরা হলে চলবে না বুঝলে। আরে যাঁরা কাগজ ছাপান তাঁরা তো আর বাঘ ভাল্লুক নন যে খেয়ে ফেলবেন। সেখানে গিয়ে তাঁদের সামনে যেন ঘাবড়ে যেও না। বেশ গুছিয়ে বলবে—মানে তাঁদের মনে একটা ছাপ ধরাতে পারলেই বুঝলে কি না।"

বুঝছি সবই। সকলের কথাই কানে ঢুকছে। উত্তর দিলাম না। শুধু মনে মনে ইষ্ট নাম জপ করতে করতে বেরিয়ে পড়লাম।

সকাল ন'টা পঁচিশ।

শেয়ালদা স্টেশনের তিন নম্বর প্লাটফরমে ট্রেন ঢুকছে। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে আছি।

ট্রেন প্লাটফরমে ঢুকছে আর ঝর্ ঝর্ করে রাশি রাশি মানুষ সেই চলন্ত ট্রেন থেকেই খসে পড়তে লাগল প্লাটফরমের ওপর। ভূমি স্পর্শ পাওয়ামাত্রই ছুট। তারপর গাড়ি থামল। নিমেষে প্লাটফরমের এ-মাথা থেকে ও-মাথা শুধু মানুষ—আর মানুষ। সবায়ের মুখ এক দিকে। ভুল করে একজনও পিছন দিকে মুখ ফেরালে না। কে কাকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। তুমুল প্রতিযোগিতা লেগে গেল। ইস্তিরি করা প্যাণ্টকোট পরা যাঁরা উচ্চ শ্রেণী থেকে নামলেন তাঁরাও লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁকে চললেন। ঢিমে তেতালায় চললে স্মার্ট দেখাবে না যে। কাজের লোক তাঁরা। সময়ই বা কই তাঁদের হাতে-বাঁধা ঘড়িতে। যে করে হোক সবাইকে পিছনে ফেলে প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে যাবার গেটটা পার হতে পারলে তবে স্বস্তি।

মোবাইল কোর্ট।

অর্থাৎ মুড়ি মিছরির একদর সেদিন।

মান্থলি বলে ঘাড় বেঁকিয়ে বা শুধু একটু মাথা হেলিয়ে রোজ যাঁরা বেরিয়ে যান তাঁদেরও পকেটে হাত ঢোকাবার দিক্‌দারি সহ্য করতে হোল। ছন্দপতন হোল তাঁদের গতির। কেউ বললেন 'ডিসগাষ্টিং'। কেউ বললেন 'নুইসেন্স'। মহামূল্য সময় নষ্ট হচ্ছে। টিকিট-কেটে আসা সাধারণ যাত্রীদের মত বাধা পেয়ে মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? কষ্টটুকু আজ সহ্য করতে হবেই—ললাটের লিখন।

সবায়ের শেষে গাড়ি থেকে নেমে সকলের পিছনে পা ঘসে ঘসে এগুচ্ছি গেটের দিকে। টিকিটখানা ইতিমধ্যে হাতের মুঠোয় টিপে ধরেছি আর ভাবছি। ভাবছি কথাটা কি ভাবে পাড়তে পারলে সম্পাদক মহাশয়রা একেবারে ভিজে গিয়ে আমার লেখাগুলো এ মাসেই ছাপিয়ে ফেলবেন।

কানে এল, "মান্থলিখানা জামার পকেটেই রয়ে গেছে। দেখছেন তো—জামাকাপড় পালটে এসেছি আজ। ট্রেন ধরবার তাড়াহুড়োয় সবই নিতে ভুলে গেছি: এমন কি টাকা পয়সা পর্যন্ত একটিও সঙ্গে নেই। রানাঘাট থেকে সেই সকাল আটটার আগে গাড়ি ধরতে হয়। হতভাগা মেয়েটা যদি একটু খেয়াল করে সব দেখে শুনে দিত। দেখুন শুনছেন—" অসহায় কাকুতি মিনতি।

ভারিক্কী ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি কখন গেটের কাছে পৌঁছে গেছি।

বয়স পঞ্চাশের ওপর নিশ্চয়ই। ওই বয়সের ভদ্রলোকের যেমন হওয়া উচিত তেমনি ভারী দেহ। গোল মুখ, বড় বড় দুই চোখ, মাথার মাঝখান পর্যন্ত টাক, আর প্রায় সাদা খোঁচা খোঁচা এক মুখ গোঁফ।

জামা কাপড় আজ পালটেই এসেছেন বটে। ঘরে সাবান দিয়ে কাচা ইস্তিরি-না-করা সাদা কাপড়ের ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি। এক কাঁধে রয়েছে একখানি ময়লা চাদর, বোধ হয় মটকাই হবে, সেখানির কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয়। প্রায় হাঁটুর কাছ পর্যন্ত গুটিয়ে পরা কাপড়খানিও সাবান দিয়ে কাচা। পায়ে অগতির গতি সেই বাটার জুতা—কাপড় আর রবারের তৈরী। জুতোও শেষ অবস্থায় পৌঁছেছে।

ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করলেন—"দেখুন—শুনছেন—আজ আমার বাড়িতে একটা বিশেষ—দেখুন শুনছেন—আপনি না হয় আমার অফিসের নামটা—দেখুন—শুনছেন।"

যাঁকে দেখাবার এবং শোনাবার জন্যে এই আকুল আবেদন তিনি মুখও ফেরালেন না। প্রায় গুটি দশ এগার মাছ পড়েছে তাঁর জালে। সব ক'টিকে সামলে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে জমা করে দিয়ে তিনি আজ তাঁর কৃতিত্ব দেখাতে একান্ত উদ্‌গ্রীব। পাশেই দাঁড়িয়েছিল দু'জন পুলিশ হুঁশিয়ার হয়ে। তাদের ইসারা করে তিনি অগ্রসর হলেন সামনে।

ভদ্রলোক আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। খপ্ করে রেল কোম্পা-নির ইস্তিরি করা কোটের হাতটা চেপে ধরলেন।

"বাবা তুমি আমার ছেলের মত—" কথাটা আর শেষ করতে হোল না। চটাস করে একটা চড় পড়ল তাঁর গালে।

"লোফার ভ্যাগাবণ্ড জোচ্চর—ন্যাকামী করতে এসেছে। রোজ রোজ ফাঁকিবাজি। আর ধরা পড়লেই বাবা তুমি আমার—"

গট্ গট্ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। পুলিশ দু'জন নির্বিকার ভাবে সকলকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

পিছন পিছন আমিও চললুম।

কেন যে গিয়েছিলুম তা' বলতে পারব না। বোধ হয় চড়টা সেই ভদ্র-লোকের গালে পড়লেও তার জ্বলুনিটা আমার গালেও বেশ মালুম হচ্ছিল। কিংবা সেই আকস্মিক চড় খেয়ে তাঁর চোখে মুখে যে নিরব ভাষা ফুটে উঠেছিল সেই ভাষাই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওদের পিছন পিছন।

বিচার হয়ে গেল।

বিচারকর্তার প্রশ্নের উত্তরে আসামী শুধু ডান হাতে গাল ঘষে আর বিশ্রী রকমের ভিক্ ভিক্ আওয়াজ করে হাসে। সাব্যস্ত হোল লোকটা আস্ত ধড়িবাজ। পাগলামীর ভান করছে। দু'মিনিটেই বিচার শেষ। দশ টাকা জরিমানা নয় তো দশদিন জেল।

টাকা দাও। উত্তরে সেই এক হাসি। হাসি যেন ভেতরে চাপা থাকতে না পেরে চোখ মুখ দিয়ে গোঁফের ভেতর থেকে উপ্‌চে উপ্‌চে বেরুচ্ছে। শুধু বিদঘুটে রকমের আওয়াজ হচ্ছে ভিক্ ভিক্ করে। আবার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাঁকে।

আর থাকতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে দশটি টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দেবার চেষ্টা করলাম। "এই নিন টাকা—ফাইনটা দিয়ে আসুন।"

কার হাতে টাকা দিচ্ছি, আমার দিকে নজরই দিলেন না। সোজা সামনের দিকে চেয়ে সেই হাসি হাসতে লাগলেন। একটা হাত চেপে ধরলাম, "শুনছেন মশাই—এই টাকা দশটা ধরুন। দিয়ে আসুন গিয়ে।"

এতক্ষণে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। কিন্তু হাসি থামল না। দেখলাম সেই হাসির সঙ্গে দুই চোখের জল গড়িয়ে নামছে গোঁফের ওপর। নোটখানা হাত থেকে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটলাম ওঁদের কাছে। জমা দিয়ে ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে নিলাম। পুলিশ দু'জনের একজন চাপা গলায় বললে, 'আমাদেরটা'। বলে হাত পাতলে। জিজ্ঞাসা করলুম, "আবার কি?"

"আমরাও পেয়ে থাকি।"

ওদের আর কোন উত্তর দিলাম না। তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এবার কি করা যায়? যত কথা জিজ্ঞাসা করি—উত্তরে সেই এক হাসি। আমার দিকে একবার তাকাচ্ছেনও না।

কি মুস্কিলেই পড়া গেল। এধারে সাড়ে দশটা বাজতে চলেছে। আর তো দেরি করা চলে না আমার। ওধারে ওঁরা যদি বেরিয়ে যান অফিস থেকে। ব্যোমকেশদা বার বার করে বলে দিয়েছেন, "বেলা বারটার আগেই দু'চার জনের সঙ্গে দেখা করে ফেলবে। বেলা বারটার পর ওঁরা হয়ত বাড়ি যান খাওয়া দাওয়া করতে। আবার বিকেলের দিকে আসেন।"

ব্যোমকেশদার কবিতা কাগজে বেরোয়। তাঁর পরামর্শের দাম আছে।

চারধারে ভিড় জমতে লাগল। নানা রকম প্রশ্ন হরেক রকমের মন্তব্য চলেছে চতুর্দিকে। ঘেমে উঠলাম। একটু আড়াল পেলে হোত। এত জোড়া চোখের সামনে থেকে ভদ্রলোককে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও একটু বসতাম। তারপর সুস্থ হলে এঁর বাড়ি কোথায় জেনে নিয়ে একখানা টিকিট কিনে গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া। তারপরই আমার ছুটি।

কোথায় যাওয়া যায় ?

ইতিমধ্যে আর একখানা ট্রেন এসে গেছে। পিল পিল করে লোক বেরুচ্ছে। আমাদের দু'ধার দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে রাশি রাশি মানুষ চলে যাচ্ছে।

"আরে হৃষিকেশবাবু যে। এখানে দাঁড়িয়ে আছেন—অফিসে যাননি ?"

চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখি কোট প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একেবারে আকাশ হাতে পেলাম। সংক্ষেপে ব্যাপারটা তাঁকে জানিয়ে অনুরোধ করলাম, "যাক্—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, বাঁচলাম আমি। এবার এঁর একটা ব্যবস্থা করুন।"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "সে কি করে হয়—আমার দু-দুটো কেশ। আমি এঁকে নিয়ে এখন কোথায় ঘুরব।" তিনি পাশ কাটাতে গেলেন।

পথ আগলে তাঁর বহুমূল্য সময়ের আরও একটু নষ্ট করে জেনে নিলাম আমার পাশের অসহায় লোকটির নাম ঠিকানা। নাম হৃষিকেশ হালদার।

বাড়ি রানাঘাটের অমুক রাস্তায়। কলকাতায় ক্রাকমুলার কোম্পানীর অফিসে চাকরি করেন।

তাঁকে আর আটকে রাখা সম্ভব হোল না। বোঁ বোঁ করে দৌড়ে গিয়ে ডালহাউসির বাসে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

বললুম, "চলুন, এবার বাড়ি ফেরা যাক্।"

কাকেই বা বলছি, কেই বা শুনছে। একটা জলজ্যান্ত সুস্থ মানুষ একটি মাত্র চড় খেয়ে কি করে এমন বদ্ধ পাগল হয়ে যেতে পারে, দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের এই দেহের মধ্যে মন নামক যে যন্ত্রটি অষ্টপ্রহর চলছে, চলতে চলতে হঠাৎ যদি সেটি বিগড়ে বসে তখন তার শোচনীয় পরিণাম যে কতদূরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তার চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে শিউরে উঠলাম। কিন্তু এঁকে এখন ছেড়েই বা দিই কি করে। আবার ফিরে চললাম। হাত ধরে টানতে টানতে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে।

দু'খানা রানাঘাটের টিকিট কিনে আবার যখন গাড়িতে উঠে বসলাম তখন আর আমার আপসোসের সীমা রইল না। আজও কাজের কাজ হোল না কিছু। দু'চারটে পত্রিকা অফিসে ঘুরে আসতে পারলেও কিছু না কিছু ফল হোত। একটা গল্পও যদি ছাপা না হয় তবে পাড়ায় মুখ দেখাব কেমন করে। দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হোল। কিন্তু তখন আর করবার কিছু ছিল না। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

রাস্তার নাম বলতে রিক্সাওলা আধঘণ্টার উপর ঘুরে ঘুরে বাড়ির সামনে গিয়ে যখন থামল তখন বেলা প্রায় দুটো। দরজায় কড়া নেড়ে ডাকাডাকি করতে দরজা খুলে দিলে একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে। দরজা খুলে তার বাবাকে সামনে দেখে হাঁ করলে কি বলবার জন্যে। কিন্তু কোনও স্বর বেরুল না। অদ্ভুতভাবে শুধু চেয়ে রইল বাপের মুখের দিকে।

মেয়ের পিছনে এসে দাঁড়ালেন মেয়ের মা। হাড়ের ওপর শুধু একখানি সাদা চামড়া ঢাকা তাঁর শরীর। শরীরখানি ঢাকা মাত্র একখানি ময়লা ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে। মোটা মোটা শির বেরুনো দু-হাতে দু-গাছি শাঁখা, কপালে ডগডগে সিঁদুর, চুল উঠে উঠে কপালটা অনেক পিছিয়ে গিয়েছে।

মেয়েকে একধারে ঠেলে দিয়ে সামনে এসে খপ্ করে তিনি হৃষিকেশবাবুর একটা হাত ধরে ফেললেন। তারপর নিজেই থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন স্বামীর পায়ের কাছে। একটি কথাও আমাকে বলতে হোল না।

হৃষিকেশবাবু সমান নির্বিকার। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন সামনের দিকে। আর থেকে থেকে সেই হাসি চলেছে।

আর একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। এসে একেবারে হাউ-মাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কয়েকটি এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে। বৃদ্ধা কপাল চাপড়াতে লাগলেন। পাড়ার মেয়েরা ভেঙ্গে পড়ল। পুরুষ মানুষ সবাই এ সময় বাইরে। দু-চারজন বয়স্ক ভদ্রলোক যাঁরা এলেন তাঁদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম।

এবার হৃষিকেশবাবুকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাবার পালা। কি আশ্চর্য! এক পাও তিনি যাবেন না আমাকে ছেড়ে। শক্ত করে ধরে রইলেন আমার হাতখানা। এদের কাউকেই তিনি চিনতে পারছেন না। চেনেন একমাত্র শুধু আমাকে। অবুঝ একগুঁয়ে ছেলের মত আঁকড়ে ধরে রইলেন আমার হাত। এত অনুনয় বিনয় করছে সকলে, সে সব তাঁর কানেও যাচ্ছে না। একটা কথারও উত্তর দিচ্ছেন না। শুধু সেই ফিক্ ফিক্ করে হাসি।

নানারকমে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছে সকলে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছেন তাঁর বৃদ্ধা পিসিমা। ছেলে মেয়েগুলোও প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। এতবড় একটা কাণ্ডকারখানার মাঝে পড়তে হবে বুঝলে কখনোই আসতাম না এখানে। এখন একবার হাতখানা ছাড়াতে পারলে হয়। এক দৌড়ে স্টেশন। ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছি।

আমার আর একখানা হাতও ধরা পড়ল। হাত ধরলেন হৃষিকেশবাবুর স্ত্রী। তাঁর সেই কোটরে বসা চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর। পাতলা ঠোঁট দু'খানি থরথর করে কাঁপছে। কি যে তিনি বললেন শুনতেই পেলাম না। হয়ত বলেননি তিনি কিছুই। তাঁর সেই চোখ দু'টির দিকে চেয়ে আমার যেন কি রকম হয়ে গেল। হৃষিকেশবাবুকে টানতে টানতে গাড়ির ভেতর ঢুকলাম।

আমার কথা অনুযায়ী শান্ত ছেলের মত তিনি জামা খুলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে চোখ বুঁজলেন। হৈ চৈ একটু কমল। আশী বছরের এক বৃদ্ধ নাম অম্বিকা কবিরাজ লাঠি হাতে উপস্থিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ চলেও গেলেন একজনকে সঙ্গে নিয়ে। বড়ি আর তেল পাঠাবেন। বড়িটা খাইয়ে দিয়ে মাথায় তেল মালিশ করতে হবে। তা' হলেই ঘুমিয়ে পড়বেন হৃষিকেশবাবু। কবিরাজ মশায়ের মতে ঘণ্টা কতক ঘুমালেই আর কোন গোলমাল থাকবে না।

বাড়ি নিস্তব্ধ। বেলা প্রায় চারটে বাজে। হৃষিকেশবাবু ঘুমোচ্ছেন, আমি ঠায় বসে আছি তাঁর পাশে। একটা হাতল-ভাঙ্গা কাপে চা আর একবাটি হালুয়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন হৃষিকেশবাবুর স্ত্রী। ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে একখানা ধোয়া কাপড় পরে এসেছেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কি অপরিসাম চেষ্টায় নিজেকে সামলে রেখেছেন তিনি তাঁর চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। পাছে কোনও কথা উঠে পড়ে এই ভয়ে বিনা-বাক্যব্যয়ে চা হালুয়া তাঁর হাত থেকে নিলাম।

অতি সামান্য একটি মর্মান্তিক হাসি হাসলেন তিনি। হেসে বললেন—"বড় বিদঘুটে এক হাঙ্গামায় পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে আপনার। নয় কি? এবার আপনাকে ছেড়ে দেবো। অনর্থক আর আপনাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ। যা' আপনি করেছেন আমাদের জন্যে!"

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "এখন বলুন তো আগে কখনও এই রকমের মাথার গোলমাল এঁর হয়েছে কি না?"

তখন একে একে তিনি শোনালেন তাঁর সংসারে অবস্থা আর আজ সকালের কাহিনী।

না—মাথায় গোলমাল হৃষিকেশবাবুর কখনো ছিল না। এই বাড়ির এগারজনের মুখে অন্ন যোগাবার যন্ত্র এই হৃষিকেশ হালদার। রোজ সকাল সাতটায় একমুঠো নিজের মুখে দিয়ে এই আড়াই মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ট্রেন ধরেন। ট্রেন ফেল করলে ওধারে চাকরি নিয়ে টানাটানি। ঘরে অতবড় মেয়ে। মেয়ের দিকে চেয়ে গলা দিয়ে আর ওঁদের ভাত জল নামে না। আজই সন্ধ্যার আগে ঐ হতভাগীকে কারা দেখতে আসবে। তাদের আদর অভ্যর্থনা জলখাওয়ানোর ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে হৃষিকেশবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান। না খেয়েই আজ তাঁকে বেরুতে হয়। কাল রাতে ঐ মেয়েই বাপের কাপড় জামা সাবান দিয়ে ধুয়ে দেয়। জামার পকেটের কাগজপত্র মাস্থলি টিকিট সমস্ত ঐ মেয়েরই পকেটে দিয়ে দেবার কথা। হতচ্ছাড়ী মেয়েটার ভুলের দরুন সর্বনাশ হয়ে গেল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন তিনি। কি বলব, মুখ বুঁজে রইলাম। হঠাৎ তিনি এগিয়ে এসে আমার ডান কাঁধের উপর তাঁর হাত রাখলেন। মুখ তুলে চাইলাম তাঁর মুখের দিকে। ফিস্ ফিস্ করে তিনি বলতে লাগলেন যেন খুবই গোপনীয় একটি কথা।

"ভাই, তোমার মত একটি ভাই ছিল আমার। কিন্তু সে যে এখন কোথায় তাও আমি জানি না। এতদিন পরে যেন মনে হচ্ছে আমি সেই ভাইকেই ফিরে পেলাম। ভাই বলছি—তুমি এতে রাগ করছ না তো ভাই?"

কি যে ছিল তাঁর গলার স্বরে আর চোখের চাহনিতে। পরমুহূর্তেই আমি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিলাম। বললাম, "আমিও সেই কথাই ভাবছি দিদি। আমারও এক দিদি ছিলেন। এখন যে তিনি কোথায় তাও আমি জানি না। আজ আমি আমার সেই দিদিকে ফিরে পেলাম।"

দিদি তখন দিদির মত করে আমাকে সন্ধ্যের পর পর্যন্ত থেকে যেতে

বললেন। মেয়ে দেখতে যারা আসবে তাদের সামনে যেন হৃষিকেশবাবু কিছু না করে বসেন। বাপ পাগল জানতে পারলে কেউ বিয়ে করতে রাজী হবে না। এ সংসারে সবই তো শেষ হতে বসেছে। ওরা পছন্দ করে মেয়েটাকে যদি নেয় তা' হলে একটা বিপদের হাত থেকে অন্তত উদ্ধার পাওয়া যায়।

রাজী হলাম ছোট ভাইয়ের মত। নৈহাটীতে যদি রাত সাড়ে নটায় পৌঁছতে পারি তাহলেও গঙ্গা পার হবার ফেরী মিলবে। না হয় শেষ নৌকাতেই পার হব। তবু আমার দিদির মুখে একটু হাসি ফুটুক। কথা পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন। বসে রইলাম ঘুমন্ত হৃষিকেশ-বাবুর পাশে। কিছু পরে হৃষিকেশবাবুর দূর সম্পর্কের এক ভাই এসে পৌঁছলেন। এ ঘরে এসে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। খাবার দাবার আনবার ব্যবস্থা করলেন। যারা মেয়ে দেখতে আসবে তাদের অভ্যর্থনার তোড়জোড় শুরু হোল। পাশের ঘরেই মেয়ে দেখান হবে। ওই ঘরের জিনিসপত্র টানাটানি করে সতরঞ্চি চাদর বিছানো হোল।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা, তাঁরা এসে গেলেন মেয়ে দেখতে। পাশের ঘরেই তাঁদের বসানো হোল। এ ঘরে বসে বসেই সব বুঝতে পারলাম আমি।

কিছু পরে মেয়েকেও সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল। নানা রকমের প্রশ্ন ওঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। গান বাজনা জানে কি না, হাতের লেখা কেমন, রান্নাবান্না কতদূর কি পারে, ভাস্কো ডি গামার বাবার নাম কি, এখন আমাদের রেলওয়ে মন্ত্রী কে, এত গরু ভারতবর্ষে জন্মায় কেন এই সমস্ত। এ ঘরে বসে ওঁদের প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি, মেয়েটি কি উত্তর দিচ্ছে তা' শুনতে পাচ্ছি না। একটা কথা ভেবে মেয়েটিকে সাবাস না দিয়ে পাচ্ছি না। কত বড় পাকা অভিনেত্রী হলে তবে আজকের অভিনয়ে ও নিজের মুখ রক্ষা করতে পারবে। বাপের এই অবস্থা আর ওর ভুলের জন্যেই বাপের এই অবস্থা। কি যে হচ্ছে ওর বুকের মধ্যে এখন! কিন্তু তবুও পরীক্ষা দিতে নেমেছে মুখে রঙ মেখে। এই পরীক্ষা দেওয়া আজকে ওর পক্ষে সম্ভব কি না কেউ

সে কথা ভেবেও দেখেনি। এখন ওর মনের অবস্থা যা' তাতে উপায় থাকলেও কিছুতেই সেজে গুজে অভিনয় করতে আজ রাজী হোত না। কিন্তু নারাজ হলে লাঞ্ছনার সীমা কোথায় গিয়ে পৌঁছত তাও বলা যায় না। আপদের সামিল কি না মেয়েটি, কাজেই ওর মতামত শোনে কে?

ও ঘরে তখন ওঁদের মধ্যে একজনকে অন্যেরা বার বার পীড়াপীড়ি করছেন পাত্রীকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্যে। বুঝলাম স্বয়ং পাত্রও এসেছেন পাত্রী পছন্দ করতে। অন্যমনস্ক হয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনছি। হঠাৎ ও ঘরে যেন বজ্রাঘাত হোল। বিকট চীৎকার শুনলাম ও ঘর থেকে। লাফিয়ে উঠে দেখি হৃষিকেশবাবু বিছানায় নেই।

ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দেখি হৃষিকেশবাবু একজনকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসে আছেন। সবাই প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর তাঁকে টেনে আনবার চেষ্টা করছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে হৃষিকেশবাবুকে এক হেঁচকায় টেনে তুললাম। যে লোকটি তাঁর নিচে পড়েছিল সেও উঠে দাঁড়াল।

পাত্রপক্ষ তখন ঠেলাঠেলি করে ঘর থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওঁরা তখন যা' তা' বলে শাসাতে লাগলেন। যে ছোকরার গলা টিপে ধরেছিলেন হৃষিকেশবাবু সেই হচ্ছে পাত্র। হৃষিকেশ-বাবুর ভাই ওঁদের হাত ধরে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। ওঁরা তাতে থামবেন কেন? ডেকে নিয়ে এসে এ হেন অপমান করা! ওঁরা দেখে নেবেন। এর শোধ তুলে তবে ছাড়বেন। কালই খবরের কাগজে তুলে দেবেন আগাগোড়া সমস্ত। তখন দেখা যাবে কেমন করে এ মেয়ের আর বিয়ে হয়।

পাত্র তখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। সে বললে, "চল এখনই থানায় যাই!" ওঁরা পিছন ফিরলেন।

এক ঝটকায় আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে গেলেন হৃষি-কেশবাবু। দৌড়ে গিয়ে সেই পাত্রের পিছনে এক লাথি। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনও রকমে ছোকরা সামলে নিলে। তারপর ওঁরা ছুটে

বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে লোক জমাতে লাগলেন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন হৃষিকেশবাবু। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম।

তখন বহুলোক জমে গেছে। যা' মুখে আসছে তাই বলছেন পাত্রপক্ষ। আমি পাত্রকে মিনতি করে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে দু'টি কথা বললাম। পাত্রের মেজাজ জল হয়ে গেল। সে তার দলের সকলকে ডেকে কি বললে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা সকলে রিক্সায় চড়ে সরে পড়লেন।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখি আমার দিদির মুখের অবস্থা সাংঘাতিক। লজ্জায় অপমানে ক্ষোভে তিনি যেন এখনই দম আটকে মারা যাবেন। তাঁর সামনে গিয়ে বললাম, "দিদি, এবার তবে আমি আসি। ওরা বিদেয় হয়েছে।"

দিদি চোখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। সকলেই আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। কোনও কেলেঙ্কারি থানা পুলিশ না করে ওরা যে চলে গেল? কি এমন কথা বলে আমি বিদায় করলাম তাদের?

আন্দাজ করে দেখলাম এতক্ষণে তারা প্রায় স্টেশনের কাছে পৌঁছেছে। এখন আর এ পাড়ার ছেলেরা ওদের নাগাল পাবে না। তখন আসল কথাটি বলে ফেললাম। এই পাত্রটিই আজ সকালে রেল কোম্পানির প্যাণ্ট কোটের মধ্যে ঢুকে এক চড় মেরেছিলেন হৃষিকেশবাবুর গালে।

সবাই চুপ। যে দু-একজন ছোকরা বাড়ির ভেতর এসে দাঁড়িয়েছিল তারা তো আমার উপর মহাখাপ্পা। কেন এতক্ষণ সে কথা আমি বলিনি— আজ ওদের কাপড় জামা পরে ফিরতে হোত না তা' হলে।

আমি বিদায় নিলাম। হৃষিকেশবাবু ঘন গলায় জিজ্ঞাসা করলেন— আবার কবে দেখা হচ্ছে। দিদি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

আমার তখন মনের অবস্থা শোচনীয়। এমন দিনই দেখে দিলেন পঞ্চতীর্থ মশাই যে সম্পাদক মশায়দের কাছে পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম না। ফিরে গিয়ে খুড়োর সঙ্গে বেশ করে বোঝাপড়া করতে হবে।

নেহাৎ নাচার

কলেজ স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে বন্ধু বললেন—"এই হচ্ছে সেই জায়গা।"

বলেই টুপ করে বাঁ-হাতি রাস্তায় ঢুকে পড়লেন।

বেলা তখন তিনটে। শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রায় আধঘণ্টা বন্ধুর পাশে পাশে হ্যারিসন রোডের বাঁ ধারের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। আমার এই বন্ধুটি বিস্তর জানেন। জানেন বই সম্বন্ধে, যাঁরা বই লেখেন তাঁদের সম্বন্ধে আর যাঁরা বই ছাপান তাঁদের সম্বন্ধেও। নাড়ী নক্ষত্রের সংবাদ রাখেন বাঙলা সাহিত্যের। কি করে যে এত সব জানলেন তা' কখনও জানতে চাইনি তাঁর কাছে। চাইলে তিনি শুধু একটু উঁচু দরের হাস্য করেছেন ঠোঁট বেঁকিয়ে। তার ফলে একেবারে মরমে মরে গেছি। যাঁরা বই লেখেন, যাঁরা বই ছাপান, যাঁরা বইয়ের মলাটে ছবি আঁকেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছু না জেনে যে বেঁচে আছে সে আবার মানুষ নাকি! তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়াটা যে কত বড় মুর্খামি সেটুকু শুধু বুঝেছি বন্ধুর ঠোঁট বাঁকানো হাসি দেখে। জানতে চাওয়ার লজ্জাটাই জানার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বন্ধু একদিন নিজেই কৃপা করলেন। বললেন, "লিখে ফেল না দু-চারটে গল্প। এই পুজোর সময় আমি ছাপিয়ে দোব কাগজে।"

হাঁ হয়ে গেলাম। গল্প লিখব আমি! মানে আমি লিখব গল্প? তার মানে হচ্ছে তারাশঙ্কর বনফুল প্রেমেন্দ্র প্রবোধ অচিন্ত্য যা' করেন আমি করব তাই! অর্থাৎ কিনা ছাপান অক্ষরে ঝক্ ঝক্ করবে নাকের ডগায় আমার নামটি শ্রীবাঁকা রায় ঘোষ, আর তার নিচে ঝাড়া আট দশ পাতা ঠাসা একটি হৃদয়বিদারক কাণ্ডকারখানা। বাপস্—

"কি রে একেবারে দম আটকে গেল যে তোর! কেন? গল্প লেখাটা কি এমন শক্ত ব্যাপার? একটু ভেবে চিন্তে, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, একটু আবেগ

আর দরদ লাগিয়ে আর তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে একটু ঐ 'কি হবে কি হবে' গোছের প্যাঁচ, ব্যাস—এ আর এমন কি শক্ত কাজ? বসে বসে পাড়াসুদ্ধ বিয়ের কবিতা লিখতে পার আর দু-একটা গল্প লিখতে পার না? চেষ্টা কর, ও হয়ে যাবে! দুটো পয়সার মুখও দেখতে পাবি।"

বলে বন্ধু গুটিকতক টিপস্ বলে দিয়ে গেলেন।

"ব্যাপারটা কি রকম জানিস—মনে কর তোর মাথাটা একটি খালি খোল। একেবারে ফোঁপরা মানে কিচ্ছু নেই ঐ মাথার ভেতর। এইবার ঐ খালি মাথায় পুরে ফেল তিনজোড়া মেয়ে পুরুষ। ধর প্রথম জোড়ার মেয়েটি হবে কালো কুচ্ছিত কিন্তু তার বাবা হবে বড়লোক আর ছেলেটি হবে সুপুরুষ, কিন্তু গরীব একেবারে হাড়হাবাতে গোছের। দ্বিতীয় জোড়ার মেয়েটি হবে হয় অফিসের কেরানী নয় তো স্কুলের দিদিমণি কিংবা হাসপাতালের নার্স বা রিলিফ ডিপার্টমেণ্টের মেয়ে সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট আর পুরুষটিকে করে দে যক্ষ্মাগ্রস্ত কবি বা কম্যুনিস্ট। তারপর তৃতীয় জোড়ার মেয়েটিকে বানাতে হবে চা-বাগানের পাতা তোলা মেয়ে বা কয়লা-খাদের কয়লা-তোলা মেয়ে বা পানউলি বা একেবারে তাদের একজন যারা মুখে রঙ মেখে রাস্তায় দাঁড়ায় আর পুরুষটিকে চোর জোচ্চোর পকেটমার কিংবা রিক্সাওয়ালা বিড়িওয়ালা যা' খুশি করতে পার।' এইবার ঐ তিনটি মেয়ে আর পুরুষ তো তোর মাথার মধ্যেই রইল। মাথাটা মাঝে মাঝে বার কতক ঝাঁকাবি, ওরা সব মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাবে, তখন হুড় হুড় করে গল্প বেরিয়ে আসবে।"

শুনে আরও বড় হাঁ হয়ে গেল আমার। বন্ধু বলতে লাগলেন, "তোকে করতে হবে কি জানিস—তোর মাথার ঐ মেয়ে পুরুষ ছ'টিকে ঘোরাতে হবে। কখনও নিয়ে যাবি সমুদ্রের ধারে, কখনও পাহাড়ের মাথায়, কখনও বনে জঙ্গলে, কখনও সহরের বস্তিতে। কখনও দেখাবি এ ওকে চাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না, কখনও দেখাবি ও একে পাচ্ছে কিন্তু চাচ্ছে না। কিংবা দেখাবি এ ওকে চাচ্ছেও না, পাচ্ছেও না,—তার বদলে যাকে যার চাওয়ার কথা নয় তাকে

পাচ্ছে আর যাকে যার পাওয়ার কথা নয় তাকে চাচ্ছে. এরই নাম হচ্ছে গল্পের প্লট. যাকে বলে রোমান্স। কি রে এইবার একটু একটু বুঝছিস তো ?"

বুঝব কি, বন্ধুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মাথাটা যেন সত্যিই ফোঁপরা হয়ে গেছে মনে হোল। সেদিনের মত তিনি বিদায় হলেন। চলে যাবার আগে রান্না-ঘরে বসে পরোটা হালুয়া খেয়ে গেলেন। তা' খান, এলেই খান এ বাড়িতে। তাতে কারও কিছু বলবার নেই। কিন্তু ঐ পরোটা হালুয়া খেতে খেতে বাধিয়ে গেলেন এক ফ্যাসাদ। মা বৌদি আর আমার দুর্বিনীতা বোনটিকে জানিয়ে গেলেন যে, আমি গল্প লেখা শুরু করেছি। সেই গল্পগুলি তিনি—বন্ধু স্বয়ং কলকাতার সব নামজাদা মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপিয়ে দিচ্ছেন। আর তাতে পুজোর সময় বেশ কিছু টাকা পাচ্ছি আমি।

কেন যে তাঁর এই কুমতি হতে গেল তা' জানি না। কিন্তু তার ফল ফলল অচিরাৎ। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে শুনতে পেলাম, "কৈ দেখি দাদা কতটা লিখলে! ওমা এ যে ইংরেজি! ইংরেজিতে গল্প লিখছ না কি ?"

আধ ঘণ্টা পরে না চাইতে এক কাপ চা নিয়ে বৌদি দেখা দিলেন। চায়ের বাটিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে আঁচলে কপালের ঘাম মুছে মেজের ওপর বসে পড়লেন,."কৈ, এবার শোনাও তোমার গল্প ঠাকুরপো। বাব্বাঃ, একটু যে ফুরসৎ করে আসব তার কি উপায় আছে না কি ?" বলে সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

খেতে বসেছি মা এসে সামনে বসে বললেন, "ঐ যাঃ তোর জন্যে আজ একটু দই রেখেছিলুম রে দিতে ভুলে গেছি। তা' পুজোয় কখানা কাগজে গল্প বেরুচ্ছে এবার তোর ? এবার তোর গল্প লেখার টাকা থেকেই ত্রিশ টাকা গুরু-দেবের আশ্রমে পাঠাব কি বল ?"

বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে চা খেতে বসে দাদা মারলেন টেবিলের ওপর এক চাপড়।

"আরে হবে হবে হবে। আমারই তো ভাই। ও কিছু করছে না বলে তোমাদের তো মাথা খারাপ হয়ে গেল। ও কি একটা কেরানী না স্কুল মাস্টার হতে যাবে? এইবার দেখে নিও—এক বছরের ভেতর দশটা সংস্করণ বেরুবে ওর বইয়ের। বাবা, আমরা হচ্ছি খাস ঘোলসাপুরের ঘোষ বংশ। আমরা মারি তো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার।"

সন্ধ্যার পর গেছি ক্লাবে—সেখানেও ঐ চলছে। ক্লাবের দাদু মানে হর্ষ দাদু গর্জন করে উঠলেন—"খবরদার প্রেম ক্রেম যদি চালাবি বাঁকু তোর গল্পে—"

ব্যাস আর কিছু বলতে হোল না তাঁকে। মারমুখো হয়ে তেড়ে উঠল সবাই। প্রেম না থাকলে আবার গল্প কিসের? আমার ভবিষ্যৎ গল্পের প্লট, তার নায়ক নায়িকা, তাদের বয়স এই সব নিয়ে হুলুস্থুল লেগে গেল।

রঘুদার শ্বশুরবাড়ি টালিগঞ্জে, পাঁচ পাঁচটা সিনেমার ষ্টুডিওর দরজার সামনে দিয়ে যেতে হয়। বলতে গেলে সিনেমা-জগতের সব কিছু জানা রঘুদার। আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, "কুচ্ পরোয়া নেই, চালিয়ে যা লেখা। ওধারে একটা ব্যবস্থা করছি আমি। শুধু মনে রাখবি এমন এক জোড়া নায়ক নায়িকা থাকা চাই তোর যাতে শ্রেষ্ঠনাথ আর চিত্রা-দেবীকে বেমালুম ফিট করে! তাহলেই—" বলে ডান হাতের চারটি আঙুল আমার নাকের সামনে তুলে ধরে বললেন, "নগদ চার হাজার।"

রাত্রে ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম মলাট। জলজ্বলে আর ফ্যাকাশে মলাট। ধর্মতলা, হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনের খবরের কাগজের দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে রঙ বেরঙের পত্রিকাগুলি। বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, কথা-সাহিত্য, তরুণের স্বপ্ন, সচিত্র ভারত, আমার জীবন, তোমার জীবন, পাড়াপ্রতিবেশীর জীবন আর মরণ। তারপর সিনেমা তারকার হাসি হাসি মুখওয়ালা সিনেমা কাগজগুলির মলাট। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

স্বপ্ন দেখলাম, যে কাগজ খুলছি তাতেই জলজল করছে আমার নাম শ্রীবাঁকা রায় ঘোষ।

খুব ভোরে ডাকাডাকিতে দরজা খুলতে হোল। এত ভোরে চা হাতে বৌদি।

"আঃ কি ঘুম তোমার ঠাকুরপো, ডাকতে ডাকতে আমার গলা ভেঙে গেল!"

"তা' এত ভোরে চা!"

"সারা রাত জেগে গল্প লিখেছ। তাই ভাবলাম সকালেই একটু চা দিই তোমায়। আমারও তো ভাই সারা দিনে মরবার ফুসরৎ নেই। এই ফাঁকে শোনাও তোমার গল্প একটি। এখুনিই আবার খোকা উঠে চেঁচাতে থাকবে।"

রোজ বাজার যেতে হোত তাও বন্ধ হোল। মক্কেল ফেলে রেখে দাদা ছুটলেন বাজারে। লেখক ভাইকে বাজারে পাঠালে তার মনের ভারসাম্য নষ্ট হবে যে।

কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। কি করে এদের বোঝাই যে গল্প আমি লিখি না। ও আমার কিছুতে আসে না, আসবেও না। বনফুল বনে থাকুন, কৈলাসে যান তারাশঙ্কর, প্রেমেন প্রবোধ অচিন্ত্য যাযাবরের সঙ্গে মিশে যেখানে খুশি ভেসে পড়ুন, আমার তাতে কোনও দুঃখ নেই। এখন গল্প লেখার হাত থেকে বাঁচি কি করে! নাঃ এবার একটি পঞ্চান্ন টাকা মাইনের মফঃস্বল মাস্টারি জুটিয়ে পালাতে হবে দেখছি বাড়ি থেকে!

দুপুর বেলা যথা নিয়মে দরজা বন্ধ করে নিদ্রা দিচ্ছি। বেকার জীবনে ঐ একটি মাত্র জিনিসই নিজেকে নিজে যখন তখন দান করতে পারি দরাজ হৃদয়ে। দুম দাম করে দরজায় ঘা পড়তে উঠে দরজা খুললাম। "নাম না জানা" একখানি মাসিক পত্রিকা হাতে আমার দজ্জাল বোনটি।

"এতবড় ছোট নজর কেন তোমার দাদা? গল্প লেখা হয়েছে, কাগজে ছাপিয়েছ, ঘুণাক্ষরে আমরা কিচ্ছু শুনতে পাইনি এতদিন। কেন আমরা তোমার আজ শত্রু, না?" বলে তার ছোট ছোট চক্ষু দু'টি আরও ছোট করে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

আকাশ থেকে পড়লাম, "আমার লেখা কাগজে উঠেছে! কৈ দেখি—" বোনের পেছন থেকে কে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। শুধু তাই নয়, চাপা গলায় বলা হোল, "যেমন ধড়িবাজ তেমনি মিথ্যুক।"

গলার শব্দে বুঝলাম লোকটি কে। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার সম্বন্ধে কোন কথা ভুলেও উনি উচ্চারণ করেন বলে তো জানতাম না। একদিন সকলের নজর এড়িয়ে দু' প্যাকেট চানাচুর গুঁজে দিতে গিয়েছিলাম ওঁর হাতে। ফলে কেঁদেই ফেলেছিলেন একেবারে। তিনিই কি না আজ প্রকাশ্য ভাবে মতামত প্রকাশ করছেন খিল্ খিল্ করে হেসে।

আমার বোনটি ফোঁস করে উঠল—"ঠিক বলেছিস ভাই, চিরকাল পেটে পেটে প্যাঁচ। আমি ওঁর একমাত্র বোন আমি হলাম শত্রু। কাল জানতে পেরে পর্যন্ত খোশামোদ করছি, দাও না দাদা একটি গল্প পড়তে। হাড় মিথ্যুক, নেকা সাজছেন—কৈ লিখিনি তো এখনও কিছু। এই কাগজখানা তুই যদি না আনতিস তো আমরা টের পেতাম না ওঁর কীর্তি। বলি আর কখানা কাগজে ক'টি গল্প এ পর্যন্ত বেরিয়েছে মশাই?" কাগজখানা আমার নাকের ডগায় সজোরে নাড়তে লাগল।

ওঁরা চলে গেলে বেরিয়ে পড়লাম পাড়ায়। খোঁজ করতে করতে মিত্তিরদের বাড়িতে পেলাম সেই পত্রিকাখানি। পাতা উল্টে দেখি সত্যিই স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে আমার নাম শ্রীবাঁকা রায়। তার নিচে গল্প—"প্রেমের সমাধিতলে।" হু-হু করে পড়ে ফেললাম। দু'বার বিষ খাওয়া আর তিনবার গলায় দড়ি দেওয়া পর্যন্ত রয়েছে সেই গল্পে। সর্বনাশ, এই সব লিখতে হলে ভয়েই আমি আঁতকে মরে যাব।

কোথাও নিস্তার নেই। বাড়িতে টেকবার উপায় নেই। ক্লাবে চায়ের দোকানে পাড়ায় মুখ দেখান অসাধ্য। সেই 'প্রেমের সমাধিতলে' সর্বত্র আমার সমাধি রচনা করেছে। চেনা জানা সবাই শত্রু হয়ে দাঁড়াল। "এত বড় দেমাক কেন আমরা জানতে পারলে কি ওর গল্প সব গিলে খেয়ে ফেলব না কি?"

পাড়ার ফাংশানগুলোতে মাত্র আট আনা করে চাঁদা দিয়ে রেহাই পেতাম। তা' ডবল হোয়ে গেল। "আবার আট আনা দিতে আসছ! মুখে আনছ কি করে বাঁকাদা? ছেলে পড়াতে বলে আট আনা দিতে। এখন গল্প লিখে মুঠো মুঠো টাকা মারছ, এখনও তোমার ছোট নজর গেল না।"

নেপাল হচ্ছে আমার স্কুলের ক্লাস ফ্রেণ্ড। আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত বিড়ি সিগ্রেট লজেন্স বিস্কুট তেল সবানের দোকানটির মালিক সে। স্কুল ছেড়ে নেপাল দোকান করে বসল ওদের বাইরের ঘরে। ন্যাপা আমার সত্যিকারের বন্ধু, তার কাছ থেকে প্রায়ই দু-একটা সিগ্রেট চেয়ে নিয়ে টানতাম। ও সহানুভূতির সুরে উপদেশ দিত, "একটা কিছু জোটাতে পারলি রে বাঁকা? আর কতদিন এ ভাবে চলবে? খামকা একগাদা পাশ করে মরতে গেলি। তার চেয়ে স্কুল ছেড়েই যদি একখানা কয়লার দোকান দিতিস—" এ হেন সমব্যথী বন্ধুর কাছ থেকে দু-একটা সিগ্রেট খাওয়া অন্যায় নয়, আর তার বদলে দাম দিতে যাওয়াও অপমান করার সামিল।

একদিন ন্যাপা আস্ত একখানি ফুলস্কেপ কাগজে কি লিখে আমার হাতে দিয়ে বেশ কাঁচুমাচু হয়ে বললে—"একটু সময় করে একবার এটা দেখো ভাই।" এইবার সেরেছে! নিশ্চয়ই ন্যাপাও গল্প লিখেছে। ওটি ছাপিয়ে দেবার জন্যে আমায় অনুরোধ করবে নিশ্চয়ই। কাগজখানি নিলাম। দুটো সিগ্রেটও চেয়ে নিলাম। বিষম দুর্ভাবনা মাথায়, কি করে এখন বিশ্বাস করাই বন্ধুকে যে এখনও পর্যন্ত একটি গল্পও লিখিনি আমি। আর তার লেখাটি অন্ততঃ আমার দ্বারা কোথাও ছাপান সম্ভব নয়। কাগজ-খানি পকেটে করে ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলাম।

বাড়ি এসে কাগজখানি খুলে দেখি—আরে একি! এ যে ফর্দ! গত সাড়ে তিন বছর ধরে কবে ক'টি সিগ্রেট খেয়েছি তার নিখুঁত হিসেব। মোট সতেরো টাকা এগার আনা তিন পয়সা।

সঙ্গে একখান চিঠিও রয়েছে। ন্যাপা লিখেছে—

"ভাই বাঁকু—

তোমাকে 'ভাই' লিখছি বলে মনে কিছু কোর না। তুমি এখন একজন নামজাদা সাহিত্যিক। আমার মত মূর্খ লোক তোমার বন্ধু হতেই পারে না। কিন্তু ভাই তুমি আমার চিরকালের বন্ধু, আমি জানতাম যে একদিন তুমি একজন বিখ্যাত লোক হবেই। শ্রীশ্রীকালীমাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রাসাদাৎ আজ তোমার নাম লোকের মুখে মুখে। গত সাড়ে তিন বছর তোমার নিকট কোনও কথা উত্থাপন করি নাই। এখন তোমার সুদিন, দয়া করে এই দীন বন্ধুর হিসাবটা—"

প্রায় ক্ষেপে যাবার মত অবস্থা হয়ে উঠল আমার—। ইতিমধ্যে আরও দু'খানি পত্রিকায় শ্রীবাঁকা রায় ঘোষের লেখা দু টি গল্প বেরুল। কাগজে ঘোষ কথাটি বাদ দিয়ে শুধু বাঁকা রায় থাকে। কিন্তু তাতে কি? ও এক কথাই। সাহিত্যিক হয়েছি বলে আমিই নাকি পদবীটি বাদ দিয়েছি। মানে আমার ভেতরে একটি আর্টিষ্টিক চেষ্টা জন্মেছে কি না!

বন্ধু আসেন মাঝে মাঝে, চা হলুয়া খান রান্নাঘরে বসে আর শোনান। শোনান শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের প্রকাশকরা আর বিখ্যাত ওঁনারা কে কি বলেছেন। তার উপর বনফুল তারাশঙ্কর সজনীকান্ত আর ওধারে আশাপূর্ণা বাণী রায় তারপর এলবার্ট হলের গৌরীশঙ্কর আর রূপদর্শী, এঁরা কে কি বলেছেন বাঁকা রায়ের গল্প পড়ে। নিখুঁত অভিনয় করে রসিয়ে রসিয়ে বলেন বন্ধু চা হালুয়া খেতে খেতে। ফলে আমার মধুভাষিণী বোনটি হাঁ হয়ে যায়। তবে সেই হাঁ হওয়া কার জন্মে তা' ঠিক বলতে পারি না। দাদার লেখার গর্বে, না যে লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে অত বড় বড় সাহিত্যিক আর

প্রকাশকেরা মনের কথা খুলে বলেন সেই লোকটির গর্বে গর্বিতা হয়ে বোনটি আমায় ভুরু কুঁচকে হাঁ করে কথা গিলতে থাকে! আমি সভয়ে অন্ত চিন্তা করি। বিয়ে হবার পর ওরা দু'জনে একসঙ্গে যখন বাক্যালাপ জুড়ে দেবে তখন পাড়ায় যে কাক চিল বসতে পাবে না।

শেষে সাহস করে একদিন বন্ধুকে ধরে বসলাম। ওদের একবার চোখের দেখা দেখতে হবে। যাঁরা মনের আকাশে সদা সর্বক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলছেন তাঁদের চোখের দেখা দেখব। সাক্ষাৎ তারাশঙ্কর, বনফুল, সজনীকান্ত, প্রেমেন, প্রবোধ, অচিন্ত্য, গজেন, সুমথ, প্রমথ সকলকে চোখে দেখা এও কি চাট্টিখানি কথা না কি।

একটি উচ্চশ্রেণীর হাসি হেসে বন্ধু রাজী হলেন, "আচ্ছা তাই হবে। যাব তোকে নিয়ে একেবারে খাস আড্ডায়। দেখবি খালি বই বই আর বই। স্ব-নির্বাচিত, পর-নির্বাচিত, অনির্বাচিত, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট সব গল্পের বই। দেওয়াল জুড়ে আলমারি ভরতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু বই। তাঁদের দেখবি যাঁরা ও সব লিখেছেন। লিখে বাড়ি গাড়ি পর্যন্ত করে ফেলেছেন। কাল বেলা আড়াইটের সময় শেয়ালদা স্টেশনের মেন গেটে দাঁড়িয়ে থাকিস। আমি এসে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

আড়াইটের সময় বন্ধু দেখা দিলেন। বললেন, "চল হেঁটেই একটু মেরে দিই। আধ ঘণ্টা হ্যারিসন রোডের বাঁ ধারের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে বন্ধু বাঁ হাতি রাস্তায় টুপ্ করে ঢুকে পড়লেন। মুখ তুলে দেখি দেওয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট।

বই বই আর বই। কি সব মলাট, দেখে মাথা ঘুরে যায়। লিণ্ডসে স্ট্রিটে ঢুকে খেলনার দোকানের সামনে ছোট ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিলে যা' হয় তাই। মলাট তো নয় চোখ ধাঁধানো রঙের খেলা। ছবি আর রঙ দেখলে মনে হয় কোন্খানি আগে কিনি! ইচ্ছে করে সব ক'খানি কিনে নিয়ে যাই এক

সঙ্গে। বাড়িতে নিয়ে ঠিক ওদের মত মলাটখানি সামনে করে ঘরের দেওয়াল জুড়ে সাজিয়ে রাখি। কিন্তু মলাট সামনে করে সাজিয়ে রাখলে লোকে কি ভাববে!

দু' পাশে নজর রেখে এগোচ্ছি। আচমকা বন্ধু আমার কাঁধে হাত দিয়ে টানলেন আর সেই সঙ্গে নিজের জিভ তালুর সঙ্গে ঠেকিয়ে একটি বিচিত্র শব্দ করলেন, "ইস্—।" যেন সামনে গোখরো সাপ পড়েছে। আঙুল তুলে দূর থেকে দেখালেন বন্ধু, "ঐ দেখ, উনি তারাশঙ্কর আর ওঁর সামনে ঐ যে মোটা মত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উনি হচ্ছেন কবিশেখর কালিদাস রায়।"

কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে দেখলাম, তারপর সজোরে প্রতিবাদ করলাম, ধ্যাৎ,—তা' কখনো হতে পারে না।"

বন্ধু আকাশ থেকে পড়লেন, "তার মানে!"

"মানে তুই ভুল করছিস কিংবা আমাদের ইয়ে পেয়ে ঠকাচ্ছিস্। ঐ বৃদ্ধ মোটা ভদ্রলোকটি হচ্ছেন তারাশঙ্কর আর ঐ ছিমছাম পাঞ্জাবি পরা গলায় চওড়া-পাড় চাদর ঝোলান চমৎকার লম্বা লোকটি হচ্ছেন কবিশেখর।"

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বন্ধু, "বাজি রাখবি?"

ঠিক সেই সময় একখানি মোটর এসে থামল একটি দোকানের সামনে। সেই গাড়ি থেকে এক মহিলা নেমে গেলেন। বন্ধু বললেন, "উনি হচ্ছেন শ্রীমতী—" এমন একটি নাম উচ্চারণ করলেন যে আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঐ নাম যাঁর তাঁর লেখা কবিতা যে আমার কণ্ঠস্থ, তাঁর গল্পগুলি যে আমি গোগ্রাসে গিলি। গিলে চোখ বুঁজে বুঁদ হয়ে থাকি। সেই তিনি হচ্ছেন ঐ উনি! দেখলে মনে হয় যেন বাতে ধরেছে। ঐ বপুখানির ভেতর থেকে কখনো সেই কবিতা বেরুতে পারে!

"হাসনা-হানা হাসনা-হানা—
কইতে মানা
চাইতে মানা

বাতায়নের কপাট খোলা
তাইতো আমার পরান মাঝে দিচ্ছে দোলা
নিবিড় বুকের তপ্ত নরম ছলছলানি
বাঁকা ভুরুর উদাস ভাষার কলকলানি।"

রেগে গিয়ে হন্ হন্ করে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। ওধার থেকে একখানি কালো রঙের ছোট মোটর গাড়ি এসে থামল ঠিক আমার সামনেই। বন্ধু কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "ঐ দেখ সজনীকান্ত নামছেন।"

শান্ত সমাহিত ঈষৎ ভারিক্কী গোছের শরীর গোল মুখ প্রায় বৃদ্ধ শুভ্র খদ্দর-মণ্ডিত একজন আদর্শ বাঙালী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলে কিনা ইনিই সজনী-কান্ত। মুখ দেখেই বলা যায় এমন নিরীহ ভদ্রলোক দুনিয়ায় আর দু'টি নেই।

ইচ্ছে হচ্ছিল বন্ধুর গণ্ডে ঠাস করে একটি চড় কষাতে। আমাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে! সজনীকান্ত নামটি মনে করলে মনে কি রকম ছবি ভেসে ওঠে? স্পষ্ট ভেসে ওঠে বাঁকা ইসপাহানী তলোয়ারের মত একখানি দীর্ঘ দেহ যার চোখ ঝলসানো জেল্লায় প্রাণ কেঁপে উঠবে। যে শরীরখানির তাপে বিশ হাতের ভেতর যা' কিছু পড়ে তা' তৎক্ষণাৎ দপ্ করে জ্বলে না উঠলেও কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাবে। যাঁর মুখের দিকে চাওয়া অসাধ্য, চোখের ওপর চোখ পড়লেই মাথা নত হয়ে যাবে। সেই সজনীকান্ত উনি! মানে ঐ আদর্শ ভদ্রলোকটি কথা কইতে গেলে হয়ত থতমত খাবেন এখনই। ভাতখেকো বাঙালীর একটি আদর্শ সংস্করণ। আর চেয়েও দেখলাম না ভদ্রলোকের দিকে, মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

এরপর যতই এগোতে লাগলাম শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের মধ্যে ততই ভেঙ্গে চুরমার হতে লাগল আমার মন-আকাশের তথা বাঙলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি। বন্ধুর ভাষায় এই শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট হচ্ছে সাহিত্যিকদের স্বর্গ। হায়, কেন মরতে আমি সেই স্বর্গে খামকা ঢুকে পড়লাম! আমার প্রবোধ সান্যাল—যে প্রবোধ সদা সর্বদা পরে থাকবেন গেরুয়া পাগড়ি আর দামী গরম

কাপড়ের লংকোট, যে প্রবোধ বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন না গা থেকে সেই দামী কোট খুলে ফেলে দিতে—আমার অন্তরের অন্তরতম গুহ্যস্থানে যে প্রবোধ চিরনবীন চিরকাঁচা, যাঁকে আমি মানসচক্ষে দেখেছি একখানি দুধে গরদ পরা, গায়ে জরির কাজ করা মুলতানি সিল্কের মেরজাই আর রামধনু রঙের বেনারসী চাদর কাঁধে, পায়ে সোনালী জরির ফুল আঁকা শুঁড়তোলা ইরানী নাগরা, সেই প্রবোধ সামনে দিয়ে চলে গেলেন মথায় মস্ত এক টাক নিয়ে! একটি বাদামী রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেজে! হায়, দগ্ধ অদৃষ্ট আমার—

সবচেয়ে রূঢ় আঘাতটি পাওয়া তখনও বাকি ছিল আমার কপালে। একটা বইয়ের দোকানের ভেতর দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষের মত খোসাসুদ্ধ আপেলে কামড় দিচ্ছেন একজন রোগা খাটো ভদ্রলোক। বন্ধু বললেন, "উনিই সুবে বাঙলার এক এবং অদ্বিতীয় প্রমথনাথ। যিনি মহামতি রাম ফাঁসুড়ের জীবনের ও সাধনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে নিজে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে গেছেন।" এই সেই প্রমথনাথ! সারা বোশেখ মাস যাঁর কণ্ঠস্বর বাঙলা বিহার উড়িষ্যার আকাশে বাতাসে গ্যম গ্যম করে বাজতে থাকে, বোশেখের খরতাপ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে যাঁর বক্তৃতার তেজে! এই সেই প্রমথনাথ যিনি তাঁর গুরুদেবের "হে রুদ্র বৈশাখ" মাসকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ঢক্কা পিঠে বেঁধে অক্লান্ত অবিশ্রান্ত ছুটে বেড়ান দেশ হতে দেশান্তরে তাঁর গুরুর জন্মতিথির ঢাক বাজিয়ে!

এতদিন কি ভয়াবহ রূপই আমার বুকের মধ্যে আঁকা ছিল তাঁর! কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে তিব্বতী চামরের মত সাদা দাড়ি, হাত পায়ের নখগুলি দেড় ইঞ্চি করে লম্বা। খিদিরপুরের পুলের নিচের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মত মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে রয়েছে। রক্তবর্ণ বিঘূর্ণিত লোচন, ঝাড়া সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা মহামানব। যাঁর গলার আওয়াজ আকাশের উড়ন্ত কাক চিল নামিয়ে আনবে। যিনি দিবারাত্র গায়ে জড়িয়ে থাকেন বাঘছালের ছাপ দেওয়া কাশ্মিরী শাল বা জোব্বা।

যাঁর তীক্ষ্ণ খড়্গের মত নাকটির দিকে চাইলে মনে হবে ঐ নাক নেড়ে তিনি সব সময় সকলকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারেন। হায়, সেই প্রমথ-নাথকে আমার চোখের সামনে দেখছি। দেখছি শিশুর মত সদানন্দ একটি ছোটখাট মানুষ—যাঁকে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "থাক ভাই, আজ আর নয়। এবারে পালাই চল এখান থেকে।"

"এই যে পাকড়াশী যে!"

বিরাট এক নরপুঙ্গব। হেলতে দুলতে এগিয়ে এসে বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলেন। বন্ধু নিজের বত্রিশটি দাঁত বিকশিত করে পরিচয় দিলেন, "ইনি হচ্ছেন গজেন্দ্র মিত্র।" একেবারে চোখ জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণ পরে নামে রূপে চলনে চমৎকার মিল খুঁজে পেলাম। পেয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু আমি আর দন্ত বিকশিত করবার সুযোগ পেলাম না। মিত্র মশায় বেড়ালে যেমন ইঁদুর ধরে নিয়ে যায় তেমনি ভাবে বন্ধুকে নিয়ে এক দোকানে ঢুকে পড়লেন। বন্ধুর শেষ কথা ক'টি কানে বাজল, "আজকের মত তুই বাড়ি যা বাঁকা।"

ফিরলাম।

হ্যারিসন রোডে পা দোব, পেছন থেকে কানে এল, "ও মশাই শুনছেন—ও দাদু—"

ফিরে তাকালাম। কাকে ডাকে! হন্ হন্ করে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। পায়ে বুট জুতো আর খাকী রঙের মিলিটারি মোজা, কাপড় হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে পরা, খাকী সার্ট তার ওপর ডোরাকাটা ছিটের কোট গায়ে। আবার একখানা সবুজ রঙের খদ্দরের শাল জড়ানো রয়েছে কোমরে। ভদ্রলোক বোধ হয় তিন সপ্তাহ দাড়ি কামাননি। চুল ছেঁটেছেন বোধ হয় গত বছর এই সময়। লাল টকটকে চারখানি দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। বগলে রয়েছে কাঁথা জড়ানো বেশ বড় গোছের একটি পুঁটলি। পুঁটলির ভারে তিনি বাঁ দিকে একটু হেলে পড়েছেন।

"দাদু, আপনি কি এই শ্যামাসুন্দর রোডেই থাকেন ?"

বললাম, "তা' না থাকলেও বলুন না আপনি কাকে খুঁজছেন।"

এক গাল হেসে ভদ্রলোক বাঁ হাতের মুঠো আমার সামনে মেলে ধরলেন। ঘামে ভেজা একখানি চিরকুট। বললেন, "দেখুন তো পড়ে কি লেখা আছে।"

পড়ে দেখলাম। "এ যে দেখছি ঠিকানা একশ তিয়াত্তর নম্বর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, চটকদার এণ্ড কোম্পানী পুস্তক প্রকাশক।"

ভদ্রলোক তারিফ করলেন আমার বিদ্যের। বললেন, "যাক তা' হলে ঠিকই পড়তে পেরেছেন। এখন বলুন তো ঐ চটকদার এণ্ড কোম্পানীর বইয়ের দোকানখানি কোথায় ?"

"এই তো নম্বর রয়েছে, নম্বর দেখে খুঁজে নিন না—"

"আজ্ঞে, সকাল সাড়ে নটা থেকে এই বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কতবার এগোলাম আর পিছিয়ে এলাম তা' গুণে রাখিনি। ও নম্বরের কোনও কিছু নেই এই রাস্তায়। একশ নম্বরে না পৌঁছতেই এ রাস্তা খতম।"

"তা' হলে এ ঠিকানা আপনি পেলেন কোথা থেকে ?"

"আর বলবেন না দাদা, এক হাড় বজ্জাত ডাকাত শালা আমায় হাড়ে হাড়ে ঠকিয়েছে। আমার সর্বনাশ করেছে, আমায় পথে বসিয়েছে একেবারে।"

তিনি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

খপ্ করে তাঁর হাতখানা ধরে টেনে নিয়ে ঢুকলাম চায়ের এক কেবিনে। রাস্তায় ভিড় জমিয়ে ফেলবে যে !

ভদ্রলোকের প্রাণ আছে। চা চিংড়ির কাটলেট খাওয়ালেন এবং নিজেও খেলেন পেট ভরে। সেই সঙ্গে শোনালেন তাঁর শোচনীয় দুঃখের কাহিনী। তাঁর নাম নরহরি হাই। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। তেজারতি কারবার করেন। ছোট বেলা থেকে গল্প লেখার শখ। লিখেছেনও প্রচুর গল্প উপন্যাস। সব সুদ্ধ দশখানি খেরো বাঁধানো প্রমাণ সাইজের খাতা বোঝাই লেখা আছে গল্প

আর উপন্যাস। এ পর্যন্ত গোলমাল হয়নি। ঘরে বসে যত খুশি গল্প উপন্যাস লিখলে গোলমাল বাধবার কথাও নয়। ফ্যাসাদ বেধেছে শেষ বার দারপরিগ্রহ করে। আগের স্ত্রী দু'টি একে একে গত হওয়ায় সম্প্রতি তৃতীয় বার বিবাহ করে যাঁকে ঘরে এনেছেন তিনি বিদুষী মহিলা, একেবারে গল্প উপন্যাসের পোকা। তাঁর একটি তুখড় ভাই আছে। কলিকাতার যাবতীয় প্রকাশকরা আর পত্রিকাওয়ালারা নাকি তার হাতের মুঠোয়। তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী চান যে সেই গল্প উপন্যাস ছাপা হোক অর্থাৎ উপযুক্ত স্বামীর নাম বেরুক একটু। কি করেন ভদ্রলোক, গৃহিণীর পেড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে একখানি খাতা দিলেন শালার হাতে। শালা ডুব মারলে। শেষে যখন তিনি ভয় দেখালেন যে খাতা ফেরৎ না দিলে শালার ভগ্নীকে ত্যাগ করবেন, তখন এই একশ তিয়াত্তর নম্বর চটকদার কোম্পানীর ঠিকানা দিলে। সে খাতাখানি নাকি সে ঐ চটকদার প্রকাশকদের দিয়েছে।

তারপর তিনি সযত্নে কাঁথা খুলে বার করলেন নখানি খেরো বাঁধানো খাতা। প্রতিখানির ওজন অন্তত আড়াই সের। বিনীত ভাবে বললেন, "একটু পাতা উলটে দেখুন।"

পাতা ওলটাতেই প্রথম যা' নজরে পড়ল তা' হচ্ছে সেই 'প্রেমের সমাধি তলে।' চমকে উঠে বললাম, "এ গল্পটি তো মশাই ছাপা হয়ে গেছে নখদর্পণ পত্রিকায়।"

"জানি সব জানি দাদা, আরও সাতটি গল্প ছাপিয়েছে শালা নিজের নামে। এক কুড়ি ছোট গল্প নিজ হাতে টুকে দিয়েছি ঐ খাতা থেকে। যাক গে চুলোয় এক কুড়ি ছোট গল্প, এখনও আমার খাতায় বাহান্ন কুড়ি রয়ে গেছে। কিন্তু দু-খানি আস্ত উপন্যাস আছে যে মশাই খাতাখানিতে। আমার কাছে কোন কপিও নেই। শালা বললে, শতকরা সাড়ে সতেরো টাকায় কথাবার্তা পাকা হয়েছে চটকদারদের সঙ্গে। চিঠিও দেখালে। তাই দিলাম বিশ্বাস করে।

এই পর্যন্ত বলে আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন যাবেন কোথায় ?"

কোটের হাতায় চোখ মুছে বললেন—"হুগলী।"

"হুগলী! হুগলীতে কার বাড়ি যাবেন ?"

"আমার ভাগ্নী জামাই থাকে সেখানে। তার মেয়ের—মানে, আমার নাতনীর জন্যে একটি পাত্রের সন্ধান নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি নাম আপনার ভাগ্নী-জামায়ের ?"

"গোবর্ধন বোস। আর মশাই বলবেন না সে দুঃখের কথা। আমার ভাগ্নীর ঐ একমাত্র মেয়ে। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, গান বাজনাও জানে। আর সে কি মেয়ে। আমার নাতিনী বলে বলছি না—অমন মেয়ে সহজে খুঁজে পাবেন না। এতদিন এক হতচ্ছাড়া এম, এ, পাশ ছোকারার দিকে চেয়ে চেয়ে ওরা কাটিয়েছে। সে ব্যাটা কোনও কর্মের নয়। শুধু পাশ করতেই জানে। একটা চাকরিবাকরি জুটল না কোথাও তার। শেষে তার আশা ছেড়ে দিয়ে আমি একটি সুপাত্র দেখেছি আমার গ্রামে। উঁচু বংশ, ঘরে মা লক্ষ্মী বাঁধা। তবে বয়সটা একটু বেশী হয়ে গেছে। দু'টি উপযুক্ত ছেলে আছে সেই ভদ্রলোকের। তা' থাকুক, মানে—নাতনীর আমার খাওয়া-পরা আদর-যত্নের অভাব হবে না।"

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথার মধ্যে। কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। দেলখোস থেকে বেরিয়ে দু'জনে হাওড়ার বাসে উঠলাম।

সাতটা পনেরো মিনিটে ব্যাণ্ডেল লোকাল ছাড়ল। গাড়িতে বেজায় ভিড়। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখলাম, ভদ্রলোক কাঁথা জড়ানো পোঁটলা নিয়ে একখানি থার্ড কেলাসে উঠলেন। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে ঠিক তার পাশের কামরায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম।

শেওড়াফুলি পৌঁছলে গাড়ি প্রায় খালি হয়ে গেল। নেমে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, ভদ্রলোক একটি ছোট্ট কৌটা খুলে একটি বেশ মাঝারি গোছের কালো বড়ি মুখে ফেলে এক ভাঁড় চা কিনলেন।

গাড়ি মানকুণ্ডু স্টেশনে থামবার আগে রুমালখানা পকেট থেকে বার করে মাথায় বেঁধে নিলাম। প্রায় ভুরু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। চন্দননগর স্টেশনে থামলে নেমে গিয়ে পাশের গাড়িতে উঠলাম।

আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ নেই গাড়িতে। তিনি গাড়ির কোণে মাথা রেখে হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন। কাঁথা জড়ানো পোঁটলাটি পাশে রয়েছে।

চুঁচুড়া আসছে। গাড়ির গতি কমে এল। প্ল্যাটফর্মের উলটো দিকের দরজা খুলে দাঁড়ালাম। আরও কমে এল গাড়ির স্পীড। পেছনে ফিরে দেখলাম বিচিত্র সুরে তাঁর নাক ডাকছে।

বুকের মধ্যে তখন আমার হাতুড়ির আওয়াজ হচ্ছে। দম বন্ধ করে দাঁতে দাঁত টিপে দাঁড়িয়ে আছি।

আরও কমল গাড়ির স্পীড। তুলে নিলাম পুঁটলিটা। তারপর এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়লাম।

সেই রাত্রেই ব্লেড দিয়ে কেটে ফেললাম সব ক'খানি খাতার মলাট। খাতা ক'খানি বিছানার নিচে পেতে রেখে মলাট ক'খানি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এলাম। রাত্রে খাতা-পাতা বিছানায় শুয়ে চোখে ঘুম এল না। যতই মনকে বোঝাতে চাই, যা' হোক গে যাক্, দু'টি উপযুক্ত ছেলে আছে যার তার সঙ্গে হুগলীর গোবর্ধন ঘোষের একমাত্র মেয়ের বিয়ে তাতে আমার কি, ততই মন হু-হু করে ওঠে। আগামী বিশ বছরের রসদ আমার বিছানার নিচে, এই বার গল্পের পর গল্প, উপন্যাসের পর উপন্যাস বেরুতে থাকবে বাঙলা দেশের সব ক'টি মাসিক সাপ্তাহিকে, সিনেমার ছবি যাঁরা বানান তাঁদের গাড়ি এসে দাঁড়াবে আমার দরজায়। ঐ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটেই চওড়া পাড় মাদুরার চাদর কাঁধে

ঝুলিয়ে আমি স্বয়ং একদিন নামব কালো রঙের ছোট মোটর থেকে। সভায় হব সভাপতি, খবরের কাগজে বেরুবে ছবি। আবার মরব যেদিন, সেদিন আমার এই দেহটা নিয়ে শোকযাত্রা বেরুবে। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সমস্ত ছবিগুলি মনের সামনে খুলে ধরি, তবু মন ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বার বার অন্য একখানি ছবি সামনে এসে দাঁড়ায়, যার বাঁ-গালে টোল পড়ে হাসলে, যার চুল কোমরের নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়, যার ভীরু চোখের চাহনি বড্ড বেশি মুখর, যার হাতে লুকিয়ে চানাচুর গুঁজে দিতে গেলে কেঁদে ফেলে আর সেদিন যে খিল-খিল করে হেসে দরজার আডালে দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল—যেমন ধড়িবাজ তেমনি মিথ্যুক। কথা দু'টি একশবার নেহাত অপমানসূচক। কিন্তু সেই বিশেষ মুখের প্রথম সম্ভাষণ বলেই বোধ হয় আমার কানে সেদিন মধুবর্ষণ করেছিল।

কিন্তু—

আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। 'নাতনী আমার আদর যত্ন ভাত কাপড়ের কষ্ট পাবে না।' উঃ, কেন তৎক্ষণাৎ নরহরি হাই-এর মুখে একটি চড় বসিয়ে দিইনি। বেটা লোফার ভ্যাগাবণ্ড জোচ্চর-স্কাউণ্ড্রেল গণ্ডার-গোত্র গাধা। নিজে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছে আবার—

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

তড়াক করে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। কান পেতে রইলাম।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

না, ঠিকই কে দরজা ঠেলছে আমার। দরজার খিলে হাত রেখে থমকে দাঁড়ালাম। চোর ছ্যাচড় নয় তো!

আবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। বিছানার তলা থেকে ছোরাখানা বার করে এক হাতে বাগিয়ে ধরে আস্তে আস্তে খিল খুলে দিয়ে দরজার পাশে সট করে সরে দাঁড়ালাম। ঘরে ঢুকল আমার বোন—

"আঃ, জোর কচ্ছিস কেন, আয় না ভেতরে।"

আর একজনকে টেনে আনলে হাত ধরে।

ভোরের আলোও ঘরে এসে ঢুকল ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

বোনের চোখে জল। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বোন বললে—"দাদা, তুমি কি পাষাণ ?"

একেবারে হতভম্ব, আজ বাদে কাল যার বিয়ে তার চোখে জল! আর এই সাত সকালে আর একজনকেই বা জোটালে কোথা থেকে ? আর আমিই বা পাষাণ হতে গেলাম কেন ?

তখন শুনলাম বোনের মুখ থেকে। আমার একমাত্র বোনের একমাত্র বান্ধবী এই ভোরবেলা বিদায় নিতে এসেছে। বিদায় মানে চিরবিদায়— দড়ি আফিম সমস্ত প্রস্তুত, কেরোসিন তেলও বাড়িতে মজুদ। এখন যে কোনও একটার সাহায্যে—

আঁতকে উঠলাম।

"কিন্তু ভাই, আমার যে এখনও চাকরি জোটেনি।"

বোনের পাশে যিনি নত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি অশ্রু ভেজানো কণ্ঠে বললেন, "কেন—যারা বই লেখে তারা কি বিয়ে করে না ? আসল কথা আমার মত মেয়েকে"—আর কিছু বেরুল না কণ্ঠ দিয়ে।

বেরুবার প্রয়োজনও ছিল না। চন্ চন্ করে পায়ের রক্ত মাথায় উঠতে লাগল আমার। মাথা ঘুরিয়ে বিছানাটার দিকে চেয়ে দেখলাম ওর নিচে বিশ বছরের রসদ মজুদ।

হয়ত লোকে বলবে যে, আমার বিবেক বলতে কিচ্ছু নেই। সত্যি বলছি, এখনও গভীর রাত্রে কোনও কোনও দিন ঘুম ভেঙে গেলে একটু যেন কি রকম অস্বস্তি বোধ করি। মনের ভেতরে বেশ ব্যথাও বোধ করি বেচারা নরহরি হাইয়ের জন্যে। গায়ে ছোট ছোট কাল পিঁপড়ে হাঁটলে যেমন বোধ হয় তেমনি বোধ হয় মাঝে মাঝে আমার বিবেকের গায়ে।

কিন্তু বিয়ে করে যৌতুক যা' পায় তা' কি লোকে ব্যবহার করে না ?

নরহরি হাই-এর খাতা ক'খানি আমি আমার বিবাহের যৌতুক হিসেবে গ্রহণ করেছি, এতে কার কি বলবার আছে ?

বড্ড যখন বিবেকের দংশন অনুভব করি তখন স্ত্রীর কাছে ঘেষে শুই।

সত্যি বলছি নেহাত নাচার না হলে ও কর্ম সেদিন করতাম না।

সেদিন এই দেশের আরও একটি কুমারী মেয়ে যদি গলায় দড়ি দিত বা বিষ খেত বা কেরোসিন গায়ে ঢালত তাতে কার কি লাভ হোত ?

যাক্ মনকে একরকম করে বুঝিয়েছি যে, যা' সেদিন করেছিলাম, যার ফলে আজ আমার বাড়ি গাড়ি আর এই প্রচণ্ড সাহিত্যিক বলে নামটি হয়েছে— তা' করেছিলাম নেহাত নাচার হয়েই। আমার মত নেহাত নাচার হলে অনেকেই এ রকম কাণ্ড করে বসতেন।

বিভ্রম

মহা বিভ্রমে পড়ে গেলেন সঞ্জীবন চাটুজ্যে মশাই। আট ঘাট বেঁধে চতুর্দিকে সামলে-সুমলে তিনি কাজে হাত দিয়েছিলেন। তবুও এভাবে সমস্ত চাল ভণ্ডুল হয়ে যাবে, এ তাঁর কল্পনাতেও আসেনি। কিন্তু করলে কে এ কাজ ?

গড়গড়ার নলে একটা ছোট্ট টান দিয়ে তিনি তাকিয়া কোলে নিয়ে ঠায় একভাবে চেয়ে বসে রইলেন। চেয়ে রইলেন সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো তাঁর প্রপিতামহ রায় দেওয়ান ত্রিনয়ন চাটুজ্যে বাহাদুরের অয়েল পেন্টিংখানার দিকে। রায় বাহাদুর একটা চেয়ারের পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একখানা জাঁদরেল বই ধরা। মোটা সোনার চেন ঝুলছে তাঁর বুকে। চাপকান শামলা মোটা গোঁফে চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে। শোনা যায় তাঁর নামে এ তল্লাটে বাঘে গরুতে এক সঙ্গে জল খেতো।

বাঘ অবশ্য বর্তমানে একশ ক্রোশের মধ্যে একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু গরু ? গরু তো যথেষ্টই রয়েছে। দু'পেয়ে আর চারপেয়ে দুই-ই। তাদের দু-একটিকে ঘাস জল খাওয়াতে গিয়ে সেই স্বনামধন্য রায় দেওয়ান ত্রিনয়ন চাটুজ্যে বাহাদুরের প্রপৌত্র সঞ্জীবন চাটুজ্যে মশাইকে হিম্‌-সিম্‌ খেতে হচ্ছে। গড়গড়ার নলটা মুখে করে ধরে একলা বসে বসে ভাবতে লাগলেন চাটুজ্যে মশাই যে তাঁর ঠাকুরদাদার বাবার তিনটে চোখ ছিল, তাই তিনি ছিলেন ত্রিনয়ন চাটুজ্যে। ঐ তিন নম্বরের চক্ষুটি তাঁর কপালের উপর না থাকার দরুনই তাঁর এ দুরবস্থা কি না।

হরি বক্সী দরজা ঠেলে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। বক্সী দিনে রাতে কোনও সময় দুটো চোখ সম্পূর্ণ খোলে না। দেড় চোখে সে চেয়ে থাকে। তা' থাকুক, কিন্তু কোন্‌ দিকে যে সে চেয়ে রয়েছে তা' বোঝা শিবেরও অসাধ্য। ডাইনের যারা তারা মনে করবে বক্সী মশায় বাঁ পাশের ওদের দিকে চেয়ে

আছেন। বাঁদিকের যারা তারা ঠিক উল্টোটি ভাববে। বক্সী কিন্তু কোনও দিকেই চায় না। স্রেফ নিজের দিকেই সে চেয়ে থাকে।

আর তা' না থাকলে ঘরবাড়ি জমিজমা বাগান পুকুর কস্মিনকালেও হোত না বক্সীর। বার বছর আগে যখন সে এই দেওয়ান বাড়িতে বাজার সরকার হয়ে বার টাকা মাহিনা আর খোরাকিতে চাকরি নিয়ে ঢোকে তখন জল খাবার একটা ঘটিও ছিল না বক্সীর। কিন্তু এই বার বছরে সে এমন গোছান গুছিয়ে নিয়েছে যে এখন খুশি হলে সে জালায় চুমুক দিয়ে জল খেতে পারে। তবে তা' সে খায় না।

বার বছর আগে যে ছাতাটি বগলে চেপে এ বাড়িতে ঢোকে বক্সী, সেটি আজও তার বগলের মধ্যে সদা সর্বদা বিরাজ করছে। জুতো তার সেদিনও ছিল না, আজও নেই। ফতুয়ার উপর এখনও সে কোমরে গামছা বাঁধে! বেশির মধ্যে বেড়েছে, বেশ দর্শনীয় ভাবেই বেড়েছে মাথার উপরের টাকটি। বার বছর আগে যা' ছিল চওড়া একখানি কপাল মাত্র, এখন তার সীমানা বাড়তে বাড়তে ঘাড়ের কাছে এসে পৌঁছেছে।

বক্সী হেঁট হয়ে হাত জোড় করে প্রণামটা সারলে। সকাল থেকে এবার নিয়ে এই এগারবার তাকে হুজুরের সামনে আসতে হোল। আর এই এগার-বারই এক মাপের নিচু হয়ে হাত জোড় করে এগার দুগুণে বাইশটি প্রণাম হুজুরকে নিবেদন করলে বক্সী।

চাটুজ্যে মশাই সোজা হয়ে বসলেন। বসে বললেন, "হুঁ—এসেছে বেটারা?"

বক্সী মহা দুঃখের সহিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"আজ্ঞে কই, কাকেও দেখছি না তো এখনও।"

বাবু চাপা গর্জন করে উঠলেন—"হারামজাদাদের চাবকাতে চাবকাতে ধরে আনা দরকার।"

বক্সী আর এ কথার উত্তর দেবে কি? ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবুও জানেন বক্সীও জানে যে বাড়িতে একগাছা চাবুকও নেই। থাকতও যদি এক আধ গাছা ও জিনিস চালাবার হাত কোথায়? এবং সবচেয়ে বড় কথা চাবুক পড়বে যে পিঠে সে পিঠগুলি একেবারে নাগালের বাইরে। রুদ্ধ আক্রোশে চাটুজ্যে মশাই হাঁফাতে লাগলেন। শেষে হুকুম হোল, "সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত তুমি দেখবে। তারপর—তুমি নিজে গিয়ে ওদের বলে আসবে যে আজ রাতের মধ্যেই কাজ হাসিল হওয়া চাই। নয়ত—নয়ত—" এই পর্যন্ত বলে এমনভাবে চাইলেন তিনি বক্সীর দিকে যেন বক্সীকেই তিনি একেবারে খতম করে দেবেন যদি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ না হয়।

বক্সী আবার একবার নিচু হয়ে প্রণামটা সেরে ফেলে নিচু হয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার সাথে সাথেই ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি শুরু হোল। লিচু বাগানের ওপাশের পথটি একে দারুণ অন্ধকার তার ওপর অসম্ভব রকমের পিছল। সাবধানে পা না ফেললে একটানে নেমে যেতে হবে ডান ধারের বউ দীঘিতে। দিঘীর ওপারেই দেওয়ান বাড়ির পিছন দিক।

সাবধানেই এগুচ্ছিলো বক্সী ছাতাটি মাথায় দিয়ে। আর কয়েক পা এগুলেই লিচু বাগান শেষ। তখন অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা মিলবে। বাগানটার যেখানে শেষ সেই কোণাটা ঘুরলেই শ্রীনাথ বাউরীর আখড়া। বাউরী 'ভেক নিয়ে বাবাজী হয়েছে। আগে লাঠালাঠি করত। সবদিন থাকে না আখড়ায়। যেদিন থাকে সেদিন তার একতারাটায় ঝংকার ওঠে। বাউরীর গলা আছে, সে গায়—"ওরে মন, মনরে আমার, একলা হাটে বেচবি কি তুই বল।"

সেদিন শ্রীনাথ ছিল কিন্তু একতারায় ঝংকার উঠছিল না। ঘরের দাওয়ায় অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল শ্রীনাথ। সাড়া দিলে, "কে যায়?"

বক্সী উত্তর দিলে, "আমি হরিরাম।"

"আসুন আসুন উঠে আসুন দাওয়ায় নায়েব মশাই। একটু তামাক সেবা করে যান।"

"সময় নেই বাবাজী, একটুও সময় নেই। এখনই এই বর্ষায় দেড় ক্রোশ মাটি ভাঙতে হবে আমাকে" বলতে বলতে বক্সী দাওয়ায় উঠে এল। একহাতে উঁচু একখানি কাঠের টুল এগিয়ে দিলে শ্রীনাথ—"বসতে আজ্ঞা হোক নায়েব মশাই, বসুন। আলো জ্বালি, আগুন করি। একটু তামাক সেবা করুন। একটু চা মুখে দিন।"

বাবাজীর গলায় উল্লাস ফুটে উঠল।

বসল বক্সী, সত্যই তার ভাল লাগছিল না। এ কাজে একটি পয়সা নেই তবু তাকে এই ভুতের ব্যাগার খাটতে হচ্ছে। অবশ্য সব কাজেই যে পয়সার মুখ দেখা যাবে এমন কোনও মাথার দিব্যি দেয়নি কেউ। মনিবকে হাতে রাখতে হলে এই জাতের দু'-একটা কালতু কাজে ব্যাগার দিতেই হয়। উপায় কি? কিন্তু আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে রওনা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও সিদ্ধ হবে না তা' সে ভাল করেই জানে। মুসলমানরা শুনবে কেন? কংগ্রেস সরকার ওদের হাতের মুঠোয় পুরেছে। ওরা খুন জখম লাঠালাঠি সব ছেড়েছে। কেন ছাড়বে না? মানুষ যতই নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন যাপনের সুযোগ পাবে ততই তার স্বভাব বদলাবে। ঘরে যদি ভাত থাকে আর জান মান বাঁচাবার দায়িত্ব যদি নেয় দেশের শাসনকর্তারা তখন কার সখ হয় খামকা মাথা নিতে আর মাথা দিতে। বউ ছেলে নিয়ে শান্তিতে ঘর সংসার করবার জন্তই মানুষের প্রাণ আঁকুপাঁকু করে। কেন তারা পরের কথায় নেচে আগুনে হাত দিতে যাবে? বক্সী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সংসারে সবাই সুখী—সবাই স্বাধীন। শুধু সে হরি বক্সী, তার জীবনে সুখশান্তি বলতে কিছুই নেই। এক একবার সে মনে করে—দেবে এবার চাকরিটা ছেড়ে। দিয়ে চলে যাবে তার গাঁয়ে। জমিজমা ধানপান যা' যেটুকু সে করেছে তা' ঘরে বসে নেড়ে চেড়ে খেলে বাকী দিন কটা একরকম করে কেটে যাবে তার। আর পোষায় না এ দিকদারি আর হুজ্জৎ। কিন্তু চাকরি তো ছাড়ব বললেই ছাড়া হয় না।

সোজা কথা তো নয়, বাজার সরকার থেকে নায়েব। সিঁড়ি ক'টা টপকে উঠে আসতে কম বুকের রক্ত জল করতে হয়নি বক্সীর। ফস্ করে ছাড়ি বললেই কি ছাড়া যায় এ দুর্লভ পদ। গাঁয়ে ফিরে গেলে তাকে নায়েববাবু বলে ডাকবে কে? কে তাকে এত খাতির করে বসিয়ে তামাক খাওয়াবে, চা দেবে? গাঁয়ে তো সে স্রেফ মধু নাপতের ব্যাটা হয়ে নাপতে। এখানে এসেই না সে বক্সীবাবু পদবীটি বুকের রক্ত দিয়ে লাভ করেছে।

তামাক এল। একটা ছোট কেরোসিনের ডিবে জ্বালানো হয়েছে। সেটা থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বেশি। ঘরের ওপাশে শ্রীনাথ উনুনে নাড়া গুঁজে দিয়ে 'হা ফুঁ—হা ফুঁ' করছে। চা খাওয়াবে নায়েববাবুকে।

তামাক খেতে খেতে হঠাৎ বক্সী চেঁচিয়ে উঠল, "কে, কে যায়? কে ওখানে?" কোনও সাড়া নেই। বাবাজী উঠে এল ওধার থেকে। "কে—কে নায়েববাবু? কাকে দেখলেন কোথায়?"

বক্সী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—"ঐ গাছটার পিছনে। ঐখানেই লুকিয়ে পড়ল কে।" গলাটা তার কেঁপে উঠল।

শ্রীনাথ নেমে গেল দাওয়া থেকে। গিয়ে সামনের পায়ে চলা পথটার এধার ওধার দেখে ফিরে এল। "কই, কেউ তো নেই নায়েববাবু। আপনার ভুল হয়েছে, কি দেখতে কি দেখেছেন।"

বক্সী কোনও উত্তর দিলে না। একভাবে সেই দিকে চেয়ে বসে রইল। ভুল তার হয়নি। ভুল হতে পারে না হরিরাম বক্সীর দেড় চোখের দৃষ্টির। লোকে বলে তার চোখ রাতে বিড়ালের মত জ্বলে। নিশ্চয়ই কেউ আসছিল এই দিকে। সাড়া পেয়ে সট্ করে গা ঢাকা দিলে। কিন্তু কে লোকটি?

কালো পাথরের বাটিতে চা আর শালপাতায় করে দু'টি নারকেল নাড়ু এনে হাতে দিলে শ্রীনাথ। বক্সী একটি নাড়ু তুলে নিয়ে বাটিতে চুমুক দিলে। দেওয়ান বাড়ির দেউড়ির পেটা ঘড়িতে বাজতে লাগল ঢং ঢং ঢং ঢং। বক্সী মনে মনে গুণলে আট।

তামাক সেবা করে দাওয়া থেকে নেমে এল বক্সী। আর বসে থাকা যায় না। বা উরী ব্যাটা ভাববে নায়েববাবু ভয় পেয়েছে।

এ তল্লাটের ইঁদুর বিড়ালটি পর্যন্ত জানে ভয় পাবার পাত্র নয় বক্সী। ছাতাটি খুলে সে এগিয়ে গেল। ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছেই। একভাবে ছাতা মাথায় সোজা এগিয়ে চলল বক্সী। যেতে যেতে চট করে একটা বড় গাছের আড়ালে সরে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক একটি মুহূর্ত গড়িয়ে যেতে লাগল, গাছের গায়ে মিশে বক্সী দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে দম বন্ধ করে আর কান খাড়া করে। শেষে শোনা গেল। শোনা গেল স্পষ্ট পায়ের শব্দ। ভিজে মাটির উপর দিয়ে চললে সামান্য একটু ছপ্ ছপ্ শব্দ হবেই। বক্সী স্পষ্ট দেখলে দু'জন সন্তর্পণে এগিয়ে গেল সামনে অর্থাৎ যে পথে সে যাচ্ছিল সেই পথে। বক্সী নড়ল না, পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আবার পায়ের শব্দ কানে এল। এবার ওরা ফিরছে। বক্সীর সামনে দিয়ে যাবার সময় ফিস্ ফিস্ করে বলতে বলতে গেল—"যাক না ব্যাটা, একবার গিয়ে পৌঁছুলে হয়।" আর একজন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—"যাও বাছাধন যাও, আর ইহজীবনে এ পথে ফিরতে হবে না।" ওরা এগিয়ে গেল। বক্সীর টাক বেয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে।

আরও মিনিট দশেক নড়ল না বক্সী। তারপর বেরিয়ে এল গাছের পিছন থেকে। এসে সোঁ করে সরু রাস্তাটা পার হয়ে ও পাশের লিচু বাগানে গিয়ে ঢুকল। তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে গেল শ্রীনাথের আখড়ার দিকে বিড়ালের মত নিঃশব্দে পা ফেলে।

শ্রীনাথের আখড়ায় কেরোসিনের ডিবা আবার নিভেছে। বাগানের ভিতর দিয়ে শ্রীনাথের ঘরের পিছনে এসে দাঁড়াল বক্সী। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘরটার ডান পাশ ঘুরে এগিয়ে চলল। ঘরের সামনে দাওয়া। একটু আগে যেখানে বসে বক্সী চা তামাক খেয়ে গেছে। সেই দাওয়ার ডানপাশের বেড়ার গায়ে সে কান পেতে দাঁড়াল।

ফিস্ ফিস্ করে কথা হচ্ছে। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলে না। তারপর স্পষ্ট শুনতে লাগল সব কিছু।

"শালার নায়েবটাকে এখানেই শেষ করে দিলে হোত। কি দরকার, যাক না শালা আস্তানায়। টুঁটি মুচড়ে তাকে পুঁতে রাখবে চাচা। কাকে যকে টের পাবে না। ও ব্যাটা তো লুকিয়ে চলেছে সেখানে। যদি কখনও না ফেরে তাতেই বা কার কি? ওখানে যে গেছে একথা বলছে কে ওর হয়ে।"

"বলবার জন্যে কেউ বেঁচে থাকলে তো।"

"বাবুর ঘরের বন্দুকটা এসে গেছে বাবাজী?"

"সন্ধ্যার আগেই এল। বোষ্টমী তেমন মেয়ে নয়। আজ দু-মাস হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটছে ঝি হয়ে! গুলির বাক্সও এসেছে একটা—দেউড়ির বন্দুকটা আমরা গিয়েই হাতে পাব। চোবে শালারা এতক্ষণে ভেগেছে দেউড়ি ছেড়ে।"

"কতবড় আস্পদ্দা দেখ শালার! উনি অন্দরমহলে শুয়ে থাকবেন আর আমরা জান দিতে যাব ওঁর কথায় চৌধুরী বাড়ি। কেন চৌধুরীরা আমাদের সাথে কি দুশমনি করেছে?"

"সেবার বাঁচালে কে আমাদের ধান চাল দিয়ে। এই শালার দেওয়ান বাড়ি তখন বলেছিল, মুসলমানের এক একটা মাথা এক একশ টাকায় কিনব, কি, মনে আছে চাচা?"

"সবই মনে আছে, আজ তার শোধ।"

"কেউ আমাদের সন্দেহই করবে না! তাছাড়া কংগ্রেসী বাবুরা আমাদের হয়ে লড়বে। থানার দারোগা তো কংগ্রেসী বাবুদের হাতের মুঠোয়।"

"দেওয়ান বাড়ির কথায় চৌধুরী বাবুদের গদিতে হাত দিলে রক্ষে থাকত না কি? গুষ্টিকে গুষ্টি শেষ করত কংগ্রেসী বাবুরা। ওঁনারাই তো আজকাল কংগ্রেসে টাকা চালেন।"

"রাত কতটা হোল চাচা।"

"কান পেতে থাক। পেটা ঘড়ি বাজলে বুঝবি।"

"বাজাবে কে ? যারা বাজাবে তারা তো সরেছে দেউড়ি ছেড়ে।"

বক্সী আর দাঁড়াল না। হামাগুড়ি দিয়ে ফিরল।

রাস্তায় পা দেবার উপায় নেই। কে জানে পাহারা বসে গেছে কি না।

কোনও রকমে বুক পিছলে রাস্তাটা পার হয়ে সেই ভাবেই বউ দীঘিতে গিয়ে নামল। বড় বড় পদ্মপাতা ভাসছে। এখন আর তাকে পায় কে। কিছুক্ষণ পরেই ওপারে গিয়ে উঠল বক্সী। সামনেই দেওয়ান বাড়ির খিড়কি। ভিতর থেকে বন্ধ। কি করে ? ঘুরে সামনে যাবার সাহস হোল না। যদি কেউ ওত পেতে বসে থাক কোথাও।

খিড়কি দরজার ভিতর দিকে গোয়াল। গোয়ালের চালের বাঁশ এধারে অনেকটা নেমে এসেছে দেওয়ালের বাহিরে। বক্সী লাফ দিয়ে ধরলে সেই বাঁশ। ধরে অদ্ভুত কায়দায় পাঁচিলের উপর উঠে গেল। তারপর ভিতরে নামতে কতক্ষণ। বাড়ির ভিতরে অন্দরের পুকুর। সে পুকুরের ওপাশে অন্দর মহল। চলেছে বক্সী। মরিয়া হয়ে চলেছে। যেভাবে হোক তাকে যে পৌঁছতেই হবে দেউড়িতে, সেখানকার দুনলা বন্দুকটা আর টোটাগুলো যে তার হাতে পড়া চাই-ই।

তখন অন্দর মহলের দোতলায় নিজের খাস কামরায় একলা বসে আছেন সঞ্জীবনবাবু। সামনে মদের বোতল গেলাস। দেওয়ালের গায়ের ঘড়িতে বিচিত্র সুরে বারটা বাজল।

চাটুজ্যে মশায় ভাবছেন—"বেইমানী করবে না তো ব্যাটারা। ওরা জাত বেইমান। আজকাল আবার সব ভদ্দরলোক হয়েছে। কংগ্রেসওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে সব ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। বেড়ে উঠেছে ঐ চৌধুরী শালাদের উস্কানীতে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে দুটো কাঁটাই ফেলে দাও। এই হোল আসল চাল। যাদের খেয়ে হারামজাদারা বেড়ে উঠেছে, আজ তাদেরই ঘাড় মটকাবে।"

"দেওয়ান বাড়ির খেয়ে সাত পুরুষ মানুষ হলি। সাতপুরুষ এই বাড়ির

কথায় মাথা দিয়েছে—মাথা নিয়েছে, আর আজ? আজ ডেকে পাঠালেও আসে না এক শালা। কল খুলে দিয়েছে চৌধুরীবাবুরা। ধানকল, করাতকল, চটকল। সবাই কলে যাচ্ছে পাঁচ মাইল দূরে। কাঁচা পয়সার মুখ দেখেছে। দেওয়ান বাড়ি আর কিছু নয়—কেমন?"

সঞ্জীবনবাবু আবার ঢাললেন। গাঢ় রক্তবর্ণ টলটলে আগুন। কিছু না মিশিয়েই ঢক্‌ করে গলায় ঢেলে দিলেন সবটুকু।

আবার ঢাললেন গেলাসে। গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে ঘরের মিঠে আলোয় গেলাসটা দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। 'বড্ড বাড় বেড়েছে চৌধুরী গুষ্টি'। টাকার জোরে কিনেছে কংগ্রেসী নেতাদের মাথা। আজ নিজেদের মাথা বাঁচাক। টাকা দিয়ে বাঁচিয়েছিল নেড়ে বেটাদের। আজ ওরাই চিবুবে ওদের মাথা। আবার গেলাস মুখে উঠল।

"কিন্তু একজনও আজ এসে দেখা করে গেল না কেন? আলতাব আলি পুরনো লোক। কম নয়, করকরে দশখানা একশ টাকার নোট কোমরে বেঁধে নিয়ে গেল পরশু। যাবার সময় বলে গেল আজ একবার দেখা করে যাবেই। এল না কেন কেউ?"

আবার গেলাসে খানিকটা ঢেলে গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে কপাল কুঁচকে গেলাসটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

"বক্সী তো কই এখনও ফিরল না। রাত তো বারটা বাজে।" মহা বিভ্রমে পড়ে গেলেন সঞ্জীবন চাটুজ্যে মশাই।

"দুম্ দুম্ দুম্ দুম্।"

হাত থেকে তাঁর গেলাসটা পড়ে গেল। আবার আওয়াজ—"দুম্ দুম্ দুম্ দুম্"—দেউড়িতে রে রে রে রে চীৎকার।

চাটুজ্যে মশাই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা টলছে। ঘরের কোণে দাঁড় করানো আছে জামা-পরানো তাঁর দু'নলা বন্দুক। টলতে টলতে সেখানে গিয়ে হাতড়ে দেখলেন। দেখলেন কিছু নেই।

তখন তাঁর নেশা ছুটে গেছে। দেউড়ি থেকে অবিরাম আওয়াজ আসছে "দ্রুম্ দ্রুম্ দ্রুম্ দ্রুম্"। পাগলের মত ঘরময় ছুটাছুটি করতে লাগলে চাটুজ্যে মশাই। কোথায় গেল, তাঁর বন্দুক!

কিসে একটা ঠোক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পডলেন সঞ্জীবনবাবু। তারপর আর কিছুই তিনি জানতে পারলেন না।

পরদিন বেলা দশটা।

দারোগা এসেছেন, দেশের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। চৌধুরীবাবুদের সদ্য কেনা ঢাউস মোটর গাড়িটা এসে থামল। খদ্দরের কাপড়-চাদর মোড়া নন্দ চৌধুরী গাড়ি থেকে নামলেন। নেমে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সঞ্জীবনবাবুর হাত দুটো জাপটে ধরলেন।

"দেউড়িতে সারি সারি সাতটা লাস শোয়ান হয়েছে। নন্দ চৌধুরীর চট কলের লোক সব।"

কিন্তু কে মারলে এদের? কে বাঁচালে দেওয়ান বাড়ির মান সম্মান? কে চালালো গুলি?

পাতি পাতি করে খুঁজছে পুলিশের লোক।

সঞ্জীবনবাবু ভাবছেন। জ্যান্ত কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন বেটা নিমকহারাম বক্সীকে। একবার হাতে পেলে হয়। এই বেইমানী তারই কাজ।

অবশেষে ঠাকুর দালানের থামের পাশে পাওয়া গেল। দেউড়ির বন্দুকটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চতুর্দিকে অনেকগুলি খালি কার্তুজের খোল ছড়ানো। বাঁ-কষ দিয়ে সামান্য রক্ত গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে। দারোগা সাহেব বললেন—"হার্টফেল করেছে শেষ রক্ষা করে," সঞ্জীবনবাবুকে নিয়ে যাওয়া হোল। আস্তে আস্তে তিনি পাশে বসে পড়লেন।

"বক্সী! হরি বক্সী শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিলে তাঁকে বাঁচাতে!" জীবনের সব চেয়ে বড় বিভ্রমে পড়ে গেলেন তিনি।

ইজ্জত

বাজার থেকে ফিরে দাড়ি কামাচ্ছিলাম। পাশের ঘরে কে গান গেয়ে উঠল সকাল বেলাতেই।

"বাঁকা ভুরু মাঝে
আঁকা টিপখানি
আঁখি হিল্লোলে আহা মরি মরি।"

গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম হারাণদার মেজ ছেলে। ক্লাস নাইনে আটকে আছে তিন বছর শ্রীমান। কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছোকরার। এখনই সে একজন চাঁই পাড়ার। মল্লিকদের রোয়াকের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। তা' না নিয়ে করবেই বা কি। আমার মত একখানি মাত্র ঘর নিয়েছেন হারাণদা। দক্ষিণা ত্রিশ আর পাঁচ। পাঁচ হচ্ছে পাঁচতলার ছাদে দু' হাত চওড়া পাঁচ হাত লম্বা রান্না ঘরখানির জন্য। ত্রিশ টাকার ঘরখানিতে যদি সংসারের সব ক'জন লোকেই অষ্ট প্রহর ঢুকে বসে থাকব বলে প্রতিজ্ঞা করে তাহলে চলে কি করে। কাজেই আমাদের পাড়ার সব ছেলেমেয়েরাই রোয়াকে আর রাস্তায় কাটায় বেশীর ভাগ সময়।

ছেলেরা রোয়াকের জীবন যত দিন খুশি চালাতে পারে। কিন্তু মেয়েগুলো তা' পারে না। ওদের জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ আছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরবার সময়টা হচ্ছে সেই সন্ধিক্ষণ। তখন আচম্বিতে সজাগ হয়ে ওঠেন মেয়ের মা।

"খবরদার খুকী যখন তখন ধেই ধেই করে যদি বেরুবি রাস্তায় তো ঠাং খোঁড়া করে দোব।"

আমার মেয়ে সবে মাত্র সেই সন্ধিক্ষণ পার হয়েছে। শাড়ি কিনে এনেছি। ওর মা ওপরের ভেতরের জামা বানিয়ে দিয়েছেন নিজে সেলাই করে। আরও একটা কাজ করতে হয়েছে। একখানি মাত্র ঘরের মধ্যে কাঠে আর চটে

দেওয়াল বানিয়ে নিতে হয়েছে। এপাশে রয়েছে তিন ভাগ ও পাশে এক ভাগ। ওই ভাগটা খুকীর। পড়বে শুনবে রাত্রে ছোট্ট মশারি খাটিয়ে ছোট ভাইটিকে নিয়ে শোবে। মেয়ের সন্ধিক্ষণ পার হবার সময় নগদ পঁয়তাল্লিশ টাকা বেরিয়ে গেছে। এখন অফিস থেকে ফেরবার সময় হেঁটে বাড়ি ফিরি। এক বাণ্ডিল বিড়িতে দু'দিন চালাই। অফিস থেকে ফিরে একেবারে ভাত খেতে বসি। অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলায় চা রুটির হাঙ্গামাটা তুলে দিতে হয়েছে। আর মেয়ের মা হঠাৎ নিজের দন্ত সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠে পান সুপারি কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সাবান বুরুশ ধুয়ে মুছে তোলা হয়ে গেল আমার। দেওয়ালের গায়ে ঝোলান সার্টের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে এক নজর দেখে নিলাম। আটটা পনেরো। হাতে রইল ত্রিশ। খুব হয়ে যাবে। বাকি আছে শুধু মাথায় দু' ঘটি জল ঢালা ভাত খাওয়া আর জামাটা গলানো। গামছাখানা টেনে নিয়ে একরকম ছুটে বেরুলাম ঘর থেকে। যদি কলতলাটা খালি পাওয়া যায় তবে কলের নিচে বসে সারা গাটা ভিজিয়ে নোব।

ঘর থেকে বেরুবার সময় কানে গেল—'কাজল মাখানো সুনীল নয়ন'।

মাথা মুছতে মুছতে এক সঙ্গে দুটো তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে ওপরে উঠে এলাম। দু' হাত চওড়া রান্নাঘরের দরজায় বসে ভাত খেতে হবে। ছোঁক করে শব্দ হোল। কড়ায় দুটো লঙ্কা পুড়িয়ে তার ওপর ডালটা ঢেলে দিলেন গৃহিণী। এইবার ঐ কড়া থেকেই দু' হাতা তুলে দেবেন আমার পাতে। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে গোটা দু' তিন হাঁচি সামলে বিকৃত স্বরে বললেন—"আর কি কোথাও বাড়ি জোটে না এই কলকাতা সহরে। ঝাড়ু মারি এই বাড়ির কপালে। এখানে থাকলে আর ইজ্জত থাকবে না তা' বলে দিচ্ছি।"

উচ্ছে ভাতে দিয়ে প্রথম ভাত গরাসটা মুখে তুলতে যাচ্ছিলাম। হাতটা মুখের কাছে গিয়ে থেমে গেল।

চাপা গলায় বলেই যাচ্ছেন কড়ায় হাতা নাড়তে নাড়তে, যে লোক চোখ

থাকতে কানা তাকে কি কিছু দেখানো যায়। এ বাড়িতে আমার পোষাবে না, সাফ বলে দিলাম। অন্ততঃ একটা নিজস্ব বাথরুম থাকে এই রকমের বাড়ি খোঁজ। নয় তো যেদিকে দু' চক্ষু যায় চলে যাব একদিন ছেলে মেয়ের হাত ধরে।

ভাত গরাসটা মুখে ঠেলে দিয়ে এক ঢোক জল গিলে গলা থেকে নামিয়ে নিলাম। পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়ায় নিজস্ব বাথরুম পর্যন্ত চাই। আর একটি কামধেনু চাইলেই বা কে বাধা দিচ্ছে। পঁয়ত্রিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে যে ক'টি টাকা আর হাতে থাকে তাতে নিজেদের দু'খানা জামা কাপড় ধোপার বাড়ি পাঠান যায় না। জামা কাপড় ধোপার বাড়ি পাঠাতে হলে অন্ততঃ আর এক প্রস্থ দরকার। তাও যাদের নেই তাদের আবার ইজ্জত।

গলাটা সাফ করে নিয়ে জবাব দিলাম, "ইজ্জত বাঁচাতে হলে আগে ইস্ত্রি করা জামা কাপড় পরা দরকার। দাঁড়াও, আগে সেই সংস্থান হোক। তারপর বাথরুম ড্রইংরুমওয়ালা বাড়ি খুঁজব।"

জামাটা গলিয়ে ঘর থেকে বেরুলাম ঝড়ের বেগে। ধাক্কা লাগল আমারই শ্রীমানের সঙ্গে। থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে চাইলাম ওর দিকে। ময়লা হাফ প্যাণ্ট পরা কাঁধ কাটা এক চিলতে গেঞ্জি গায়ে দরজার বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমান। ছেলে তো নয় মাত্র ক'খানি হাড় পাঁজরা। বিশ্রী রকম বড় হয়েছে মাথার চুলগুলো। তিন মাস আগে দুই বাপ বেটায় চুল ছেঁটেছিলাম আট গণ্ডা পয়সা খরচ করে। আর হয়নি মাথায় কাঁচি ছোঁয়ানো।

নিচু দিক চেয়ে নন্ত বললে ফিস্ ফিস্ করে, "পাঁচ আনা পয়সা।"

খপ্ করে ওর হাতটা ধরে টানতে টানতে নেমে এলাম নিচে, "কি করবি রে নন্ত পয়সা নিয়ে?"

ছেলে চুপ করে রইল। রাস্তায় বেরিয়ে বললাম, "চল ঐ মোড়ের চুল কাটার দোকানে। চুলটা কেটে আসবি। আর এই নে আট আনা পয়সা। কি ছবি দেখতে যাবি রে আজ?"

নন্তু উত্তর দেয় না। তখন বললাম ছেলেকে, এমনভাবে বললাম যেন ও আমার বন্ধু, ওর বয়স মাত্র দশ বছর নয়। ও আমি সমবয়সী। বললাম, "নন্তু আমরা খুব গরীব না রে? লোকেরা ভাল মাছ খায়, দুধ খায়, আমরা খাই না। আমি একলা রোজগার করি তো। তুই যদি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠে টাকা পয়সা রোজগার করতে পারতিস তবে আমরা সবাই সিনেমা দেখতে পারতাম। ভাল ভাল জিনিস খেতে পারতাম। তুই যতদিন না বড় হয়ে উঠছিস আমাদের কষ্ট যাবে না।"

নন্তু একটি কথারও জবাব দেয় না। মোড়ের চুল ছাঁটার দোকানে ওকে বসিয়ে চার আনা পয়সা দোকানদারকে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

সেদিন রাত্রে পাতে পড়ল ডিমের ঝোল। নন্তু আট আনার ডিম কিনে এনেছে। গিন্নি একটু গজ গজ করলেন, "আবার খামকা ডিম আনতে পয়সা দিতে গেলে কেন নন্তুকে। পরশুদিন তো মাছ খাওয়া হয়েছে।"

ডিমের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে মুখে তুলতে অকারণ দু' চোখ ঝাপসা হয়ে এল। মনে পড়ে গেল আমি বাবার পাশে বসে ভাত না খেলে আমার বাবার ভাত খাওয়া হোত না। লক্ষ্য রাখতেন মাংস, ডিম, মাছ, দুধ তাঁর ছেলের পাতে অপর্যাপ্ত দেওয়া হচ্ছে কি না! গৃহিণীর কথার জবাব দিতে প্রবৃত্তি হোল না। নন্তুর দুধ খাওয়া বন্ধ হয়েছে ঠিক তিন বছর বয়সে।

রাত্রে আবার বাড়ি বদলানোর কথা উঠলো। আলাদা বাথরুমওয়ালা বাড়ি চাই। এ বাড়িতে বাস করলে ইজ্জত থাকবে না। উঠনের মাঝখানে কলতলা। মেয়েদের স্নান করবার জায়গাও নেই। মানে আলাদা ঘেরা জায়গা নেই

"আমি ছেলেপুলের মা। ভোর না হতেই মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে চলে আসি। তা' তখনও কি রেহাই আছে। একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত চার-দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁতে বুরুশ ঘষছেন সব ভদ্রলোকেরা। চ্যাংড়া ছোকরা থেকে ঘাটের মরা বুড়োটা পর্যন্ত হ্যাংলা নজ্জারের বেহদ্দ এই

বাড়িতে। এখন মেয়ে বড় হয়েছে। বাড়িতে রয়েছে ওর সমবয়সী আরও বিশটা মেয়ে। সারাদিন বেলেল্লাপনা চলেছে। আমার মেয়েকে আমি ওরকম হতে দোব না। কিন্তু করবই বা কি এ বাড়িতে। কতক্ষণ চোখে চোখে রাখব। নিজে বালতি করে জল তুলেদি পাঁচতলায় রান্না ঘরের সামনে। খুকী সেখানে স্নান করে। তাই নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা গা টেপাটেপি। হাড় বেহায়া না হলে এ বাড়িতে টিকতে পারা যাবে না। ঘর দেখ যেখানে পাও।

আরও অনেক কিছুই হয়ত বলে গিয়েছিলেন গৃহিণী। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই সবটুকু আর শোনা যায়নি।

তারপর ঘর দেখা আরম্ভ হোল।

আরম্ভ হলেই তো আর ঘর পাওয়া যায় না। সুতরাং এক মাস দু' মাস করে পাঁচমাস কাটল। ওধারে বাড়ি বদলানোর ঝোঁকটাও বেশ মিয়িয়ে এল। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে জানতে পারতাম আমার স্ত্রী কন্যাও আজকাল বেশ সামাজিক হয়ে উঠেছে। পাঁচজনের সঙ্গে মিশছে। বাড়িতেও পাড়ার লোকের পায়ের ধুলা পড়ছে। কিন্তু তাই নয়। আমাদের পাড়ায় যে নাচের স্কুলটি হয়েছে তাতে বিনা বতনে আমার মেয়েকে নেওয়া হয়েছে। কারণ নাচে আমার মেয়ের বিশেষ প্রতিভা আছে না কি। ওঁরাই ধরেছেন সে প্রতিভাটুকু। একদিন সন্ধ্যার সময় নাচের স্কুলের মাষ্টার মল্লার চট্টরাজের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। একেবারে পায়ের ধুলো নিলে আমার রাস্তার মাঝখানেই। ছেলেটিকে চিনি। ওর বাবা রেলের গার্ড। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগেই এই ছেলেটি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তখন ওর নাম ছিল মকর। কারণ ও নাকি জন্মেছিল মকর সংক্রান্তির দিন। সেই মকর চার বছর বাদে ফিরে এল মল্লার হয়ে। বম্বে দিল্লী লক্ষ্ণৌ মাদ্রাজ ঘুরে নাচ শিখেছে। বড় বড় লোকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়েছে নাচ দেখিয়ে। চুল রেখেছে ঘাড় পর্যন্ত! চোখে কাজল দিয়ে বেড়ায়।

পাড়ার লোক মেতে উঠল। সবায়েরই মেয়ে আছে। কাজেই মল্লারকে আর ছেড়ে দিলে না কেউ। নাচের স্কুল বসল পাড়াতেই। রোয়াকে যারা পড়েছিল তারা হোল মল্লারের গোঁড়া ভক্ত, চাঁদা উঠতে লাগল। ফাংশন হতে লাগল। অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়ালো কিছুদিনের মধ্যে যে কার সাধ্য একটি কথা উত্থাপন করে মল্লার আর তার দলের বিরুদ্ধে।

সেই বিশ্ববিখ্যাত মল্লার স্বয়ং রাস্তার ওপর আমার ছেঁড়া কেডস্ স্পর্শ করে হাতটা যখন তার অতি যত্নে কোঁকড়ানো চুলে মুছে পাশে পাশে অতি বিনিত-ভাবে হাঁটতে লাগল তখন একটু পুলকের শিহরণ যে বোধ করিনি এ কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। তারপর যখন সে আমায় মেসোমশাই বলে ডেকে আমার মেয়ের নাচে যে কতখানি প্রতিভা আছে তার ব্যাখ্যা শুরু করলে তখন কন্যার গর্বে বুকটা একটু ফুলে উঠল বৈকি।

তবু একবার বললাম, "কিন্তু এখন থেকে নাচ গান নিয়ে থাকলে ওর পড়া শুনার ক্ষতি হবে যে। আমার ইচ্ছে ছিল ম্যাট্রিকটা পাশ করলে—"

মল্লার আর শেষ করতে দিলে না আমার কথাটা। বললে, "সে বিষয়ে আপনি ভাববেন না মেসোমশাই। স্কুল থেকে ওকে পরীক্ষা দিতে পাঠাবেই। কারণ সবাই জানে ও মল্লার চট্টরাজের শিষ্যা। তা' ছাড়া ওধারের ব্যবস্থাও কি না করব ভেবেছেন। এঁর সবাই আমার হাতে রয়েছেন।" বলে এমন কয়েকটি লোকের নাম করলে যে মেয়ে কিছু না লিখে এলেও যে ম্যাট্রিক পাশ করবে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

বিচিত্রবর্ণের সব কাপড় জামা জুতোয় ঘর ভরে উঠতে লাগল দিন দিন। সবই মেয়ে নেচে আর অভিনয় করে পুরস্কার পায়। সংসারের শ্রী একটু ফিরল। কারণ মল্লার আমায় জুটিয়ে দিলে একটি টিউশানি। অফিসের পর টিউশানি করে রাত দশটায় বাড়ি ফিরি আজকাল। এ বাড়ি এ পাড়া ছাড়বার কথা স্ত্রী আর উচ্চারণ করেন না। লোক বল, বন্ধু বল সবই এই পাড়ায়। বিশেষতঃ এ পাড়ায় আমাকে চাঁদা দিতে হয় না এক পয়সা। কারণ আমি

হচ্ছি পুরিয়া দেবীর বাবা। মেয়ের নাম রেখেছিলাম পূর্ণিমা এখন তা' বদলে হয়েছে পুরিয়া। নাম ডাক এখন যথেষ্ট আমার। সেদিন বন্ধু বাড়ুজ্যে ট্রামে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ মেয়ে বটে আপনার—খাসা মেয়ে। যেমন গলা তেমনি নাচ। শনিবার 'নটীর বিয়েতে' নটীর পার্ট করে একেবারে মজিয়ে ফেললে সকলকে। আমি আজ বলে রাখছি আপনাকে দেখবেন ঐ মেয়ের জন্যে একদিন আপনার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে।"

সে আর বেশী কথা কি। এখনই আমার পিতৃদত্ত নামটি লোকে ভুলতে বসেছে। রাস্তা দিয়ে গেলে দু' পাশের রোয়াকের ছেলেরা বলাবলি করে— "ঐ দেখ মাইরি—পুরিয়া দেবীর বাবা যাচ্ছে।"

আস্তে আস্তে ইজ্জত বাড়ছিল সব দিকে। শুধু নন্তটা দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠতে লাগল। কি যে তার মাথায় ঢুকল সে একেবারে আগুন হয়ে উঠলো মল্লার আর তার দলবলের ওপর। সুযোগ পেলেই ওদের নাকাল করবে। বিশেষতঃ তার দিদিকে। পুরস্কার পাওয়া জামা কাপড় জুতো পাউডার রঙ সাবান সব তছনছ করে দেয়। শাসন করতে গেলে অত্যা-চারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অথচ মুখ ফুটে কিছুতেই স্পষ্ট করে কিছু বলবে না—কি সে চায়, কেন সে ওরকম করছে। প্রথমে ধারণা করেছিলাম শুধু হিংসা—তার দিদিকে সকলে ভালবাসে, জিনিসপত্র দেয়, দিদি কত ফাংশানে যায়, কত লোকের সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখে এই হিংসায় সে জ্বলে পুড়ে মরছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তাও নয়। অন্য কিছু ব্যাপার আছে। মহা বিপদে পড়ে গেলাম ছেলেকে নিয়ে। ওর জন্যে এবার পাড়া ছাড়তে হয় বুঝি।

শেষে আমরা ওকে ওর মামারবাড়ি কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেবো ঠিক করলাম। আর মাস দুই পরে পরীক্ষা। এবার ক্লাশ সেভেনে উঠবে। তারপরই কৃষ্ণনগরে গিয়ে ভর্তি হবে স্কুলে।

কিন্তু নন্তর আর কৃষ্ণনগরে যেতে হোল না। তার আগেই ঘটে গেল সাংঘাতিক কাণ্ড।

বেলা তখন তিনটে। মাথা গুঁজে কাজ করছি। তলব এল একেবারে খোদ বড় সাহেবের। ছুটলাম। ব্যাপার কি! আমার মত খুদে কেরানীকে খোদ কর্তা কেন তলব দিলেন? দুরু দুরু বুকে ঢুকলাম ঘরে। সাহেবের সামনে বসে আছেন একজন হোমরা-চোমরা পুলিশ সাহেব। আমি যেতেই সাহেব বললেন, এখুনিই চলে যাও এঁর সঙ্গে। তোমার ছেলের জন্যে তুমি গর্ব করতে পার। তার জন্যে একটা বদমায়েসের দল ধরা পড়েছে। এতক্ষণ আমি সমস্ত শুনছিলাম। কাল তোমার ছেলেকে নিয়ে আসবে। আমায় দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমি তার পড়ার খরচ দোব এর পর থেকে। আজই অর্ডার দিচ্ছি তোমার ত্রিশ টাকা মাইনে বাড়ল এ মাস থেকে।

মাথা ঘুরে গেল। অনেকটা নিচু হয়ে সেলাম করে পুলিশ সাহবের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

গাড়িতে উঠে তিনি বললেন সব কথা।

আমাদের পাড়ায় মল্লিকদের বাড়ির পেছনে যে লিচু বাগানটা আছে তার ভেতর মালীর একখানা ঘর আছে। সেই ঘরের ভেতর তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে ছিল নন্তু। বেলা প্রায় বারটার সময় মল্লার আসে সেই ঘরে তার এক শাগরেদকে সঙ্গে করে। ওরা কি পরামর্শ করে। তারপর সেই শাগরেদ বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। মেয়েটি হচ্ছে আমাদের নবকিশোরবাবুর মেয়ে। বয়স মাত্র তের বছর। মেয়েটিকে ঘরের ভেতর আনলে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "এখানে কেন আমায় নিয়ে এলে মল্লারদা।" মল্লার তখন উঠে তার মুখ চেপে ধরে। শাগরেদটি বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে পাহারা দিতে থাকে।

মেয়েটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় মল্লারের। সেই সময় নন্তু তক্ত-পোশের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে পড়ে মল্লারের ওপর। কিন্তু ঐটুকু ছেলে পারবে কেন গায়ের জোরে। মল্লার তাকে আছড়ে ফেলে মেঝের ওপর। কিন্তু ততক্ষণে মল্লারের অমন সুন্দর নাকটি নন্তুর মুখের ভেতর এসে গেছে।

বিকট চীৎকার করে ওঠে মল্লার, সেই চীৎকার শুনে তার বন্ধুটি দরজা খুলে ঘরের ভেতর যায়। সে কিছু বোঝবার আগেই তার ওপর আবার লাফিয়ে পড়ে নন্তু। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'টি চক্ষু খামছে ধরে। তখন সেও চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরোয় ঘর থেকে। একজনের নেই নাক আর একজনের নেই দুই চোখ। ওরাই লোক জমিয়ে ফেলে। ততক্ষণে নন্তু ছুটে থানায় গিয়ে উপস্থিত। মুখময় রক্ত আর হাতে মল্লারের নাক।

থানায় গিয়ে পৌঁছলাম। থানা-অফিসার শচীনবাবু আমায় চিনতেন। তিনি বললেন, "সাবাস ছেলে মশাই আপনার। বাহাদুর ছেলে বটে। ওদের দলের কীর্তি কলাপ আমরা সবই জানতাম। ভদ্রলোকের মেয়েদের সর্বনাশ করছিল। হাতে নাতে ধরতে পারছিলাম না আমরা। এবার দলকে দল সাফ হয়ে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করে জানলাম নন্তু ওপরে শচানবাবুর বাসায় আছে। একটু পরে নেমে এল শচীনবাবুর ছেলের সঙ্গে! নতুন দামী প্যাণ্ট সার্ট আর জুতো পরা।

এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার সাহেব বললেন, "কোনও ভয় নেই আপনার। আপনাকে আর আপনার বাসা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছি। আপনার ছেলেকে সরকার ভালভাবে পুরস্কৃত করবেন।"

নন্তুর জন্যে আমার ইজ্জত অনেক বেড়ে গেল। মাইনে বেড়ে গেল ত্রিশ টাকা। নন্তু টাকা পেলে, মেডেল পেলে, সার্টিফিকেট পেলে। কিন্তু আমার মেয়ের গা ময় বিশ্রী ঘা দেখা দিলে। তখন আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না কোথাও।

আরও তিন মাস পরে ধরা পড়ল আমার মেয়ে ছ' মাস গর্ভবতী। তারপর—

আমরা পাড়া ছাড়লাম। আর আমার নন্তু সেই যে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে আজও তার পাত্তা নেই।

অব্যর্থ কবচ

মোহিনীমোহন কামিনীকুমার অবলারঞ্জন এই রকমের একটি নাম হলেই মানাতো ভাল। তা' নয় একেবারে বগলাপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার। শান্তিপুরে জরিপাড় ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবি কোঁচানো উড়ানি দিয়ে দেহ-যষ্টিখানি মণ্ডিত। ভয় হয় ঠোকাঠুকি লাগলে এখনই হয়ত ওখানি ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়বে কিংবা ঝড় উঠলে উড়িয়ে নিয়ে যাবে অসীম শূন্যে।

ডান হাতখানি সামনে পেতে দিয়ে একান্ত লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—"সময়টা ভয়ানক খারাপ যাচ্ছে স্যার।"

হাতখানি টেনে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম। দেখলাম কনিষ্ঠা আর অনামিকার দু'টি আংটি। কনিষ্ঠার আংটিতে একখানি লাল টকটকে পাথর বসানো, অনামিকার আংটির ওপর এক ইঞ্চি চওড়া আধ ইঞ্চি লম্বা একখানি পাত। তার ওপর সবুজ রঙে মিনা করা রয়েছে 'মধুমালতী'। মিনিট তিনেক পরে হাতখানি ছেড়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ঘোষ দস্তিদারবাবু, "কি রকম দেখলেন স্যার?"

যেন তন্দ্রা ছুটে গেল আমার। বললাম, "এ্যা—কি দেখলাম?" বলে আবার হাতখানি টেনে নিলাম। তারপর হাতের রেখাগুলির ওপর নজর রেখে একখানা কাগজে গোটা কতক সংখ্যা লিখে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করলাম কিছুক্ষণ একমনে। শেষে মুখ তুলে বললাম—"আপনার অষ্টমস্থিত রাহু দ্বাদশস্থিত শনির সঙ্গে গৃহ পরিবর্তন করায় আশাভঙ্গ মনস্তাপ এই যোগ প্রবল হয়ে উঠেছে, আর পঞ্চমস্থিত কেতু সপ্তমস্থিত মঙ্গলের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ায় এ সময় বদনাম বিবাদ অর্থক্ষতি হওয়া সম্ভব। আর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য চন্দ্রের ওপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করার দরুন আপনার প্রাণের চেয়ে যা' প্রিয় তা' হাতে পেয়েও হয়ত হারাতে হতে পারে। আর—"

আর কিছু বলতে হোল না। ভদ্রলোক ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন। অর্থাৎ আমার গণনা নির্ভুল—রাহু মঙ্গল শনি কেতু ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে। ঘা দিয়েছে তাঁর বুকের ভেতরের দগদগে ঘা-খানার ওপর। মনে তিনি অসহ্য রকমের প্রেমে পড়ে গেছেন। গল্প-উপন্যাসে যেমন লেখা হয় হুবহু সেই রকম দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। তাঁর প্রেমের পাত্রীটি যথানিয়মে অন্য একজনের প্রেমে পড়েছেন।

বুঝিয়ে বললাম তাঁকে—"এর জন্যে মন খারাপ করার কোনও মানে হয় না। প্রেমে পড়বার মত উপযুক্ত পাত্রীর অভাব নেই দেশে। দেখে শুনে অন্য একজনের প্রেমে ফের পড়ে যান, তাহলেই লেঠা চুকে যাবে।"

আমার সদুপদেশ তাঁর কানে ঢুকল না। পা চেপে ধরতে এলেন। একটা উপায় করে দিতেই হবে—নয়ত—নয়ত—তিনি আত্মহত্যা করবেন।

অতএব শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম করবার জন্যে ফর্দ করতে হোল। সবসুদ্ধ উনত্রিশ টাকা চোদ্দ আনা খরচ হবে। তার ওপর দক্ষিণা আছে। বগলাপ্রসাদবাবু শান্ত হলেন। নগদ পঁয়ত্রিশটি টাকা গুণে দিলেন। সাত দিন পরে এসে আমার অতি বিখ্যাত মহাপুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রাণ-মোহিনী কবচটি নিয়ে যেতে বললাম। কবচ ধারণের পর তিন দিনের ভেতর প্রত্যক্ষ ফল পাবেন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসিমুখে বিদায় নিলেন তিনি।

সকালেই দমকা রোজগার। উঠে গেলাম বাড়ির ভেতর। গৃহিণীর হাতে টাকাগুলি দিয়ে বললাম, "এখনই একবার বাজারে পাঠাও সুরেনকে। দশটা বাজেনি এখনও। বড় বড় বাগদা চিংড়ি আর দই আসুক। চিংড়ির মালাইকারি বানাও আর তার সঙ্গে—"

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি—"আর তার সঙ্গে দুটো হাতির মুড়ো দিয়ে মুড়িঘণ্ট! ও টাকা নেওয়া চলবে না! কালই ফিরিয়ে দিয়ে আসব মালতীদিকে। সন্তবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দু' হাতে টাকা উড়োচ্ছেন। তা' বলে সব জেনে শুনে আমরা ও টাকা খাই কি করে।"

"তার মানে! ঐ ভদ্রলোককে চেন নাকি তুমি?"

চেনেন। বেশ ভাল করেই চেনেন বগলাপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদারকে আমার গৃহিণী। ওঁর বাপের বাড়ির তিনখানা বাড়ির পরের বাড়িতে থাকেন মালতীদিরা। অর্থাৎ সেই বাড়ির মেয়ে তিনি। তাঁরই স্বামী হচ্ছেন শ্রীবগলা-প্রসাদ ঘোষ দস্তিদার। পদ্মপুকুরে মস্ত বাড়ি আছে তাঁর। ভাল চাকরিও করেন কোথায়। কিন্তু মাথায় আছে ছিট। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করবেন। বউ লুকিয়ে চিঠি লিখবে, পরস্ত্রীর মত লুকিয়ে দেখা করবে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় সিনেমায় লেকে মাঠে ময়দানে। লুকিয়ে ওর সঙ্গে পালিয়ে যাবে। এই সমস্ত করতে রাজী না হলেই গণ্ডগোল। নিশ্চয়ই বউ অপর কারও সঙ্গে প্রেম করছে। তখন আত্মহত্যা করতে ছুটবেন ভদ্রলোক।

বললাম—"কিন্তু উনি যে বললেন—অন্য কার সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। কি নামটা যেন বেশ—মধু—মধু।" ঠোঁট উল্‌টে গৃহিণী জবাব দিলেন—"যত সব আদিখ্যেতা। নাম ছিল শুধু মালতী। সন্তবাবু মধু লাগিয়ে নিয়েছেন। নিয়ে একেবারে বিষ করে তুলেছেন। মাথা খারাপ বলছি না ভদ্রলোকের!"

মাত্র মাস দুয়েক সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রাজজ্যোতিষী হয়ে বসেছি। সকাল বেলার প্রথম খদ্দেরের টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হবে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু নিজের ঘরে তো আর মহাপুরশ্চরণ সিদ্ধ রাজবশীকরণ কবচ টাঙিয়ে রাখিনি। মুখ বুঁজে ফিরে গিয়ে বসলাম তাকিয়া ঠেস দিয়ে তক্তপোশের ওপর নতুন খদ্দেরের আশায়। সন্তবাবু না বগলাপ্রসাদ সকালবেলার বউনিটাই খারাপ করে দিয়ে গেলেন সেদিন।

দিন তিনেক পরে। দুপুর বেলা ঘুমচ্ছি। গৃহিণী ঠেলে তুললেন। তাঁর মালতীদি এসেছেন।

চোখে মুখে জল দিয়ে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিচে নেমে গেলাম। বেশ স্বাস্থ্যবতী এক ভদ্রমহিলা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। বয়স ত্রিশের ভেতর, মাজাঘষা গায়ের রঙ, সাজ-পোষাক সুরুচির পরিচয় দেয়।

শুনলাম তাঁর স্বামী বগলাপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদারের বাতিকের ইতিহাস। সাত বছর বিয়ে হয়েছে ওঁদের। প্রথম দিকে কিছুতেই স্ত্রীকে নিজের কাছে আনতে চাননি বগলাপ্রসাদ। তখন বাতিক ছিল সাংঘাতিক ধরনের। অর্দ্ধেক রাত্রে লুকিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতেন। পাঁচিল টপকে বা ছাতের জলপড়া নল বেয়ে বাড়িতে ঢুকতেন। নিজের স্ত্রীকে ফুসলিয়ে বাড়ির বার করে আনতে চাইতেন। লুকিয়ে চিঠি পাঠাতেন। তাতে লেখা থাকত রাত দুটোর পর যেন অমুক জায়গায় সাদা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর মধুমালতী। আরও হরেক রকমের ফ্যাসাদ। একবার শেষ রাত্রের দিকে যখন তিনি শ্বশুরবাড়ির পাঁচিল টপকাচ্ছিলেন—তখন পাড়ার ছেলেরা ধরে ঠেঙিয়ে প্রায় ঠাণ্ডা করে ফেলেছিল। শেষে তাঁর শ্বশুর জোর করে মেয়ে পাঠিয়ে দেন।

স্বামীর কাছে এসেও মালতীদি শান্তি পেলেন না। বগলাপ্রসাদের বাতিক আরও বেড়ে গেল।

স্বামীর মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে কিছুই করতে বাকী রাখেননি মালতীদি। মাথার সিঁদুর মুছে ফেলে কলেজের মেয়ে সেজে রাত নটার সময় লেকের ধারে গিয়ে লুকিয়ে থেকেছেন। হাসপাতালের নার্স সেজে সিনেমায় গিয়ে বসেছেন বগলাবাবুর পাশে। একলা পুরী পালিয়ে গেছেন যাতে দু'দিন পরে বগলাবাবু সেখানে গিয়ে সমুদ্রের ধারে তাঁকে হঠাৎ ধরে ফেলবার সুযোগ পান।' এক বাড়িতে থেকেও দশ-পনেরো দিন লুকিয়ে কাটিয়েছেন যাতে বগলাবাবু তাঁকে খুঁজে না পাবার দুঃখটা চেখে চেখে ভোগ করতে পারেন। কিম্ভূতকিমাকার সব প্রেমপত্রের জবাব দিয়েছেন, মান অভিমান ঝগড়াঝাটি যে কত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কিছুতেই বাতিক কমছে না, যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে। আজকাল নতুন এক খেয়াল চেপেছে মাথায়। শিলং যেতে হবে। সেখানে মালতীদি হবেন লাবণ্য। নিজে অমিত রায় হয়ে নতুন রকমের প্রেম করে আসবেন কিছুদিন বগলাবাবু।

মালতীদি চোখ মুছতে লাগলেন। প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তাঁর। বাস্তবিক কোনও মেয়ে কখনও এই রকমের বিপদে পড়েছে বলে শুনিনি।

ওঁকে শান্ত করে ফেরত পাঠালাম। বলে দিলাম আমার কাছে তিনি এসেছেন একথা যেন কিছুতেই টের না পান তাঁর স্বামী। কিছু একটা উপায় করবই আমি যাতে তাঁর অশান্তি দূর হয়।

বগলাবাবু যথাসময়ে কবচ নিতে এলেন। কবচ দেবার আগে তাঁকে দিয়ে কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম। তিনি যাকে চান তাকে যদি হাতের মুঠোয় পান তা' হলে কোনও মতেই তার কথার অবাধ্য হওয়া চলবে না। তাকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মত ঘর সংসার করতে হবে। কখনও আর তার সঙ্গে কোনও রকম প্রেমের খেলা খেলবেন না। তাকে কোনও রকম সন্দেহ করতে পারবেন না।

এমনি ধরনের আরও গোটাকয়েক প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে তারপর ঝাড়া আধঘণ্টা দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। তাঁকে বোঝালাম, প্রেম জিনিসটা বিয়ের পরে একেবারে অচল। বিয়ের পরে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম চালালে স্ত্রীর মাথা বিগড়ে যায়। যতক্ষণ নিজের জিনিস না হচ্ছে ততক্ষণই প্রেম খোশামুদি মান অভিমান চালাতে হয়। বিয়ে ফুরালে ছাঁদনাতলার সঙ্গে কি সম্পর্ক? সুতরাং বার বার সাবধান করে দিলাম আমার কবচ ধারণ করবার পর তিনি যেন আর প্রেম-ট্রেম না করেন। কারণ কবচ আমার অব্যর্থ। কবচের গুণেই সব ফল পাবেন। যাকে ভালবাসেন তাকে নিজের স্ত্রীরূপেই পাবেন নির্ঘাত।

আবার দশটি টাকা প্রণামী দিয়ে তিনি খুশি মনে কবচ পরে বিদায় হলেন।

মাস দুই পরে আমার গৃহিণীই একদিন বললেন যে বগলাবাবু একেবারে বদলে গেছেন। যেমন চলা উচিত তেমনি চলছে ওঁদের সংসার। মালতীদি শান্তি পেয়েছেন এতদিন পরে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এক ভরির এক ছড়া সোনার হারও পাঠালেন তিনি আমার কন্যার অন্নপ্রাশনে। স্ত্রীকে বললাম—দেখলে তো, আমার কবচ অব্যর্থ কিনা। হাতে হাতে ফল পেলেন তোমার মালতীদি।

হাতে হাতে ফল পাবার আরও কিছু বাকি ছিল তখনও।

একদিন দুপুরে ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল। গৃহিণী প্রবল উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন—শিগ্‌গির নিচে চল, মালতীদি এসেছেন। সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ছুটলাম নিচে। মালতীদি দাঁড়িয়ে আছেন। ভয় পেয়ে গেলাম তাঁর চেহারার অবস্থা দেখে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কয়েকদিন ওঁর গলা দিয়ে জল নামেনি।

আমাকে দেখে তিনি আকুল হয়ে উঠলেন।

"বলতে পারেন কোথায় গেছে ওরা ?"

"কে ? কাদের কথা বলছেন ?"

বগলাবাবুর স্ত্রী ডুকরে কেঁদে উঠলেন—"বলুন, দয়া করে বলে দিন আমায় —কোথায় গেছে সে। আমি নিজে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনবো। সে যা' চায় আমি তাই হব। যা' করলে সে খুশি আমি তাই করব। শুধু সে ফিরে আসুক। আর আমি পারি না লোকের গঞ্জনা সইতে—"

আর তিনি বলতেই পারলেন না। বললেন আমার গৃহিণী। পাঁচদিন বগলাবাবু নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে লোকটি মালতীদির ছোট বোন হেনা। মেয়েটি কলেজে পড়ছিল। অনেকদিন চলছিল ব্যাপারটা। মালতীদিকে সাবধানও করছিলেন অনেকে। তিনি বিশ্বাস করেননি। ইদানীং বাড়িতে বগলাবাবু স্ত্রীর সঙ্গে যে ব্যবহার চালাচ্ছিলেন তা' শুধু আদর্শ পত্নীগত প্রাণ স্বামীর পক্ষেই সম্ভব। এতটুকু খুঁত ধরবার মত কোনও কিছুই ছিল না তাতে। বিশেষতঃ হেনা তো সেদিনের মেয়ে। শেষ পর্যন্ত হেনাকে নিয়ে উধাও হবেন এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। কিন্তু এখন তিনি লজ্জায় যে আর মুখ দেখাতে পারছেন না। তাঁর বাপের বাড়ির সবাই আর শ্বশুরবাড়ির এঁরা তাঁকেই দায়ী করেছেন এই কুৎসিত ব্যাপারটার জন্যে।

আমি তখন ভাবছি কোথায় আমার মুখটা লুকোব। কবচের অব্যর্থ ফল ফলেছে কিন্তু নিজের গৃহিণীর কাছে মুখ দেখাব তারও উপায় নেই।

রসোত্তীর্ণ

নাম করা সাহিত্যিক অনিমেষ বসু আমার বন্ধু। তাঁর মতে জীবনটা হোল কতকগুলো ছোট গল্পের সমষ্টি। তিনি বলেন, হয় চমক লাগা, নয় চুমুক লাগানো—এই নিয়ে জীবন। তা' বলে চমক লাগালেই তা' সাহিত্য হবে না। বা চুমুক লাগালেই তা' ছোট গল্প হয়ে উঠবে না। কিন্তু দৈবাৎ যদি চুমুক লাগাতে গিয়ে চমক লাগে তখনই আরম্ভ হয় একটি ছোট গল্পের। আর সে গল্পটি সার্থক রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে ঠিক উল্টোটি ঘটলে। চমক লাগাবার মত অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও যখন সেই পরিস্থিতির সফেন পাত্রটিতে আরামসে চুমুক লাগানো চলে তখনই গল্পটি দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ কি না একটি চমক লাগানো সার্থক ছোট গল্প হয়ে ওঠে।

বন্ধুর বক্তব্য ষোল আনা মগজে ঢুকত না। নাম করা সাহিত্যিক মানুষ, যা' বলে তা' হেঁয়ালির মত শোনায়। চুপ করে থাকতাম। সহজ কথা সোজাভাবে বললে সাহিত্য হয় না, একটু বোঝার মত বুদ্ধি আমার মগজে আছে।

আছে বলেই আজ শোনাতে বসেছি আমার জীবনের দু'টি ঘটনা। চুমুক লাগাতে গিয়ে চমক লাগা ঠিক দু'টিবার ঘটেছে আমার জীবনে। পর পর দু'টি কাহিনীই শোনাচ্ছি। তবে সহজ কথা আমি সহজভাবেই বলব। কাজেই সাহিত্য হবে না নিশ্চয়ই, সার্থক ছোক গল্প হয়ে দাঁড়াবে কি না সে বিচার পাঠকের, আমার নয়।

প্রথম কাহিনীটি একেবারে ছোটস্য ছোট অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার। স্রেফ 'ফুললো আর মল' গোছের আখ্যান।

কবিদের ভাষায় 'চৈতী দুপুরের উদাস করা' হাওয়া বইছে। ব্যারাকপুর থেকে বাসে চড়ে পৌনে একশ জন সহযাত্রীর সঙ্গে পৌঁছলাম শ্যামবাজারের মোড়ে। বাসের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম এক সরবতের দোকানে। ঠাণ্ডা গেলাসটি হাতে পেয়ে আয়েসে দু' চোখ বুঁজে এল।

দিলাম একটি চুমুক। সঙ্গে সঙ্গে ফরফর করে উঠল মুখের মধ্যে। পরবর্তী ক্রিয়াটিও ঘটল টেবিলের উপরেই। একটা উচ্চিংড়ে এক লাফে উধাও হয়ে গেল। বরফ পেটা-মুগুর হাতে নিয়ে তেড়ে এল দোকানদার। পয়সা ক'টি গুণে দিয়ে সুড় সুড় করে সরে পড়লাম।

এইখানেই প্রথম কাহিনীর পূর্ণচ্ছেদ। এ যদি গল্প হয় তবে এর চেয়ে ছোট গল্প যে আর হতেই পারে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু রসোত্তীর্ণ হোল কি না সেইটকুই দুর্ভাবনা। অযথা প্রাণী হত্যাটা হোল না এই যা' একমাত্র রসের ব্যাপার এর মধ্যে। উচ্চিংড়েটা নিরাপদে সরবতের টক-মিষ্টি রস থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এটি অবশ্য একটি রসোত্তীর্ণ ঘটনা।

এবার দ্বিতীযটি বলছি। এটি কিন্তু মাপে ঠিক অতটা ছোট নয়।

ঠিক আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ তখন। শান্তিপুর এসে ঢুকছে নৈহাটী প্লাটফরমে। দুর দুর করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামছি। আরও অনেকে এইভাবে নামছেন। ধাক্কাধাক্কি একটু হয়ই। সদ্য টিকিট কিনে দশ টাকার নোট ভাঙানো টাকা-পয়সা-টিকিট ছিল মুঠোর মধ্যে। নামতে নামতেই মনি-ব্যাগ বার করে সেগুলো পুরে ফেললাম। ব্যাগটা পকেটে ফেলে দৌড়ে গিয়ে ধরলাম একটা হাতল। পিছনে 'চা গরম' হাঁক দিলে। ঘাড় ফিরিয়ে এক ভাঁড় দিতে বলে ঠেলে উঠলাম গাড়িতে। ততক্ষণে ভাঁড় বাড়িয়ে ধরেছে নাকের ডগায়। এক হাতে ভাঁড় ধরেই লাগালাম একটি চুমুক। লাগাতেই হবে, নয়ত চল্‌কে পড়বে যে নিজের গায়েই। আর এক হাত ঢোকালাম পকেটে। পরমুহূর্তেই এ-পকেট ও-পকেট সবকটা পকেট টিপে দেখলাম। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে গেল মাথার তালু থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। কয়েকটি মুহূর্ত বোধ হয় হুঁশ হারিয়েছিলাম। তার পরই টের পেলাম শান্তিপুর চলতে শুরু করেছে। চাওয়ালা ঝুলছে হাতল ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে খোলা দরজা দিয়ে এক লাফ। টাল সামলে দাঁড়াতেই নজর পড়ল চাওয়ালার মুখের ওপর।

আর একবার দুই হাত ঢোকালাম সব ক'টা পকেটে। চাওয়ালা ভেইয়া অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলে—"লে গিয়া" ?

জবাব আমায় দিতে হোল না। বিলীয়মান শান্তিপুরের দিকে চেয়ে বললে—"শালা...বাচ্চা"। বলে আবার পূর্ণ করলে আর একটি ভাঁড়। বাড়িয়ে ধরলে আমার দিকে। "লিজিয়ে।"

তখন খেয়াল হোল, প্রায় পূর্ণ ভাঁড়টা টেনে ফেলে দিয়েছি একটু আগে—দিয়ে পাকিয়ে পড়েছিলাম প্লাটফরমের ওপর। কিন্তু আবার চা! দাম দোব কি করে।

"চা গরম" ভেইয়া হুকুম করলে—"ধর, কাল দিও পয়সা, কুছ ফিকির নেই।"

ফিকির যখন কুছ নেই তখন আবার চুমুক লাগালাম ভাঁড়ে। মগজটা সাফ হয়ে গেল। কপর্দকশূন্য অবস্থায় নৈহাটী প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে চুমুক লাগাচ্ছি। অতএব আমার ছোট গল্প দাঁড়িয়ে গেল। অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও আরামসে চুমুক লাগানো চলতে লাগল আর ভাবতে লাগলাম।

প্রথম যে কথাটি মনে উদয় হোল তা' হচ্ছে কে নিল, কখন নিল এবং কিভাবে নিল।

তারপর যে চিন্তাটি মাথায় এল তা' হচ্ছে কত নিল, কি নিল এবং নিল কেন।

তারপরই একেবারে ক্ষেপে গেলাম।

সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার। যা' গেছে তা' হারাবার—হারিয়ে বেঁচে থাকার, বেঁচে থেকে দুর্বহ জীবনটা বয়ে বেড়াবার কোনও মানে হয় না। টাকাকড়ি সোনাদানা এমন কিছু যায়নি। গোটা এগারো বারর বেশী ছিলই না ব্যাগে। কিন্তু—আর ভাবতে পারলাম না। ভাঁড়টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম।

সব মনে পড়ে গেল। হু-হু করে দু'চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল। পাঁচটি বছর—হাঁ ঠিক পাঁচ বছরই বয়ে বেড়াচ্ছি আমি ব্যাগটি বুক পকেটে।

ঠিক চিনতে পারব যদি পোয়া মাইল দূর থেকেও ব্যাগটি দেখতে পাই। শঙ্খপদ্ম মার্কা চামড়ার ব্যাগ, হাতের দাগ লেগে লেগে ওপরটা কালো হয়ে গেছে। এগার কেন, একশ এগার, এক হাজার এগার গেলেও সামলাতে পারতাম। কিন্তু ঐ ব্যাগটি—

দু'হাতে বুক চেপে ধরে মাথা হেঁট করে বসে রইলাম।

তারপর দিন পনেরো কেটে গেল। ব্যাগ কিনিনি। পয়সা-কড়ি ট্যাঁকে গুজে যাওয়া আসা করি। জীবনে আর কিনবও না কখনও মনি ব্যাগ। যা' গেছে আমার, তা' আর কখনও ফিরে পাব না।

কিন্তু ব্যাগ আমি ফিরে পেয়েছিলাম। ষোল দিনের দিন শেয়ালদা স্টেশনে ঘটল সেই ঘটনাটি। বিকেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। শান্তিপুর ছাড়ছে।

দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম পাঁচ নম্বরে। পাঁচ থেকে ছয়ে যাবার পথে বিরাট গোলমাল। "মার, মার, লাগাও শালাকো, জুতিয়ে ছিড়ে দাও শালার মুখ।" পিছনের ধাক্কার চোটে ঢুকে পড়লাম গোলমালের মধ্যে। পৌঁছে গেলাম একেবারে অকুস্থলে।

লক্কা পায়রার মত একটা ছোকরা দু'হাত মাথার ওপর তুলে চেঁচাচ্ছে।

"হাতে হাতে ধরেছি মশাই। এই ব্যাগ, এই দেখুন এই ব্যাগটি—ইনি তুলে নিয়েছিলেন আমার পকেট থেকে। হাতসুদ্ধ চেপে ধরেছি।"

তরুণীর চেয়ে কিছু বড় এক ভদ্রমহিলা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে।

হঠাৎ আমার নজর গিয়ে পড়ল ব্যাগটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিলাম ছোকরার হাত থেকে। ছোকরা আমার মুখের দিকে চাইলে, হাঁ করলে কিছু বলবার জন্যে। পরমুহূর্তেই মুখ মাথা লুকিয়ে ঢুকে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। প্রাণপণে ভিড়ের মধ্যে রাস্তা করে অন্তর্ধান করলে।

যাবতীয় মানুষ হাঁ। পুলিশ এল, স্টেশনের কর্তাদের দু'একজন এলেন।

বললাম তাঁদের যে, ব্যাগটি আমার। ঠিক পনেরো দিন আগে এই শান্তিপুরে উঠতে গিয়েই খুইয়েছিলাম। বললাম প্রমাণ আছে যে ব্যাগটি আমার। খুলে ফেলুন ভেতরের এই পাতলা চামড়াটা। সেলাই করা আছে। আমিই সেলাই করিয়েছি। ওর ভেতরে আছে একখানি ফটো। খুব ছোট্ট ফটো একখানি আছে ওর ভেতর। তাতে নাম সই করা আছে।

"কি লেখা আছে ? কি নাম ?"

একটা ঢোক গিলে বললাম—'কনক'।

অতএব ব্যাগের মধ্যে পাতলা চামড়া কেটে ওঁরা দেখলেন এবং ব্যাগ আমার হাতে দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

তারপরের ট্রেন কৃষ্ণনগর। ছ'টা চারে পাঁচ নম্বর থেকে ছাড়ে। সুতরাং হারানো ধন ফিরে পেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটলাম পাঁচ নম্বরের মুখের দিকে। কে তখন অন্য দিকে নজর দেয়।

পেছন থেকে ডাক।

"শুনছেন—শুনুন।"

পেছন ফিরতে হোল। একি! এখনও যে ওরা ঘিরে রয়েছে তাঁকে! তৎক্ষণাৎ কর্তব্যবোধ চনচনিয়ে উঠল। আমার ব্যাগ যিনি উদ্ধার করেছেন তাঁকে উদ্ধার করতে ঘুরে দাঁড়ালাম।

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা খোশামুদি ইত্যাদির পর উদ্ধারও করলাম তাঁকে। একে পকেটমার, তায় মেয়েমানুষ, সহজে ছাড়বে কেন মানুষে। যাক্ ছাড়া যখন পেলাম দু'জনে, তখন কৃষ্ণনগরও চলে গেছে। তারপর আর কোনও ট্রেন পাঁচ, ছয়, সাতে নেই। সুতরাং তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে এলাম প্লাটফরম থেকে। এক দুই তিন চারে যেতে হবে।

এ পাশের স্টেশনের সামনে পর্যন্ত ঠিক পাশে পাশে এল। একটা কিছু না বললে নেহাত খারাপ দেখায়। বললাম—"বাড়ি যাও এবার।" আর একটু

কাছে সরে এসে প্রায় চুপি চুপি বললে—"কিন্তু ওরা যে এখনও সঙ্গে আসছে।" ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় গলাটা কেঁপে উঠল। এবার আমারও নজরে পড়ল। সত্যিই কয়েকজন ওর পিছু নিয়েছে। হাসি পেল। তা' হলে এদেরও ভয়-ডর আছে। পকেট মারতে লজ্জা করে না, কিন্তু কয়েকটা গুণ্ডাকে পেছনে আসতে দেখলে ভয় করে। তবু কি করা যায়। বাধ্য হয়ে বলতে হোল—"চল, কোথায় তোমার বাসা, পৌঁছে দিচ্ছি।"

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। পাশে পাশে আমিও।

তেত্রিশ নম্বর বাস থেকে যেখানে নামলাম দু'জনে সেখানটা ঠিক কুলীন-পাড়া নয়। নেমে বললাম—"এবার তুমি একলা যেতে পারবে। আর কেউ আসছে না তোমার সঙ্গে। আমি চলি।" উল্টোদিকের বাস ধরবার জন্যে ওধারে পা বাড়ালাম। আবার একটি অনুরোধ। পকেটমারের গলায় ওভাবে অনুরোধ ফুটে ওঠা অসম্ভব।

বললে—"ঐ সামনেই আমাদের বাসা। একটিবার আসুন, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।"

বললাম—"তার মানে তোমার আপনজনেরা মেরে কেড়ে নেবে আমার কাছে যা'-কিছু আছে।"

খুব ছোট্ট একটি কথা বললে—"তা' বটে।" বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোট্ট 'তা' বটে' আমার বুকের অনেকটা ভেতরে গিয়ে পৌঁছল। তারপর দু'জনেই দিয়ে দাঁড়ালাম একটা বাড়ির সামনে। টিনের দোতলা। মানুষ গিজগিজ করছে। জ্বলছে অসংখ্য কেরোসিনের কুপি। জ্বলছে উনুন, জ্বলছে মানুষের মুখে বিড়ি। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে হঠাৎ একটি প্রশ্ন করে বসলাম আমার অগ্রবর্তিনীকে।

"পকেটমারা ব্যবসায় নামলে কেন?"

এবারও একটি ছোট্ট উত্তর পেলাম—"চলুন না, স্বচক্ষেই দেখবেন।" অতএব স্বচক্ষে দেখবার জন্যে একহাত চওড়া বারান্দা দিয়ে সব শেষের ঘরখানির দরজায় পৌঁছলাম।

"দিদি—ও দিদি—দরজা খোল।" কপাটের ওপর ঘা দিলেন আমার সঙ্গিনী। ভেতর থেকে এল মাতালের হুঙ্কার।

"ফিরেছে শালী এতক্ষণে।"

দরজাটা খুলে গেল। ধুম উদ্গিরণকারী একটা কুপি হাতে একজন টলতে টলতে বেরিয়ে এল।

"আরে—এ যে মাল সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে একেবারে! এস বাবা, ঢুকে পড় ঘরে! আমি বাবা প্রাণখোলা মানুষ, আর তুমি হলে গিয়ে আমার ভায়রা-ভাই। মানে ইনি আমার সাক্ষাৎ শ্যালী। আরে—এই কনকি, উঠে আয় না, বেরিয়ে এসে দেখ তোর বোনাইকে, সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে তোর বোন। আহা, সতীলক্ষ্মী রে আমার—এতদিন কত খোশামুদি করেছি, কত বড় লোকের ছেলেকে পটিয়ে এনেছি—তা' শ্যালী আমার মানুষের নামে আগুন হয়ে ওঠেন। হা-হা-হা-হা।"

দুলে দুলে বিকট হাসি হাসতে লাগল।

ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাক এল—"ভেতরে আয় কৃষ্ণা, আজ আর উঠতে পারছি না।"

এক ধাক্কায় মাতালটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা বললে—"আসুন ভেতরে।"

ইতস্ততঃ করছি ঢুকব কি না। হঠাৎ পেছন থেকে এক ধাক্কা।

"যাও বাবা, ঢুকে পড়। কিস্‌চ্ছু বলব না আমি। সে রকম মানুষ নই বাবা। আমার নাম হরবিলাস সান্যাল। সব শালা জানে আমার মত প্রাণ-খোলা মানুষ আর নেই।"

ধাক্কার চোটে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম কৃষ্ণার কাঁধ ধরে। পেছন থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে মাতালটা বকতে লাগল।

"এই বসলাম বাবা পাহারা দিতে। কোন শালা বাগড়া দিতে পারবে না। কিন্তু যাবার সময় একটি পাঁটের দাম ঝেড়ে যেতে হবে বাবা, তা' আগেই বলে রাখছি। আমি হলাম বাবা এককথার মানুষ, আমার নাম—" আর কানে গেল না মাতালের প্রলাপ। সামনের অন্ধকার কোণ থেকে কে বললে—"কে এসেছে রে তোর সঙ্গে কৃষ্ণা?"

"এক ভদ্রলোক এসেছেন দিদি। গুণ্ডারা আমার পেছনে লেগেছিল। তাই দয়া করে পৌঁছে দিতে এসেছেন।"

"কিন্তু আলো নেই যে। আলোটা তো নিয়ে গেল। একটা কিছু জ্বালা।"

"দেশলাই কোথায় দিদি, একটুখানি বাতি আছে আমার বালিশের তলায়।" তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বালালাম। তাতে যা' আলো হোল, কিছুই দেখা গেল না। কৃষ্ণা মোমবাতি নিয়ে এলো। আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরালাম।

তখন দেখা গেল সব। ঘরের এককোণে একটা ময়লা বিছানা। তার ওপর বিছানার সঙ্গে মিশে পড়ে আছে একজন।

বাতি হাতে কৃষ্ণা এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

শয্যাশায়িনী অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—"বসতে দে। বসা কোথাও ভদ্রলোককে।" বলতে বলতে এ পাশে ফিরলেন। বাতির আলো পড়ল মুখের ওপর।

তারপর এই কথাগুলি হোল দু'বোনের মধ্যে।

"তোর নাকি একমাস কাজ নেই রে কৃষ্ণা? আজ বোসেদের বাড়ির ঝি এসেছিল। সে বলে গেল যে একমাস আগে বোসেদের গিন্নী কাশী চলে গেছে। তুই তো কিছু বলিসনি আমায়। তা' রোজ কোথায় যাস কাজ করতে? টাকাই বা আনছিস কোথা থেকে?"

কৃষ্ণা বলে গেল—"এই যে দিদি, তাই তো এঁকে সঙ্গে এনেছি। এঁর স্ত্রীর ছেলে হবার পর থেকে ভয়ানক অসুখ। এঁর বাড়িতেই কাজ পেয়েছি।

গুণ্ডা কয়েকটা রোজ জ্বালাতন করে আমাকে। বাবুকে বলতে নিজেই পৌঁছে দিতে এসেছেন।"

দিদি ছোট্ট একটি 'ও' বলে দুর্বল হাতখানি তুলে আঁচল দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিলে।

দিলেও সে মুখ চিনতে আমার কষ্ট হয়নি।

কনক আর কৃষ্ণা দু'বোনই বটে। এই কৃষ্ণা তখন ক্লাশ এইটে পড়ত। রাসবিহারীবাবু কনকের বিয়ে দিলেন শহুরে ছেলের সঙ্গে। পাত্র মিলে কাজ করে। মোটা রোজগার করে। হাঁ, বেশ মনে পড়ল, পাত্রের নাম ছিল হরবিলাস। হরবিলাস আর কনক এই দুই নামে কনকের ছোট মামা কবিতা ছাপিয়ে বিলোয় বিয়ের রাতে।

পকেট থেকে আবার বার করলাম মনিব্যাগটা। হাতড়ে দেখলাম কি আছে। বেশ কিছু আছে দেখলাম।

যাক্—সেই লক্কা পায়রা মার্কা ছোকরাটির রোজগার তা' হলে ভালোই হয়। মনিব্যাগটা কৃষ্ণার গায়ে ফেলে দিয়ে বললাম—"এটা তুমিই রাখ। এখন আমায় বার করে দাও ঘর থেকে।"

পাঁটের দাম আদায় হয়েছে বললে কৃষ্ণা। তার ভগিনীপতি তখন দরজা খুলে দিলে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মনিব্যাগ, মনিব্যাগের মধ্যে যে ফটোখানি লুকনো আছে, সব রেখে এলাম যার ফটো তার কাছে।

মনিব্যাগের জন্যে আর আমার মনে কোনও আক্ষেপ নেই।

মুস্কিল

একটা মুস্কিল লেগেই আছে।

কোথাও কিছু নেই, দরজায় হাতের আঙ্গুল চিমটে ভ্যা এ্যা এ্যা করতে করতে উপস্থিত হোল।

"দেখ্ দেখ্ আবার কি হোল দেখ্।"

হাতের কাজ ফেলে ছুটল সবাই। সবার আগে ছুটল ছোড়দি। ছোড়দির চেয়ে এ বাড়িতে ছুটতে পারেই বা কে?

"চিমটেছে হাত। ওমা দেখেছ, একেবারে লাল হয়ে উঠেছে আঙ্গুল। চুপ কর বদমাস বাঁদর, হাত চিমটে এসে আবার ষাঁড়ের মতন চেঁচান হচ্ছে।"

ভ্যা এ্যা এ্যা এ্যা—টানটা আরও বেড়ে গেল।

"দাঁড়া চুপ করে। ন্যাকড়া নিয়ে আসি। জলে ভিজিয়ে বেঁধে দোব," ছুটল ছোড়দি দোতলায়। পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়া আছে।

ছোড়দা বেরিয়ে এল বাইরের ঘর থেকে লাট্টুতে লেত্তি জড়াতে জড়াতে। যেন কিছুই হয়নি এইভাবে আড়চোখে একবার দেখে নিলে হাতের অবস্থাটা। তারপর বাঁ হাতে হাফ প্যাণ্টের পকেট থেকে একটি পেয়ারা বার করে প্যাণ্টের গায়েই রগড়ে মুছে বাড়িয়ে ধরলে—"নে ধর্। কিছু হয়নি। চল বাইরে লাট্টু ঘোরাবি।"

চিমটে যাওয়া হাতখানা বাড়িয়ে খপ্ করে পেয়ারাটা ধরলে। বাঁ হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে ছোড়দার পিছন পিছন টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

পুতুলের বাক্স থেকে ন্যাকড়া নিয়ে নিচে নেমে ছোড়দি দেখলে ভোঁ ভোঁ।

রান্নাঘর থেকে ঠাকুমা ডাক দিলেন: "মোচাগুলো ফেলে রেখে আবার কোথায় নাচতে গেলি সাবি। এক মিনিট যদি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে

মেয়ে। কাজ শিখবে কে? অতবড় মেয়ে অষ্টপ্রহর ছুটে বেড়ালে কাকে কাজ শেখাব আমি।"

আবার তিন লাফে রান্নাঘরে পৌঁছে গেল ছোড়দি, "ছুটে বেড়াচ্ছি বুঝি আমি? শুনতে পাও না বুঝি কানে? ওধারে হাত চিমটে যে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল ছেলে। ন্যাকড়া আনতে গেছি, জল দিয়ে বেঁধে দোব—ওমা, এসে দেখি সরে পড়েছে। এক্কেবারে ডাকাত হয়ে উঠছে দিন দিন।" বলে ছোড়দি চোখদুটো বড় বড় করে আবার বঁটিতে গিয়ে বসল।

ছোড়দির বয়সটা অবশ্য অত বড়ই বটে। সাত পেরিয়ে আটে উঠেছে এই ফাল্গুনে। জন্মতিথিতে বায়না ধরে বসল শাড়ি কিনে দিতে হবে।

মা বললেন, "চুপ কর, শাড়ি পরবার বয়স হোক আগে।" মায়ের কাছে সুবিধা হোল না। বাবার পানের কৌটাটা দিতে গিয়ে বললে, "নিচু হও তো। নিচু হও না খপ্ করে। কানে কানে একটা কথা বলে দি।"

উষানাথ নিচু হয়ে মাথাটা মেয়ের মুখের কাছে আনলেন। মেয়ের জেদকে তিনি ভয় করতেন। "টপ্ করে বল কি বলবি। অফিসের দেরি হয়ে গেল।"

মেয়ে বাপের গলা ধরে কানে কানে কি বললে। বাপ তৎক্ষণাৎ রাজী— "আচ্ছা আচ্ছা, আজই নিয়ে আসবো।"

সন্ধ্যার পরই শাড়ি এল। একখানি কমলা রঙ-এর ডুরে আর একখানি অদ্ভুত ছাপকাটা পাতলা কাপড়। বাড়িতে হাসাহাসি পড়ে গেল। উষানাথ চা খাচ্ছেন। মা বললেন, "উষা, এবার মেয়ের একটি জামাইও খুঁজে পেতে আন। অতবড় মেয়ে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াবে। আর তো ঘরে রাখা যায় না।"

বাপের কোলে মুখ লুকিয়ে মেয়ের সে কি হাসি। বাড়িসুদ্ধ সব জব্দ, দেখলে তো শাড়ি এল কি না!

সেই থেকে সকাল বিকেল ফ্রকের উপর শাড়ি সেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোড়দি। সকালে মাস্টার মশাই আসেন সে সময় ফ্রক ভিন্ন উপায় নেই। মাস্টার

মশাই গেলেই ফ্রকের উপর শাড়ি উঠবে। তারপর রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলবে, "ঠাকুমা, দাও কি কি কাজকম্ম আছে। ঝট্ করে সেরে ফেলি, আবার স্কুলের বেলা হয়ে যাবে তো।"

স্কুলে শাড়ি অচল। সুতরাং কতটুকু সময়ই বা বেচারা শাড়ি পরে ঘরকন্না করতে পায়?

কিন্তু মুস্কিল বাড়িতে পদে পদে। সন্ধ্যায় গানের মাস্টার আসেন সপ্তাহে তিন দিন। সে সময় যেখানেই থাকুক না কেন ঠিক উপস্থিত হবে। এসে ছোড়দির কোল ঘেঁষে বসে কপালের উপর নেমে আশা এক রাশ ঝাঁকড়া চুলের ভিতর দিয়ে জ্বল জ্বলে চোখে ছোড়দির আঙ্গুলগুলির দিকে চেয়ে থাকবে। হারমোনিয়ামের এক একটা রিড এক একটা আঙ্গুল দিয়ে টিপ্‌ছে ছোড়দি আর নানান রকমের আওয়াজ বেরুচ্ছে। একদিন হঠাৎ খপ্ করে গোল গোল হাত দু'খানি দিয়ে সজোরে চেপে ধরলে একসঙ্গে ছ'টা রিড। হারমোনিয়াম থেকে উৎকট আওয়াজ বেরুতে লাগল।

হৈ চৈ কাণ্ড বেধে গেল, "ছাড্ ছাড়্। ছাড়্ শিগ্‌গির পাজী।" মাস্টার মশাই হো হো করে হেসে উঠলেন। "বাঙ্‌লার ভবিষ্যৎ ফৈয়াজ খাঁ।"—হাত বাড়িয়ে তিনি কোলের উপর তুলে নিয়ে বসালেন।

"আচ্ছা এবার গাও তো মনিবাবু। ধর তো একখানা খাম্বাজ।" কুছ পরোয়া নেই। মাস্টার মশাইয়ের কোলে বসে ঘাড় উল্টে তাঁর মুখের দিয়ে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কোন্ তা?"

মাস্টার মশাই বলেন, "ধর না, ধর একখানা। যেখানা তোমার খুশি।"

ধরবে? মুখ নিচু করে তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করবে, "বল্‌লে দবা বল্।"

বাড়িসুদ্ধ হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মা হয়ত হাসবেন নিঃশব্দে। দালানে বসে ঠাকুমা সলতে পাকাতে পাকাতে হা হা করে হেসে উঠবেন। শেষে ছোড়দা উঠে আসবে পড়ার ঘর থেকে। এসেই এক ধমক্, "উঠে আয় বলছি ইুপিড্, কালোয়াতী করতে বসলো!"

কে ওঠে ? কোনদিন আরও চেপে বসে মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করবে —"আল্ একতা ?"

ছোড়দা তখন বার করবে একটা কাগজে মোড়া টফি পকেট থেকে। "দরকার নেই আর একটায়। উঠে আয়, এই ছাখ্।"

একান্ত অনিচ্ছায় উঠে যাবে টলতে টলতে। লাল কাগজে মোড়া টফিটা সঙ্গীতের চেয়ে কম মিষ্টি নয়।

স্কুল থেকে প্রাইজ নিয়ে এসেছে কুমারী সাবিত্রী মুখোপাধ্যায় : বই, বোনার সাজ-সরঞ্জামের একটা বাক্স, ছবির একখানা এলবাম, আরও কত কি। ক্লাশে উঠেছে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ছবি আঁকার জন্য প্রাইজ পেয়েছে, আবৃত্তির জন্য পেয়েছে। বইগুলি সব ছ'হাতে বুকে চেপে ধরে এনে ফেললে ঘরের মেঝেতে ঠাকুমার সামনে স্তূপাকার করে।

"দেখ ঠাকুমা দেখ, ছবিগুলো সব দেখ। কি রকম সব সুন্দর সুন্দর ছবি।" মা ঠাকুমা সবাই ঝুঁকে পড়লেন।

চুপ করে ঢুকল একটা ফাঁক দিয়ে। ঢুকে ধপ্ করে বসে পড়ল বইটইগুলোর ওপর। হা হা করে উঠল সবাই।

কিন্তু ছোড়দির কোনও বিকার নেই সব নষ্ট হোল বলে। জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলে ভাইকে। কাদায় ধূলোয় ভাল ফ্রকটা যা' তা' হয়ে গেল। সে দিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাইকে আদর হচ্ছে, "সব মনিবাবুর, সব আমাদের মনিবাবুর। জানলে মা, বড় হয়ে মনিবাবু কত সব প্রাইজ আনবে গান গেয়ে গেয়ে। দুষ্টু আমার লক্ষ্মী আমার" বলে মুখের উপর চুমার পর চুমা। নাচতে নাচতে চলে গেল কাদা ধূলো মাখা ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে। ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন, "দুধটা খেয়ে যা সাবি।" কে শোনে কার কথা, ততক্ষণে ভাইবোন সামনের পার্কে পৌঁছে গেছে।

এতকাল বাহুরের ঘরের এক কোণে দাঁড় করান থাকত সাইকেলখানা। ওটাতে এখন আর বড় একটা কেউ চড়ে না। কে চড়বে ? থার্ড ইয়ারে উঠে

এ বাড়ির বড় ছেলে সুধামাধব চিত্তরঞ্জনে গিয়ে ঢুকল। সাইকেলখানা তার কলেজে যাবার জন্য কেনা হয়েছিল। এখন পড়ে আছে। যিনি এ বাড়ির ছোড়দা তাঁর এখনও সিটে বসে প্যাডেলে পা পৌঁছায় না। তা' না পৌঁছাক, তবু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করতে করতে হিল্লী দিল্লী মেরে আসে বেণীমাধব। কিন্তু বাড়ির ছোটবাবু অর্থাৎ মনিবাবুর ভয়ে এখন সাইকেলখানা চেনে বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে টাঙিয়ে রাখতে হয়েছে। সকলের অলক্ষ্যে দেওয়াল ধরে ধরে গিয়ে ঘরে ঢুকে থেব্ড়ে বসে বন্ বন্ করে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। ক্যারর ক্যারর শব্দ হবে তাই শুনে স্ফূর্তি দেখে কে। হা হা করে হেসে হাততালি দিয়ে উঠবে। একদিন তো সাইকেলখানা ঘাড়ে পড়েছিল আর একটু হলে ! ভাগ্যি পাশের একখানা চেয়ারে ঠেকে গিয়ে আটকে যায়। নয়ত কি যে হোত সেদিন। সেই থেকেই সাইকেল চেনে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছে।

এমনই সব ব্যাপার চলছে সারাদিন বাড়িতে। গেল গেল শব্দ চারিদিকে। যতক্ষণ না ঘুমাবে ছেলে।

ছোড়দি নাম দিয়েছে রঘুডাকাত, ছোড়দা ডাকে এই ষ্টুপিড বলে। ঠাকুমা নাম রেখেছেন মনি, মা ডাকেন খোকন। বাবা বলেন এই পাজী।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা চুল। এই মাত্র আঁচড়ে পাট করে দেওয়া হোল, চক্ষু না পালটাতে যে কে সেই। সমস্ত চুল এসে কপাল ছাপিয়ে মুখের উপর ঢেউ খেলছে, দৃক্পাৎ করবার ফুরসৎ নেই সেদিকে।

ভোর হোতে না হোতেই পিছু হেঁটে চার হাতে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসবে নিচে। এসে ঠাকুমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করবে, "থাক্-মা, ও থাক্-মা !"

সাবিত্রী ঠাকুমার কাছে শোয়। ঘুম ভাঙলেও কান খাড়া করে পড়ে থাকবে বিছানায় যতক্ষণ না ছোট ভাইটি এসে ডাকছে 'থাক্ মা ও থাক্ মা' তারপর 'থোলদি থোলদি' বলতে বলতে ছোট হাত দু'খানি চাবড়াতে থাকবে বন্ধ দরজার গায়ে।

লাফ মেরে ছোড়দি নেমে পড়বে বিছানা থেকে। দরজা খুলেই সামনে রঘুডাকাত। কোলে তুলে নিয়ে ছুটবে বাড়ির পিছনের বাগানে। সকালে সর্বাগ্রে বাগানে যাওয়া চাই। ফুলগাছগুলির মাঝে ঘুরতে ঘুরতে ভাইকে গান শোনাবে—

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।"

শ্রীমান মনিমাধবের দিনের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে ছোড়দির কোলে চড়েই। কি? না ঐ পাখিটাকে ধরে দাও এখুনি। ঐ যে সজনে গাছের ডালে লম্বা লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে রামধনু রঙ-এর বড় পাখিটা, ঐটাই চাই। জোর জুলুম লাগাবে কোল থেকে নামবার জন্যে। কিন্তু ছোড়দি অত কাঁচা মেয়ে নয়। নামিয়ে দিক, আর এই সকালের ঠাণ্ডাটা লাগুক খালি পায়ে। ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে আসবে।

"চল বাড়ি যাই লক্ষ্মীটি, তোমায় এখুনি একটা পাখি তৈরী করে দোব। সুন্দর সাদা তুলোর এই এতবড পাখি।"

"না ঐ তে দাও।" কোলে বসে দু-পা সজোরে চালাতে লাগল ছোড়দির সামনে পেছনে কিন্তু তা' বলে এখন ছাড়লে চলবে না। চোখ মুখ ধুইয়ে দুধ খাইয়ে তবে ছাড়তে হবে। নয়ত পাজীকে আর ধরাই যাবে না।

কিন্তু মুস্কিলের কি আর শেষ আছে নাকি।

আজকাল কথাবার্তা এ বাড়িতে সামলে সুমলে বলতে হয়। যা' শুনবে তাই বলে বসবে যার তার সামনে একরাশ 'থ' আর 'ল' বসিয়ে বসিয়ে।

পাঁচকড়ি ডাক্তারের ওষুধে ঠাকুমার বাতের ব্যথার বিন্দুমাত্র উপশম হয়নি। ডাক্তার আবার বলছে ইনজেক্‌সন দেবে। সেই কথাই হচ্ছিল। ঠাকুমা বললেন, "দেখ বৌমা ঐ হাবাতে ডাক্তারটা এলে বোল যে কাজ নেই তার আমার চিকিৎসা করে। শিশি শিশি তেতো বিষ গেলালে। রোগী তো

যে কে সেই বরং টনটনানিটা আরও বিশগুণ বেড়ে গেছে। আবার বলে কি না ইনজেক্সন দেবে। ঝাড়ু মার ওর ইনজেক্সনের মাথায়।"

ডান হাতের সব ক'টা আঙ্গুল মুখে পুরে বসেছিল ঠাকুমার কোলে মনিবাবু। মাথা ঘুরিয়ে ঠাকুমার মুখের দিকে চেয়ে শুনে রাখলে সব কথা।

দু'ঘণ্টা পরে ডাক্তার এল। ঠাকুমা বললেন, "ছেড়ে দাও ডাক্তার আমায়। তোমার ওষুধ ইনজেক্সন সব মাথায় থাক। আমার আর চিকিৎসা করে কাজ নেই।"

কোথায় ছিল, কখন চুপি চুপি এসে ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়েছে, সজোরে বলে উঠল, 'জালু মালি ওল মাতায়' ইনজেক্সন কথাটি বাহুল্য বোধে স্রেফ বাদ দিলে।

ঠাকুমা হাত বাড়িয়ে ধরে মুখ চেপে ধরলেন। মা এসে গালে ছোট্ট একটি চড় বসিয়ে দিলেন, "হতভাগা পাজী, যা' মুখে আসে তাই বলে।"

ডাক্তার অবশ্য কিছুই বুঝলেন না। ইনজেক্সনের বাক্স গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর উমানাথ চা খেতে বসেছেন। বসে আছে ঠিক—বাপের কোলের উপর চেপে। প্রতি চামচ হালুয়া নিজের মুখে তুলে সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একটু চামচে করে মনিবাবুর মুখেও দেওয়া হচ্ছে। ঠাকুমা ডাক্তারের কথা সবিস্তারে বলতে বলতে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ কি মনে উদয় হওয়ায় বাপের কোল থেকে মনিবাবু বলে উঠল, 'জালু মালি ওল মাতায়' হো-হো শব্দে হাসির ধুম পড়ে গেল। তাতে অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন মনিবাবু। ততক্ষণে থেবড়ে বসে ডিসখানা সামনে টেনে নিয়েছে। অল্প একটু চা ঢেলে দিতেই হবে।

সবচেয়ে বড় মুস্কিল বাধল বাড়িতে। স্কুল থেকে সাঁতার শেখানো হচ্ছে। সাবিত্রী সাঁতার শিখছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে বললে: "শীত করছে।"

গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন ঠাকুমা, তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এসে মা মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। দৌড়ে এসে জাপটে ধরলে সাবিত্রীর রঘুডাকাত কিন্তু খোলদির মুখের দিকে চেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ছোড়দা ফুলগাছে জল দিচ্ছিল। সেখান থেকেই বললে, "চট্ করে শুয়ে পড় গিয়ে লেপের ভেতর ঢুকে। পিল আনছি এখনই ছুটো ডাক্তারখানা থেকে। দু' মিনিটে সব ঠিক হো জায়েগা।"

দু' মিনিটে নয়, দু' দিনে নয়, দু' সপ্তাহ পার হতে চলল, উষানাথ অফিসের ছুটি নিলেন। সুধামাধব চিত্তরঞ্জন থেকে চলে এসে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে লাগল, ডাক্তার বরফ ইনজেক্সন ওষুধ। বেণীমাধব আইসব্যাগ ধরে ঠায় বসে রইল বোনটির মাথার কাছে। ঠাকুমা উপোস দিতে লাগলেন। রাত জেগে জেগে মায়ের চোখের কোলে কালি পড়ে গেল। জ্বর চার পর্যন্ত ওঠে কিন্তু নামবার বেলা দুইয়ের নিচে কিছুতেই নামে না।

জ্বরের ঘোরে সাবিত্রী বিড় বিড় করে বকতে থাকে, "কি ডাকাত ছেলে রে বাবা, এখনই এক কাণ্ড বাধিয়েছিল আর কি।" কখনও বা চোখ বুঁজে চেঁচিয়ে ওঠে, "গেল গেল, ধর্ ধর্, পড়ল রে" আবার কখনও আস্তে আস্তে বলতে থাকে, "পাখি নিবি ভাই। আচ্ছা চল দিচ্ছি—এখুনি তোকে একটা পাখি ধানিয়ে।"

ডাক্তারের নিষেধ। জ্বরটা খারাপ জাতের, অতটুকু ছেলেকে যেন এ ঘরে আসতে দেওয়া না হয়।

না আসতে দিয়ে রাখাও দুঃসাধ্য। মাথা খুঁড়ে মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়ে চেঁচিয়ে কঁকিয়ে হাত পা ছুঁড়ে অস্থির কাণ্ড বাধাচ্ছে। ঢুকবেই সেই ঘরে। নয়ত দরজার সামানে দাঁড়িয়ে ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দেবে, "খোলদি ও-খোলদি খোলদি লে।"

আজ বাইশ দিন। রাত্রে জ্বর ছেড়ে গেছে সাবিত্রীর। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কাত হয়ে পড়ে আছে বিছানার

সাথে মিশে। বেণীমাধব একবার সকালে এসে দেখে গেছে। না আজ আর আইসব্যাগ দিতে হবে না। সে বেরিয়েছে ক্লাশের ছেলেদের কাছ থেকে স্কুলের খোঁজ খবর নিতে। আজ পনেরো দিনের বেশী স্কুল কামাই হয়েছে।

সুধামাধব ডাক্তারের বাড়ি গেছে রিপোর্ট দিতে। মা কলতলায় কাপড়-চোপড়গুলোয় সাবান দিচ্ছেন। ঠাকুমা কালীবাড়ি গেছেন চরণামৃত আনতে। উষানাথ উপরে দাড়ি কামাচ্ছেন আজ অফিসে বেরুবেন।

চুপি চুপি পা টিপে টিপে এসে ভেজান দরজাটা ঠেলে ঠাকুমার ঘরে ঢুকল মনি। ভিতরটা অন্ধকার। ভয় পেয়ে গেছে। চাপা গলায় ডাকল, "খোলাদি ও-খোলাদি।"

চমকে উঠল সাবিত্রী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হাঁ—এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মাঝখানে। ছোড়দি যে কোথায় আছে ঠিক করতে পারছে না। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়ে গেছে।

বহুকষ্টে একখানা হাত বাড়িয়ে ছোড়দি ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "আয়।" খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছোট্ট দু'হাতের মুঠিতে চেপে ধরলে। খাটের পাশে ছিল একখানা জলচৌকি পাতা। তার উপর উঠে দাঁড়াল। তারপর বহুকষ্টে ঝুলতে ঝুলতে উঠল খাটের উপর।

ছোড়দি চুপি চুপি বললে, "এ পাশে এসে শুয়ে পড়।" ছোড়দির পায়ের উপর দিয়ে ওপাশে গিয়ে কাঁথার তলায় লুকিয়ে শুয়ে পড়ল ছোড়দির বুক ঘেঁষে। ছোড়দি আবার চোখ বুঁজলে এবং ঘুমিয়েও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

সমস্ত বাড়ি থম্ থম্ করছে। পাতি পাতি করে খোঁজা হচ্ছে ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, ঠাকুমার ঠাকুর ঘর, ছাদ, বাগান এমন কি বাড়ির সব কটা খাট চৌকির নিচে পর্যন্ত।

পাছে সাবিত্রীর ঘুম ভেঙে যায় এজন্যে চুপি চুপি সব হচ্ছে। উষানাথের অফিস যাওয়া মাথায় উঠল। সুধামাধবের কপালের শির খাড়া হয়ে উঠল।

বেণীমাধব দু'পাশের সব বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, "আমাদের মনি এসেছে ?"

নিঃশব্দে মাথা খুঁড়ছেন মা, কপালটা ফুলে উঠেছে। থানায় সংবাদ দিতে যাবার জন্য সুধামাধব তৈরী।

ঠাকুমা পূজা দিয়ে ফিরলেন। সাহস করে কেউ তাঁর সামনে গেল না। উষানাথ মার সামনে থেমে গেলেন। গলা দিয়ে তাঁর শব্দ বেরুল না।

"কি গো বাড়িসুদ্ধ সব অমন চুপচাপ কেন ?" বলতে বলতে তিনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর হাতে ফুল চরণামৃত। সাবিত্রী তাঁর বিছানাতেই শুয়ে আছে কি না। ঘর অন্ধকার। খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি নিচু হয়ে সাবিত্রীর কপালে ফুল বেলপাতা ছোঁয়ালেন। ছুঁইয়ে কাঁথার ভিতর হাত ঢুকিয়ে সাবিত্রীর বুকে ফুল বেলপাতা ছোঁয়াতে গিয়ে চমকে উঠলেন : "এ কি ? কে এখানে ?"

ততক্ষণে সবাই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"বৌমা ও-বৌমা শিগ্‌গির এস এধারে। এ পাজীটাকে এখানে এনে শুইয়েছ কেন ? অতবড় অসুখ, তোমাদের একটু আক্কেল নেই ?"

হুড়মুড় করে সবাই ঘরের ভেতর ঢুকল। আস্তে আস্তে কাঁথাখানা সরাতে দেখা গেল, ছোড়দির গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে এই অসময়ে অগাধে ঘুমাচ্ছে ছোড়দির রঘুডাকাত। তিন সপ্তাহের জ্বরে সাবিত্রীর শুকনো মুখখানি পরম তৃপ্তিতে উজ্জ্বল। সেও অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

আসান

বেধে গেল হুলস্থূল কাণ্ড।

অর্ধেক রাতে বাড়িসুদ্ধ মানুষ বিছানা ছেড়ে উঠে চেঁচাতে শুরু করে দিলে। জ্বালাও আলো, লে আও টর্চ, আন্ শিগ্গির লাঠি ছড়ি-ছাতা জুতো যা' পাস্ হাতের কাছে। তেতলার চিলে কোঠা যেখানে পিসিমার নাড়ুগোপাল শুয়ে ঘুমচ্ছেন এতটুকু একটু মশারির মধ্যে, সেখান থেকে শুরু করে একতলার সিঁড়ির তলার ঘুপসিকোণটুকু পর্যন্ত খোঁজা আরম্ভ হোল! নিশ্চয়ই আছে কোথাও, না থেকে যাবে কোথায় বেটা। স্পষ্ট শোনা গেছে —কেঁউ কেঁউ—কুঁই কুঁই—কাঁই কাঁই—কান্না। একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার শোনা গেছে। এক জায়গায় নয়, বাড়িময় শোনা গেছে। ভুতুড়ে কুকুর বাচ্চা, কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অথচ ঠিক কেঁদে চলেছে। বাড়িসুদ্ধ মানুষকে নাকানিচোবানি খাইয়ে ছাড়লে একেবারে।

সর্বপ্রথম শুনতে পান মা তাঁর শোবার ঘরের মধ্যে। সে ঘরের খাটে তিনি শোন ছোট ছেলে নিমু আর তার বড় বোন শান্তাকে নিয়ে। বাড়ির কর্তা শোন একলা আলাদা ঘরে। কারণ অনেক রাত পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা করেন। বড় ছেলে সুব্রত শোয় নিচে বাইরের ঘরে। আর পিসিমা শোন দুই মেয়ে আরতি আর আরাধনাকে নিয়ে। কুঁই কুঁই কান্না শুনে মার ঘুম ভেঙে যায়। তাঁর মনে হয় যে ঘরের ভেতরেই হচ্ছে আওয়াজটা। বিছানা থেকে উঠে তিনি আলো জ্বালেন। কিন্তু ইলেক্ট্রিকের আলোয় খাট আলমারির তলায় কিছুই দেখবার উপায় নেই। অগত্যা দরজা খুলে তাঁকে নিচে যেতে হয়। টর্চটা থাকে সুব্রতর কাছে। সে বেচারা সারা দিন খেটেখুটে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। মা'র ডাক শুনে উঠে সেও টর্চ নিয়ে লেগে যায় মার সঙ্গে কুকুর বাচ্চা খুঁজতে। কিন্তু তখন আরম্ভ হয় তাজ্জব কাণ্ড, একবার শোনা গেল বাচ্চাটা ডাকছে নিচের তলায়, তারপরই শোনা

গেল দোতলার বারান্দায়, তারপর—তারপর তেতলার ছাদে। মা ছেলে দু'জনে নিঃশব্দে কারও ঘুম না ভাঙিয়ে একতলা দোতলা তেতলা ঘুরতে থাকেন। শেষে লাগল এক বিষম ধাঁধা, সুব্রতর মনে হোল কেঁউ কেঁউ শব্দটা আসছে যেন পিসিমার ঘরের ভেতর থেকে। দরজার গায়ে কান পেতে সুব্রত শুনল—হাঁ ঠিকই—ঐ তো কেঁউ কেঁউ—কাঁই কাঁই—কুঁই কুঁই। আর দেরি না করে সুব্রত ধাক্কা দিতে লাগল পিসিমার দরজায়।

"দরজা খোল পিসিমা, শিগ্‌গির খোল দরজা, তোমার ঘরে কুকুর বাচ্চা ঢুকেছে।"

ঘরের ভেতর থেকে পিসিমার ঘুমে জড়ানো গলা শোনা গেল—"এ্যাঁ কি বললি?" দরজায় আরও দুটো ধাক্কা দিয়ে সুব্রত বললে—"কুকুর—কুকুর ঢুকেছে তোমার ঘরে।"

"এ্যা! কি বললি? বললি কি রে?"

আঁতকে উঠলেন পিসিমা। ধড়াস করে ঘরের ভেতর খিলটা আছড়ে পড়ল। টর্চ হাতে ঘরে ঢুকল সুব্রত, পেছনে মা, হাতে এক গাছা ছড়ি। ওরা দু'বোন আরতি আর আরাধনা মশারি থেকে বেরিয়ে বিছানার কিনারায় বসে রইল। নিচে পা দিতে সাহস হোল না ওদের। পিসিমার গলা চড়ল গিয়ে একেবারে সপ্তমে।

"কুকুর বাচ্চা, হাঁ্যারে কুকুর বাচ্চা কি রে? শোবার ঘরে কুকুর বাচ্চা? আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে যে রে! বড়ির টিন কটা আচারের হাঁড়ি সব যে ছাই মেঝেয় নামানো রয়েছে আজ। সন্ধ্যের সময় ছাদ থেকে নামিয়ে এনে আর তোলবার সময় পাইনি। কে এমন সর্বনাশ করলে রে আমার ঘরে কুকুর বাচ্চা ঢুকিয়ে দিয়ে।"

পিসিমার হায় হায়ের চোটে বাবার ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মোটা বেতের লাঠিটা হাতে নিয়ে। এ দরজার বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—

"কি ওখানে? কি খুঁজছ তোমরা? চোর না সাপ।"

পিসিমাই আগে জবাব দিলেন—"চোর সাপ হলে তো বাঁচাই যেত রে ভাই, আমার মাথা খেতে ঘরে ঢুকেছে একটা কুকুর।"

যামিনীবাবু চশমা খুলে রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। চশমা ছাড়াই উঠে এসেছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে চার হাত তফাতেও কিছু দেখা সম্ভব নয়। দরজার বাইরে থেকেই তিনি তাঁর লাঠিগাছটা বাড়িয়ে দিলেন। দিয়ে ধমক দিলেন মেয়েদের।

"এই আরতি, কোথা গেলি তোরা, ধর না লাঠিখানা। খুব সাবধান, কামড়ায় না যেন তোদের।"

ঠিক সেই সময় আবার ডাকটা শোনা গেল বারান্দার ওধারে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন যামিনীবাবু।

"এই আরাধনা, কোথা গেলি তুই। নিয়ে আয় শিগ্‌গির আমার চশমাটা। আমিই বার করছি কুকুরটাকে। নিশ্চয়ই নেহাত বাচ্চা একটা, ওটা কখনও কামড়াতে পারবে না। কোন ভয় নেই, আগে নিয়ে আয় আমার চশমাটা।"

কিন্তু চশমা আর আনতে হোল না। সুব্রতই দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। স্নানের ঘরের ওপাশের বারান্দার কোণে একখানা ছেঁড়া ছোবড়ার গদি জড় করা ছিল। তার নিচে থেকে বার হোল বাচ্চাটা। কালো কুচকুচে এতটুকু একটা কুকুর ছানা। কাঁই কাঁই—কুঁই কুঁই করে বাড়ি মাথায় করে তুললে। একটা কানে ধরে সেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে সুব্রত নিচে নেমে গেল।

পিসিমা চেঁচাতে লাগলেন—"ফেলে দিয়ে আয়, দূর করে দিয়ে আয়, এত রাতে কোথা থেকে জ্বালাতে এল আপদ।"

সদর দরজা খুলে ছুঁড়ে সেটাকে ফেলে দিলে সুব্রত রাস্তায়। করুণ একটা চীৎকার করে উঠল বাচ্চাটা। সদর দরজায় খিল এঁটে সুব্রত চলে গেল কল ঘরে হাত ধুতে।

আরও কিছুক্ষণ হৈ হৈ চলল। কি করে ওটা ঢুকল বাড়িতে? নিশ্চয়ই নরদমা দিয়ে ঢুকে পড়েছে, আরতি আর আরাধনার ধারণা, ওটা নেমে এসেছে

ছাদের ওপর থেকে। অতটুকু বাচ্চা নিশ্চয়ই বাজে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার থাবা ফসকে পড়েছে ছাদের ওপর, তারপর কখন নেমে এসেছে সিঁড়ি দিয়ে। পিসিমা বললেন—"পই পই করে বলি সন্ধ্যের পর সদরটা বন্ধ রাখতে। তা নয়, রাত দশটা পর্যন্ত দরজা হাঁ হাঁ করছে। একজন না একজন আসছে আর যাচ্ছেই। ও ঢুকেছে সদর দোর দিয়েই যেখান দিয়ে সবাই ঢোকে। এখন হোল তো, রান্না ভাঁড়ার সব যজিয়ে গেল নর্দমার কুকুরে। কর কি করবে এর বাছ বিচার।"

মা বললেন—"কাল সকালে টাটকা গঙ্গাজল আনিয়ে সব ছিটিয়ে দিলেই হবে।"

বড় মেয়ে আরতি ক্লাস ফাইভে উঠেছে। মুখ বেঁকিয়ে বললে—"তার সঙ্গে একটু টাটকা গোবর জলও।"

ভাগ্যে কথাটা পিসিমার কানে গেল না। যামিনীবাবু ধমক দিলেন সবাইকে—

"যা, যা, শুয়ে পড় গিয়ে আবার সবাই, আড়াইটে বাজল প্রায়।"

তখন আবার বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে এল। একে একে সব ঘরের আলো নিভল। পিসিমার ঘরের ভেতর থেকে ঠং ঠং ঠকাস আওয়াজ আসতে লাগল। পেতলের হামালদিস্তেয় তিনি পান ছেঁচতে বসলেন। ঘুম ভাঙলেই তাঁকে আবার নতুন করে পান মুখে দিতে হয়।

এ ঘরে এসে মা দরজা বন্ধ করলেন। খাটের ওপর ওরা দুই ভাই বোন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এত বড় ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও ওরা জানতে পারল না। জানলে আর রক্ষে ছিল নাকি! এতক্ষণে বাড়ি মাথায় করত চেঁচিয়ে। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। ওদের সামনে থেকে কুকুর ছানাটাকে বাড়ি ছাড়া করতে হলে খুনোখুনি লেগে যেত। আলো নিভিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে অন্ধকারেই মা ওদের দু'জনের মাথায় বালিশ ঠিক করে দিলেন। দিয়ে শুয়ে পড়ে মনে মনে হাসলেন। কাল সকালে উঠে যখন ভাই বোনে শুনবে

যে বাড়িতে কুকুর ছানা ঢুকেছিল অথচ ওদের জাগানো হয়নি তখন বাধবে অনর্থ কাণ্ড। কুকুর, বিড়াল, ছাগল, যার ছানাই হোক না কেন, ওদের হাত ছাড়িয়ে বাড়ির বার করে দেওয়া সহজ কথা নয়।

আর একবার সস্নেহে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মা এপাশ ফিরে চোখ বুঁজলেন। আর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার, সকাল হলেই রাজ্যের কাজ তাঁর। শ্বাস নেবারও ফুরসত পাবেন না সেই বারটা একটা পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ পরেই আবার তিনি চমকে উঠলেন। আবার সেই কুঁই কুঁই—কুঁই কুঁই। স্থির হয়ে শুয়ে কান পেতে রইলেন মা। কোথা থেকে আসছে ঐ চাপা আওয়াজটা!

বেশ অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। নিমু ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে কি খানিকটা বকে বোধ হয় পাশ ফিরলে। সঙ্গে সঙ্গে আবার কুঁই কুঁই কুঁই। এবার আর ভুল হোল না। আওয়াজটা আসছে বিছানার ভেতর থেকেই। সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমে মা আলো জ্বাললেন। সাবধানে মশারিটা তুলে ফেলে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন বিছানার দিকে। একটু পরে শান্তা পাশ ফিরল। আর সেই সঙ্গে আবার শোনা গেল কুকুর বাচ্চার কান্না। সঙ্গে সঙ্গে মা একটানে ছোট লেপখানা তুলে নিলেন ওদের গায়ের ওপর থেকে।

বেরিয়ে পড়ল কুঁই কুঁই-এর উৎপত্তি স্থান। দুই ভাই বোনের মাঝখানে বুকের কাছে রয়েছে কুকুর বাচ্চাটা। বেশ আরামেই আছে ওদের দু'জনের শরীরের চাপের মধ্যে। কিন্তু ওরা কেউ নড়ে উঠলেই সেই কুঁই কুঁই আওয়াজ করে উঠছে।

খাটের ওপর ঝুঁকে মা ভাল করে দেখলেন সব। ভাই বোনের জামা কালো পাঁকে মাখামাখি। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধও তিনি পেলেন। নরদমার পাঁক থেকে যে জীবটিকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে, এটুকু বুঝতে তাঁর একটুও কষ্ট হোল না। তখন দু'হাতে দু'জনের নড়া ধরে টেনে তুলে বসাতে গেলেন। বসবে কে, ওরা চোখও চাইলে না, গাঁই গুঁই করে আবার শুয়ে পড়তে গেল।

মা আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। মেয়ের চুলের মুঠি ধরে দিলেন দুই ঝাঁকুনি। ছেলের গালে বসিয়ে দিলেন ঠাস করে একটি ছোট্ট চড়। তাতেও ওরা কেউ চোখ চাইলে না। ছেলে শুরু করলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে। মেয়ে দু'হাতে দু'চোখ রগড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

আর তার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যেই বোধ হয় বাচ্চাটা জুড়ে দিলে কান্না।

একটা চাপা ধমক দিলেন মা—"শিগ্‌গির বল, কুকুর ছানা এল কোথা থেকে?"

হঠাৎ ঝপ্‌ করে দু'জনের গলা বন্ধ হোল। দু'জনেই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল বাচ্চাটার দিকে।

দুই চাঁটি পড়ল দু'জনের মাথায়।

"বল শিগ্‌গির কোথা থেকে আনলি ওটাকে?"

উত্তর নেই কারও মুখে। বোনটি সভয়ে একবার বাচ্চাটার দিকে একবার মা'র মুখের দিকে চাইতে লাগল। ভাইটি কি ভেবে খপ করে বাচ্চাটাকে ধরে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ছোট সার্ট দিয়ে চাপা দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

আবার গর্জন করে উঠলেন মা—"কখন আনলি ওটাকে?" বলে মেয়ের মুখের কাছে চড় তুললেন।

খুব গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে ভাই বললে—"ওল নেই, এতা আমাল, আমি আনি।"

সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরে ভেংচে উঠল বোন—"আ-হা-হা আল্লাদে ছেলে, ওটা আমার, আমি এনেছি। ঐ দেখ নেজটা সাদা। তোরটার কালো লেজ, সেটা পালিয়েছে।"

চট করে নিজের জামাটা তুলে নিমু একবার দেখে নিলে বাচ্চাটাকে।

দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সত্যিই লেজটা সাদা। কিন্তু তা' বলে হাতেরটা তো আর হাতছাড়া করা যায় না। আরও জোরে বাচ্চাটাকে চেপে ধরলে নিজের পেটের সঙ্গে।

আবার একটা ধমক দিলেন মা—"বল শিগ্গির, কখন আনলি ও ছুটোকে ?" জবাব দেবার জন্যে মেয়ে একবার হাঁ করলে। হাঁ করেই আবার টপ্ করে মুখ বুঁজে ফেললে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

ছেলে বেপরোয়া। গম্ভীর ভাবে বললে—"মাস্ত।"

চোখ কুঁচকে মা বললেন—"মাস্ত, নিকুচি করেছে তোর মাস্তর। নরদমা থেকে কুকুর এনে বিছানায় তুলে এখন মাস্ত করা হচ্ছে। দাঁড়া আজ তোদেরই একদিন না আমারই একদিন।"

বলে তিনি আবার দরজার খিল খুলে বেরিয়ে বারন্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন, "সুবো, এই সুবো।"

সুব্রত উঠে এল ওপরে, আরতি আর আরাধনা বেরিয়ে এল পিসিমার ঘর থেকে। ছেঁচা পানটুকু মুখে দিয়ে পিসিমাও এলেন। যামিনীবাবু এবার চশমা চোখে দিয়েই এলেন। সবাই এসে দাঁড়ালেন খাটের সামনে। শান্তা আর কিছুতে মাথা তুলতে পারে না। নিমু তখন প্রাণপণে চেপে ধরে আছে বাচ্চাটাকে নিজের কোলে আর বড় বড় চোখের কাতর দৃষ্টি সকলের মুখের ওপর ফেলে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে কুকুর বাচ্চা টাচ্চা নয় শুধু মাস্ত। তার মত মাস্ত, তাকেও সকলে কোলে নিয়ে আদর করে মাস্ত বলে, এও ঠিক—তাই। ভয় পাবার মত বা বাড়িসুদ্ধ সকলের বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকবার মত কোনও ব্যাপার হয়নি।

মাস্ত কিন্তু কাঁই কুঁই করে প্রবল প্রতিবাদ করেই চলেছে। অর্থাৎ সে বোঝাতে চায় যে সে মাস্ত ফাস্ত কিছুই নয়, একটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা মাত্র। নরদমার পাঁকেই বেশ ছিল, এখানে খাট গদির ওপর নিমুর কোলে উঠে আদর খাওয়া তার ঠিক পোষাচ্ছে না।

অবশেষে মাস্তর মতেই সকলে মত দিলে। সুব্রত তার একটা কান ধরে এক হেঁচকায় ছিনিয়ে নিলে নিমুর কোল থেকে। নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দোতলার বারন্দায় দাঁড়িয়েই সজোরে ছুঁড়লে সেটাকে। পাঁচিল

টপকে ওপাশের মাঠে গিয়ে পড়ল বাচ্চাটা। একবার মাত্র বড় করুণ একটা আওয়াজ হোল। তারপর নিস্তব্ধ।

হায় হায় করে উঠলেন মা—"আহা হা, মেরে ফেললি রে, মেরে ফেললি বাচ্চাটাকে।"

বাইরে থেকেই একটা ধমক দিলে সুব্রত—"গোল্লায় যাক্, আদ্দেক রাতে বার বার ঘুম থেকে তোল কেন আমায়।" বলতে বলতে দুমদাম করে পা ফেলে নিচে নেমে গেল।

পিসিমা বললেন—"মরতে বয়ে গেছে ওর। কুকুর ছানা আবার মরে সহজে, তোমারও যত আদিখ্যেতা বউ। নাও এখন কি করবে কর। বিছানা মাদুর সব পাঁক মাখামাখি। ছেলে মেয়ের দিকে তো চাওয়াই যায় না, যেন সদ্য উঠে এল নরদমা থেকে।"

যামিনীবাবু হুকুম দিলেন—"এই আরতি, তোরা দু'বোনে গিয়ে জল গরম করে আন। আগে ওদের দু'জনকে নাওয়ান হোক। কি জানি, কত রকমের ব্যাসিলারী আছে ঐ পাঁকে।"

আরতি বললে—"নাওয়াবার আগে লাগাতে হয় দু'জনকে বেত। পাজী চোর কোথাকার। চোরের মত লুকিয়ে আনছে নরদমার কুকুর বিছানায়।"

আরাধনা অতি সংক্ষেপে বললে—"ওদের দু'টোকেও দাদা অমনি নড়া ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেত তো আপদ যেত।"

বলে ওরা দু'বোন নিচে জল গরম করতে গেল। পিসিমা গেলেন নিজের ঘরে। যামিনীবাবু তখন এগিয়ে গেলেন বিছানার দিকে।

মা বললেন—"আহা হা, তুমি আবার ছুঁও না ওদের। দাঁড়াও আগে স্নান করিয়ে দি।"

কথাটা তিনি কানেও তুললেন না। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—"কই, উঠে আয় তোরা। জামা খুলে দি। ও রকম করে বসে আছিস কেন?"

এতক্ষণ পরে একজনের কাছ থেকে স্নেহের আহ্বান শুনে শান্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিমু এবার মুখ খোলবার ফুরসত পেলে। ছোট ছোট দু'খানি হাত উল্‌টে বললে—"বাবা, মাস্তু, ছুঁয়ে দিলে—দাদা" বলে বাইরের বারান্দার দিকে হাত দু'খানা ছুঁড়ে দেখিয়ে দিলে। হঠাৎ কি হোল কে জানে, ছেলের বলবার ঢঙ্ দেখে বা তার অদ্ভুত গলার আওয়াজ শুনে মা আর থাকতে পারলেন না। টপ্ করে দু'হাতে সেই পাঁক মাখা ছেলেকেই বুকে তুলে নিয়ে বললেন—"না বাবা, ও কুকুর নিতে নেই। সকাল হোক, তোমায় একটা ভাল কুকুর এনে দোব।"

মার মুখের দিকে চেয়ে নিমু বললে—"নেই, মরে গেল, কানছে।" ছেলের অস্বাভাবিক চাউনির দিকে চেয়ে মার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল। ততক্ষণ শান্তাকে যামিনীবাবু বোঝাচ্ছেন যে তাঁর অফিসের বড় সাহেবের কুকুর ছ'টা বাচ্চা দিয়েছে, তার দুটো তিনি কালই এনে দেবেন দুই ভাইবোনকে। এই এত টুকু টুকু লাল লাল বাচ্চা, গায়ে থোবা থোবা লোম।

তারপর গরম জল এল, সাবান এল। বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় মশারি সব খুলে ফেলা হোল। ওদের ভাই বোনকে স্নান করান হোল। রাত প্রায় শেষ হয়েই গেল। শান্তা বা নিমু মুখ বুঁজে সব কিছু সহ্য করলে। শুধু মনে হোল বোনটি যেন কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। ভাইটি মাঝে মাঝে ঐ এক কথাই বলছে—"মাস্তু, নেই, মরে গেল, কানছে।"

পর দিন দশটার মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। যামিনীবাবু সুব্রত চলে গেলেন অফিসে, আরতি আরাধনা গেল স্কুলে। ওদের দুই ভাইবোনকে নাইয়ে খাইয়ে দিয়ে মা গেলেন কাল রাতের বিছানা মশারি কাচতে। পিসিমা তখনও তেতলার ঠাকুর ঘরে তাঁর নাড়ুগোপালের সেবায় ব্যস্ত। নিমু আর শান্তা দোতলার বারান্দায় বসে নিজেদের ছোট্ট ঘরকন্না নিয়ে মশগুল। তিনটে বিস্কুটের টিন বোঝাই ওদের সংসার। কি না পাওয়া

যাবে তার মধ্যে। শান্তার ছেলেমেয়েদের বিছানা মাছুর মশারি—হাঁড়ি কুড়ি পুঁতির মালা জামা কাপড় আর নিমুর একপাল জন্তু জানোয়ার। কারও হাত নেই, কারও নেই মাথাটাই, কারও বা ধড়টাই আলাদা হয়ে গেছে। তা যাক, তবু তাদের যত্ন আছে, তাদের নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো সবই যথাযথ ঠিক চলছে। হঠাৎ প্রয়োজন হয়ে পড়ল চাট্টি টাটকা ঘাসের। কারণ এবার রথের মেলা থেকে পিসিমা যে গরুটা এনে দিয়েছেন শান্তাকে, যার নিচে একটা ছোট্ট বাচ্চা পর্যন্ত ছিল, এখন অবশ্য নেই, নিমু উপড়ে নিতে গিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, সেই গরুটাকে টাটকা ঘাস জল দেওয়ার জরুরী প্রয়োজন বোধ করে বড় বোন শান্তা ছোট ভাই নিমুকে খোশামুদি করতে লাগল—"যা না ভাই। লক্ষ্মীটি, একবার নিচে গিয়ে কলতলার পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক মুঠো দুব্বো নিয়ে আয়—। পিসিমার ঠাকুরের দুব্বো আনে যেখেন থেকে। ঐ যে দরজার ওধারেই রয়েছে ভালো দুব্বো। যাবি আর আসবি। ছুটে যা। আমি ততক্ষণ কুটনোটা কুটে নি।"

বলে দু'পয়সা দামের বঁটি পায়ে করে টিপে বসে রান্না ঘর থেকে সংগ্রহ করা কপির পাতা কুচোতে লাগল।

টলতে টলতে সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গিয়ে নিমু দু'হাত দু'ধারে প্রসারিত করে শেষ বারের মত ভাল করে জিজ্ঞাসা করে নিলে—"থোলদি—এই এত ?"

শান্তা তখন ভয়ানক ব্যস্ত। ওধারে সে না চেয়েই বললে—"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে বললুম, চাট্টিখানি নিয়ে আসবি।"

তখন সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নামতে লাগল নিমু।

কুটনো কোটা হয়ে গেল, বাটনা বাটা হয়ে গেল। একটা বিস্কুটের টিন খালি করে সব কটা মাটির আর কাঠের ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় ছাড়ানো হোল তখনও না ঘাস না ঘেসেড়া। শেষে বাধ্য হয়ে উঠতে হোল শান্তাকে।

চুপি চুপি পা টিপে টিপে নেমে গেল নিচে। কলঘর থেকে কাপড় আছড়ানোর শব্দ আসছে। উঠোন পার হয়ে কলতলার পাশের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল শান্তা। কই! কোথায় নিমু? সামনের পোড়ো জায়গাটায়—শুধু দুটো ছাগল চরছে। ওপাশের বড় বাড়ির বারান্দায় রোজ যেমন ঝোলে তেমনি কাপড় ঝুলছে। ডান দিকে বাড়ির সামনের রাস্তা। তাড়াতাড়ি সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো শান্তা। না, কোনও দিকে কেউ নেই তো। ঠিক এই সময়টা রাস্তায় থাকেও না কেউ। এধারে চেঁচিয়ে যে ডাকবে তারও উপায় নেই। মা পিসিমা জানতে পারবে যে ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তা' হলেই চিত্তির। মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলোকে ঘাড়ের ওপর ফেলে শান্তা এগোলো। কোথায় গেল দুষ্টু ছেলে। একবার ধরতে পারলে এমন টান টানবে চুল ধরে শান্তা যে চোখ দিয়ে জল বার করে ছাড়বে।

কয়েকটা বাড়ি পার হতেই ওদের বাড়ির সামনের রাস্তাটুকু গেল ফুরিয়ে। এবার বড় রাস্তা, পিসিমা বলেন ঐ রাস্তা ধরে—এধারে ওধারে যেধারে যাও —সেই দিল্লী বোম্বাই পৌঁছে যাবে। ও রাস্তায় পা দিলে আর রক্ষা নেই। দিদিরা অবশ্য শুধু স্কুলেই যায় ওই রাস্তা দিয়ে। আবার ফিরেও আসে। শান্তা আর একটু বড় হলে কিন্তু ফিরবে না, শুধু চলবে চলবে আর চলবে। যতক্ষণ না পৌঁছবে গিয়ে সেই দিল্লী—দিল্লী বোম্বাই। কিন্তু সে তো হবে যখন বড় হবে, এখন গেল কোথায় ঘাস কাটতে দুষ্টুটা!

হঠাৎ পেছনে ডাক শুনতে পেল শান্তা—"খোলদি, খোলদি।"

ঝট্ করে পেছন ফিরে দেখতে পেলে, ঐ যে হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

ভাইকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল শান্তার। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল চুলের মুঠিটা ধরবার জন্যে। ভাইও থপ থপ করে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতেই ভাই বলে উঠল—"খোলদি, মাস্ত, পা" বলে ঘাড় উল্‌টে মুখ বেঁকিয়ে দেখিয়ে দিলে উল্‌টে উল্‌টে পড়ে যাচ্ছে মাস্ত।

বোন বুঝে ফেললে তৎক্ষণাৎ। বললে—"কোথায় রে? কই মাস্তু? পা ভেঙেছে বুঝি?"

বোনের হাত একখানি দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ভাই টানাটানি জুড়ে দিলে। ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল—"মাস্তু, মাস্তু, কানে।" বলে ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না দেখালে। নিজের একখানা পায়ে হাত দিয়ে বললে—"কত্তো, হাঁত্তে পায়ে না।" চোখ বড় বড করে শান্তা বললে—"পা ভেঙেছে বুঝি তাই হাঁটতে পারে না।"

ভাই বোনের চোখের দিকে চেয়ে বললে—"মাস্তু, কানে।"

বোন শুধু বললে—"চল শিগ্‌গির, কোথায় মাস্তু, নিশ্চয়ই পা ভেঙেছে।"

বড় রাস্তার ওপরেই খানচারেক বাড়ির পরে এসে দাঁড়ালো ভাই বোন। নিমু বললে—"ঐ মাস্তু, এত।" বলে দিদির হাতে টান দিলে।

দিদি একবার দেখে নিলে এধার ওধার। না কেউ নেই, কেউ দেখছেও না। দরজাটা সামান্য খোলা রয়েছে। টুপ করে একবার দেখে এলে কি হয়! আহা, কুকুর বাচ্চাটা যদি মরে যায়! আর বেশী না ভেবে ভায়ের হাত ধরে টুপ করে ঢুকে গেল সেই আধ ভেজানো দরজার ভেতর।

ঘরটার ভেতর কেমন যেন মোটর গাড়ি মোটর গাড়ি গন্ধ। পায়ের তলায় কি যেন চটচট করে উঠল। শান্তা ভাবল, যাক গে, তার চেয়ে ভাইটাকে নিয়ে পালাই এখান থেকে। ঘরের ভেতর অন্ধকার, ভাল করে কিছু দেখাও যায় না। সে চুপি চুপি বললে—"কই রে, কই তোর মাস্তু?"

ভাই বললে—"এত" বলে হাত ধরে টানতে লাগল। শেষে ওরা গিয়ে পৌঁছল ঘরের কোণে। ততক্ষণ বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সব কিছু শান্তা। হাঁ, ঐ তো রয়েছে, মরার মত পড়ে রয়েছে বাচ্চাটা গোটাকতক টিনের পাশে—এধারে একখানা মোটরের চাকাও দাঁড় করানো রয়েছে।

শান্তা তাড়াতাড়ি গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলে।

ঘড় ঘড় ঘটাং।

বিকট শব্দ শুনে দুই ভাই বোনই চমকে উঠে পিছন ফিরল। ফিরে দেখলে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরটা হয়ে গেল আরও অন্ধকার, শুধু দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসছে।

নিমু চাপা গলায় ডুকরে কেঁদে দিদিকে জড়িয়ে ধরল। দিদি ভায়ের মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বললে—"চুপ, চুপ কর।" বলে সভয়ে চেয়ে রইল বন্ধ দরজাটার দিকে।

এক রাশ ভিজে বিছানার চাদর মশারি কাঁধে নিয়ে মা তেতলার ছাদে যেতে যেতে দেখলেন দোতলার বারান্দায় জিনিসপত্র ছাড়ানো। ছেলে মেয়ে নেই। ভাবলেন ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয় ঘরের মধ্যে। নয়ত করছে চুপি চুপি একটা 'অনাচ্ছিষ্টি' কাণ্ড। ভিজে কাপড়গুলো ছাদে মেলে দিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখবেন ঘরের মধ্যে, এই ভেবে তিনি ওপরে চলে গেলেন।

ঠাকুর ঘর থেকে পিসিমা বললেন—"অনেকক্ষণ থেকে ওদেব আওয়াজ পাচ্ছিনি যে বউ, গেল কোথায় সব?"

মা বললেন—"করছে নিশ্চয়ই একটা সর্বনাশ দু'জনে নিশ্চিন্তি হয়ে। যাই দেখি গিয়ে।"

নেমে এলেন দু'জনেই নিচে। ঘরে ঘরে খুঁজলেন। একতলা দোতলা তেতলা রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর কোথাও দেখতে আর বাকি রইল না।

তখন চেঁচামেচি চীৎকার। পাড়ার লোক ছুটে এল। আধ ঘণ্টার মধ্যে যামিনীবাবু এলেন। সুব্রত এল তার মিনিট পনেরো পরে। তারপর আরম্ভ হোল তুমুল ব্যাপার।

থানা থেকে রেডিও লাগানো গাড়ি ছুটল। বড় রাস্তার ওপরে চারখানা বাড়ি পরেই থাকেন পুরন্দর বোস। পুলিশের মস্ত বড় অফিসার। পাড়ার লোক তাঁকে ফোন করে দিলে অফিসে।

দু'জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে নিজেই তিনি তাঁর গাড়ি চালিয়ে এসে পড়লেন। নানা রকম কাণ্ড করতে লাগলেন তাঁরা। মেঝের ওপর পায়ের

ছাপ নিলেন। ফটো তুললেন। পাড়াসুদ্ধ মানুষকে জিজ্ঞাসা করে করে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। পুরন্দরবাবুর স্ত্রী পুত্র কন্যাও এসে গেলেন বাড়ি থেকে। তাঁরা শান্তা নিমুর মা পিসিমাকে শান্ত করতে লাগলেন।

কিছুতেই কিছু হোল না।

শেষে এল একটা বৃহদাকার কুকুর। পুলিশের গাড়ি চেপে এল কুকুরটা।

ওপরের বারান্দায় সেই খেলনার বাক্সর সামনে নিয়ে কুকুর ছেড়ে দিলে। সেই কুকুরটাও আবার সব কটা ঘর যজালে। সব শুঁকলে, এমন কি বিছানার ওপর পর্যন্ত উঠে ওদের মাথার বালিশ শুঁকে এল। পিসিমার ঘরেরও আর কিছুই বাকি রাখলে না শুঁকতে। মুখ বুজে সবই সহ্য করলেন পিসিমা। তখনও ক্ষীণ আশা যদি কুকুরটা খুঁজে বার করতে পারে ছেলে মেয়ে দুটোকে।

সারা বাড়ি যজিয়ে কুকুর বেরুল কলতলার পাশের ছোট দরজা দিয়ে। পুরন্দরবাবু যামিনীবাবু সুব্রত পিসিমা সবাই চললেন তার পিছু পিছু। শুধু মা ওপরের ঘরে মরার মত মেঝেয় পড়ে রইলেন উপুড় হয়ে।

বাড়ির পাশে প'ড়ো জমিটায় গোটাকতক চক্কর দিয়ে কুকুর চলল রাস্তা ধরে। বড় রাস্তার মোড়ে পোঁছে বারকতক ঘুরলে মুখ নিচু করে। তারপর চলল ডান দিকে। ততক্ষণে প্রায় শ'খানেক মানুষ চলেছে কুকুরের পেছনে।

হঠাৎ থামল কুকুরটা। তারপর আরম্ভ করে দিলে লম্ফ ঝম্ফ।

পুরন্দরবাবু বললেন—"আমার বাড়ির সামনে ওরকম করছে কেন কুকুরটা।"

তাড়াতাড়ি সকলে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানে।

পুরন্দরবাবুর গ্যারেজের বন্ধ দরজার ওপর কুকুর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। পুরন্দরবাবু চীৎকার করে উঠলেন—"খোল, খোল জলদি দরজা।"

চাবি নিয়ে ছুটে এল তাঁর দরোয়ান।

চাবি খুলে দু'হাতে দুটো কপাট সজোরে ঠেলে দিলে।

বাইরের আলো আর—দু'শো জোড়া চক্ষুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গ্যারেজের মধ্যে।

একটা হুংকার দিয়ে কুকুরটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে।

প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল শান্তা।

অত-জোড়া চক্ষু এক সঙ্গে দেখতে পেলে একেবারে কোণে গোটাকতক পেট্রলের টিনের পাশে ভাইটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে শান্তা। তার চোখ মুখ ফুলে উঠেছে কাঁদতে কাঁদতে। ভাইটি বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমচ্ছিল, জেগে উঠে ভ্যাবাচাখা খেয়ে চেয়ে রইল মস্ত বড় কুকুরটার দিকে।

শান্তা দু'হাতে ভাইকে আঁকড়ে ধরে আর্তনাদ করছে।

পুরন্দরবাবু চীৎকার করে উঠলেন—"ধর, ধর শিগ্‌গির কুকুরটা।"

একজন অফিসার ছুটে গিয়ে ধরলে তাকে। কিন্তু টেনে আনে কার সাধ্য। কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ওদের ভাই বোনের ওপর।

যামিনীবাবুও ভয়ে এগুতে পারেন না সামনে। পুরন্দরবাবু বললেন—"কি আশ্চর্য! ওরকম করছে কেন কুকুরটা? দেখ তো হে কি আছে ওদের কাছে।"

একজন অফিসার এগিয়ে গিয়ে শান্তা নিমুকে টেনে তুললেন।

তখনও বিকট হুংকার দিয়ে ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় পুলিশের কুকুরটা। দু'জন লোকে তাকে টেনে রাখতে পারছে না।

পিসিমা ছুটে গিয়ে নিমুকে জাপটে ধরলেন। ধরেই তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিলেন। তখন বার হোল একটা কুকুর ছানা—নিমুর ছোট্ট সার্টটার ভেতর থেকে।

সামান্য শব্দ হোল, বাচ্চাটা পড়ল নিমুর পায়ের কাছে।

পুরন্দরবাবু বললেন—"ঐ কুকুর বাচ্চাটার জন্যেই এই কুকুরটা অমন ক্ষেপেছে।" দু'জনের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল পুলিশের কুকুরটা। গিয়ে সেই বাচ্চাটাকে শুঁকতে লাগল।

পাশেই দাঁড়িয়ে নিমু। তখনও সে বলছে—"মান্তু মান্তু।"

মান্তু কিন্তু আর নড়ল না। অনেকক্ষণ মরে গেছে সে। মরে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

পায়রা

সন ১৪০১।

শকাব্দা ১৯১৬।

চৈতন্যাব্দা ৫০৯।

সংবৎ ২০৫১।

হিজরী ১৪১৪।

পঞ্জিকার পাতায় রাষ্ট্রগত বর্ষফল পড়ে দেশসুদ্ধ লোকের মন খারাপ হয়ে গেল। লেখা আছে "জ্যোতিষ শাস্ত্রে অষ্টম স্থান হতে মৃত্যুর কারণ বা মরণের বিচার করতে বলেন। শুক্রাচার্যকে বর্তমান বর্ষে নানাপ্রকার মারণাস্ত্রের সাধনায় আমরা মগ্ন দেখবো।" এই পর্যন্ত পড়ে অনেকে কপাল কুঁচকে বললেন, "আবার জ্বালালে দেখছি ব্যাটারা।" রষ্ট্রগত বর্ষফল তারপর আর কেউ পড়লেই না। কারণ সকলেরই যথেষ্ট আস্থা ছিল আমাদের সাফল্যজনক পররাষ্ট্রনীতির ওপর। আমরা জানতাম যে কোন ব্যাটাই কিছু করতে পারবে না আমাদের।

পাঁচে পাঁচে পঁচিশটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধাক্কা সবে আমরা সামলে উঠেছি তখন। দেশের যাবতীয় নদ নদী খাল বিল মায় নালা নর্দমা পর্যন্ত বালি সিমেণ্ট পাথর আর লোহালক্কড় দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেছে। তার ফলে পাচ্ছি আমরা বিদ্যুৎ। জলবিদ্যুৎ। সে বিদ্যুতে আলো জ্বলছে আবার আগুনও জ্বলছে। জ্বললেও সে আগুনে পুড়ছে না কিছুই কারণ জলবিদ্যুৎ যে। একেবারে অহিংস আগুন।

কি পরিমাণ বিদ্যুৎ পাচ্ছি তার অঙ্ক শুনিয়ে কিছুই লাভ হবে না। অতগুলো শূন্য বসানো বিরাট সংখ্যাটা কারও মনে থাকবে না। তবে একটি কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে সে সময় আমরা সুইচের ব্যবহার একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। মাত্র একটি সুইচ ছিল তখন দেশে। সেটি ছিল আমাদের

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মশায়ের শোবার ঘরে তাঁর খাটের সঙ্গে আটকানো। তাতেই তামাম দেশের সমস্ত আলো জ্বলবে আর নিভবে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় কখনও সেই সুইচে হাত দিতেন না। আহা, জ্বলুক না। অত বিদ্যুৎ নয়ত কোন্ কাজে লাগবে। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর নিরবচ্ছিন্নভাবে তামাম দেশ জুড়ে জ্বলছে সব কটি আলো অর্থাৎ দেশ থেকে তখন অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে পেরেছি আমরা। এমন কি অজ্ঞানতার অন্ধকার পর্যন্ত বিদেয় হয়েছে প্রতিটি লোকের মনের কোণ থেকে। হয়েছে বিদ্যুতের সাহায্যে। দেশের প্রতিটি লোকের জন্যে একখানি করে বৈদ্যুতিক চেয়ার বানানো হয়েছে। মেয়ে পুরুষ খোকা খুকী সবাই দিনে একবার আর রাতে একবার মাত্র পনেরো মিনিট করে সেই চেয়ারে বসে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনের সেলগুলো ফাটতে থাকে ফুট ফাট করে। ফলে ব্রহ্মজ্ঞান থেকে যৌনজ্ঞান পর্যন্ত তাবৎ জ্ঞান আর ইলেক্‌ট্রো ইউজিনিক্স থেকে সাইকোএনালিসিস পর্যন্ত (সুপ্রজনন বিদ্যা থেকে মনঃসমীক্ষণ) সমস্ত রকম বিজ্ঞানের আলোয় মনটা একেবারে ঝলসে যায়। তার ফলে যে ছেলেটি সবে মাত্র—মায়ের বুকের দুধ ছেড়েছে সেও অনায়াসে তার আশী বছরের পিতামহের সঙ্গে মন প্রাণ খুলে দুনিয়ার যাবতীয় উচ্চাঙ্গ আর নিম্নাঙ্গ গুহ্যতত্ত্বগুলি নিয়ে আলোচনা করে পরমানন্দ লাভ করে।

কাজেই সে সময় দেশের সব কটি দৈন বা নৈশ বিদ্যালয় উঠে গেছে। মাস্টার মশায় আর দিদিমণিরা অন্য কাজে লেগেছেন। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। তুলসী বৃক্ষের নির্যাস বার করে বৈদ্যুতিক চুলায় জ্বাল দিয়ে তার বাষ্পকে আবার ঘনীভূত করে এক রকম পানীয় প্রস্তুত করছেন তাঁরা। দেশসুদ্ধ লোক সেই বিদ্যুৎগর্ভ পানীয় নারকেলের মালায় করে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় ঢালছে। চুক চুক করে চেখে চেখেও খাচ্ছে অনেকে। তার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে সমাধিস্থ থেকে পরমানন্দে কাল কাটাচ্ছে। রাস্তায় ঘাটে অলিতে গলিতে দোকান খোলা হয়েছে। তুলসী নির্যাসের দোকান। সে সব দোকানে টেবিল চেয়ার পাতা নেই। আছে কুশাসন,

মোটা মোটা আদৎ বেনারসী কুশাসন। সেই কুশ দ্বারা নির্মিত পবিত্র আসনের ওপর বসে আচমন করে পবিত্র নারকেলের মালা ভরতি পবিত্রতম তুলসী নির্যাস গল গল করে •গলায় ঢালছে লোকে আর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাৎ নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে বসে থাকছে। অর্থাৎ কিনা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দোকানগুলো উঠে গেছে। আপদ গেছে। তা' বলে চায়ের দোকানের ছেলে ছোকরারা বেকার হয়ে পড়েনি। তারা নিযুক্ত হয়েছে অন্য একটি কুটিরশিল্পে। নারকেলের শাঁস থেকে তৈল বার করে নিয়ে তার সঙ্গে চা পাতা জ্বাল দিয়ে এক রকম রঙ তৈরী করছে। সেই রঙের চাহিদা দেশে সব চেয়ে বেশী। সব কিছুই এক রঙে রঙিন করে ফেলা হচ্ছে কিনা। কারণ আমাদের টেকনিক (কৌশল) হচ্ছে সব এক করে ফেলা। ভেদাভেদ ঘুচিয়ে ফেলা। রঙ হচ্ছে গুণ, ব্রহ্মের কোন রঙ নেই তাই তিনি নির্গুণ। আমরাও নির্গুণ হবার সাধনা করছি। সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবার জন্যে নারকেল তেলে চায়ের পাতা জ্বাল দেওয়া বিশুদ্ধ উদ্ভিদজাত রঙে রঙিয়ে নেওয়া হচ্ছে সমস্তই। জুতো গাড়ি ছাতা বাড়ি হাঁড়ি কলসী লেঙট বক্ষবন্ধনী, ঠোট গাল হাত পায়ের নখ, কপালের সিন্দুর তিলক এমন কি চাঁদনী প্রথায় ধান চাষ করবার বৈদ্যুতিক লাঙ্গলগুলো পর্যন্ত। যেদিকে চাও চোখ জুড়িয়ে যায়। আহা সব এক রঙে রঙিন। চিত্ত-বিক্ষোভের আর বিন্দু-মাত্র সম্ভাবনা নেই। 'ঘুচে গেছে ভেদাভেদ—নেই আর কারও মনের খেদ' এই মহাসঙ্গীতটি সকালে বিকালে আঠাশ বার করে রেডিওতে বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে।

সব কিছুই বাজিয়ে শোনাতে হচ্ছে। কারণ চোখ চেয়ে দেখবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে আমরা কেউ প্রস্তুত নই। তার প্রয়োজনও নেই। কি দেখবে? দেখবার আছে কি এই দুনিয়ায়? সবই সেই এক এবং অদ্বিতীয়ের বিভিন্ন রূপ। তখন দিব্য চক্ষু ফুটে গেছে কি না আমাদের। সেই জন্যেই

আমাদের কর্ণে বায়ুজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও কিছু প্রবেশ করাতে হলে বাজিয়ে শোনান ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমাদের সরকার সর্বত্র চোঙ খাটিয়ে আমাদের শোনাচ্ছেন। মন্দিরে মন্দিরে, জেলে, আঁতুড় ঘরে, পায়খানায়, শ্মশানে আর শেয়ার মার্কেটে সর্বত্র চোঙ খাটানো হয়েছে। সেই সব বৈদ্যুতিক চোঙ দিয়ে থেকে থেকে বিকট চীৎকার বেরুচ্ছে—"আওয়াজ তুলুন। রামভক্ত হনুমানের প্রাত্যহিক র‍্যাশানে কলার মাত্রা বাড়াতে হবে। আওয়াজ তুলুন আরও তুলসী নির্যাসের দোকান খোলা হোক। আরও জমি চাই নয়ত কলা আর তুলসীর চাষ বাড়বে না।"

আমরাও তখন বেশ বোধ করছি যে তুলসীর চাষ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মাস্টার মশায় আর দিদিমণিরা বেকার রয়েছেন। তাঁরা কতদিন বেকার থাকবেন? আমাদের জাতীয় পানীয়টুকুতে যাতে ভেজাল দেওয়া না হয় সে জন্যে ওটা উপযুক্ত লোক দ্বারাই বানানো প্রয়োজন। দেশে ওঁরাই সব চেয়ে নির্লোভ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। কাজেই ও কাজটির ভার ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু তুলসীর চাষ আরও বাড়ানো দরকার। নয়ত চাহিদা মিটছে না আর ওঁরাও কাজ পাচ্ছেন না। এধারে আর একটি সত্ত্বগুণাসিদ্ধ অভ্যাসেও বেশ পাকাপোক্তভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা তখন। বাঁ হাতের তালুতে কিছু শুকনা তুলসীপাতা নিয়ে তার সঙ্গে একটু সাদা চন্দন দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে পেষণ করে দাঁতের গোড়ায় টিপে রাখা। বিড়ি, সিগ্রেট, হুকো, কল্‌কে, পান, জর্দা সবই তো একে একে তাড়ানো হয়েছে কি না দেশ থেকে। তুলসীর চাহিদাই সবচেয়ে বেশী। সুতরাং আওয়াজ তোলা হোল, "আরও জমি চাই।"

কিন্তু জমি কোথায়?

আমাদের সঙ্গে যাঁদের ঘোরতরসহ অস্তিত্ব বর্তমান তাঁদের অবশ্য অঢেল জমি খামকা পড়ে আছে। তাঁরা দলে দলে আমাদের দেশে এসে জুতো

সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সমস্ত রকমের পেশায় জাঁকিয়ে বসে ছাতু রুটির ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু তাহলে কি হবে, তাঁরাও আওয়াজ তুলতে জানেন। তাঁদের আওয়াজ হচ্ছে, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচগ্র মেদিনী।' আমরা হলাম কবিগুরুর দেশের লোক, আমরা তো আর সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিতে পারি না। সুতরাং আমদের একমাত্র উপায় ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া।

দক্ষিণ দিক বলতেই জমের দক্ষিণ দুয়ার মনে করে আঁৎকে উঠলে চলবে না। ভয় পাবার কিছু নয়। আর কিছু থাক না থাক আমাদের আছে বৈদ্যুতিক শক্তি, অফুরন্ত অপর্যাপ্ত। সেই বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা আমরা আমাদের দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরকে কয়েক শ' মাইল পিছিয়ে দিলাম। উঠল ডাঙা, জেগে উঠল সাগরের জল শুকিয়ে ফেলতে। তখন বৈদ্যুতিক লাঙল চালিয়ে চাঁদনী প্রথায় আরম্ভ হোল কলা আর তুলসীর চাষ। দেশ জুড়ে বৈদ্যুতিক খোল বৈদ্যুতিক খত্তাল বেজে উঠল। আর আমরা দু' হাত তুলে শ্রীধাম নবদ্বীপের প্যাটার্ণে অযোধ্যার সংকীর্তন জুড়ে দিলাম, "জয় সীয়ারাম—জয় সীয়ারাম।"

এমনি করে দেহের মনের ইহকালের পরকালের সমস্ত সমস্যাই যখন একেবারে জল হয়ে গেছে পাঁচ পাঁচে পঁচিশটি পাঁচশালা পরিকল্পনায় কল্যাণে, আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি বহুদিন কোনও 'আওয়াজ' তুলতে না পেরে, সরকারী বৈদ্যুতিক চোঙগুলো নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকতে থাকতে বোধ হয় একেবারে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছে, আমাদের প্রচার বিভাগের জিপ আর ভ্যান আর রেকর্ড আর সিনেমা দেখাবার সরঞ্জামগুলো নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, মন্ত্রীসভার প্রকাশ্য অধিবেশনে স্রেফ লুডো খেলা হচ্ছে তখন—

তখন একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত তুল্য কঁকিয়ে কেঁদে উঠল দেশের সব কটি বৈদ্যুতিক চোঙ, "আওয়াজ তুলুন, আবার আওয়াজ তুলুন।"

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম আমরা, অনেকের হস্তধৃত নারিকেল পাত্র থেকে তুলসী নির্যাস চলকে পড়ে গেল, ইলেকট্রো ইউজিনিক্স ক্লিনিকে যে সব

ডাক্তার তখন ইনজেক্‌সন দেবার জন্যে সিরিঞ্জ হাতে কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের হাত কেঁপে সিরিঞ্জের ছুঁচ ভেঙে গেল, বৈদ্যুতিক লাঙল দিয়ে চাঁদনী প্রথায় চাষ করছিল যারা, মার্গ সঙ্গীত গাইতে গাইতে তাদের গানের তাল কেটে গেল, বৈদ্যুতিক নাগরদোলায় চেপে যারা প্রেমসে ঘুরপাক খাচ্ছিল জোড়ায় জোড়ায়, চমকে উঠে ছিটকে পড়ল তারা নাগরদোলা থেকে। আরও কত কি হয়ে গেল এক সঙ্গে একই মুহূর্তে। কে তার হিসেব রাখে।

আবার আওয়াজ ? কি সেই আওয়াজ ? কিসের অভাব আর আমাদের ? কোন্ শত্রুকে ঠাণ্ডা করতে হবে ? কার এতবড় স্পর্দ্ধা হোল যে আমাদের তুষার-শুভ্র শান্তির গায়ে কলঙ্ক লেপন করতে চায় ?

তিন দিন তিন রাত সমানে তিন শ' পঁয়ষট্টিবার 'আওয়াজ তুলুন, আবার আওয়াজ তুলুন' বলে বলে আমাদের চৈতন্য সঞ্চার করে তখন বলা হোল আসল কথাটি—"অধিক পায়রা ফলাও।"

ঘোষণাটি করা হচ্ছে মূল ঘাঁটি থেকে, যেখান থেকে আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগ পরিচালিত হয়, দেশময় রেল গাড়ি চলে যাদের কৃপায়, আমাদের অহিংস সৈন্যবাহিনীকে যাঁরা খাইয়ে পরিয়ে তাজা রাখছেন। সেখান থেকে, সেই সুদূর দিল্লী থেকে আসছে ঘোষণাটি—"অধিক পায়রা ফলাও।"

ঘোষণাটি শুনে অনেকের জিহ্বায় জল এল। কারণ একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে জিহ্বা পেঁয়াজ গরম মসলা বা সরষে বাটা দিয়ে রান্না কোনও কিছুর আস্বাদন গ্রহণ করতে পারেনি। শুধু পকৌরি আর দহিবড়া খেতে খেতে যাঁরা মরমে মরেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চোঁৎ করে মুখের মধ্যে লালা টেনে ঢোক গিলে ফেললেন। অনেক বাড়ির গিন্নীরা উঠানের বঁটিখানায় আবার ধার দিতে পাঠাবেন কি না তাই ভাবতে লাগলেন।

কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হোল না। প্রচার বিভাগের জীপ আর ভ্যানগাড়ি তাড়া তাড়া ছবিওয়ালা কাগজ নিয়ে সারা দেশময় ছুটে বেড়াতে লাগল।

সবই পায়রার ছবি। বাড়ি ঘরের দেওয়াল মুড়ে দেওয়া হোল সেই সব ছবি দিয়ে। নিচে লেখা রয়েছে—"দেশের তেত্রিশ কোটি লোককে নিরানব্বুই কোটি পায়রা ফলাতে হবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে। এই হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ পরিকল্পনা। লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতেই হবে, নয়ত আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন।"

সিনেমায় দেখান হতে লাগল কি করে অধিক পায়রা ফলাতে হবে। মাঠে ঘাটে পর্দা টাঙিয়ে লোককে বোঝান আরম্ভ হোল—পায়রা ফলাবার কায়দা কানুন। বস্তা বস্তা পায়রার সার অর্থাৎ পায়রা-মটর লোকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হোল। তারপর একদিন এল ডিম—এল ডিম ফোটাবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র, এল অনেক কিছু সেই সঙ্গে। হাজার হাজার দাদা আর দিদিমণিরা কানে পায়রার পালক গুঁজে লোকের বাড়িতে গিয়ে হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়ে এলেন কি করে সেই যন্ত্র চালিয়ে ডিম ফোটাতে হয়।

দিবা রাত্র চোঙ আর্তনাদ করতে লাগল—"আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। যদি টিকে থাকতে চাও তবে কোমর বেঁধে লাগ। নিরানব্বুই কোটি পায়রা ফলাও পাঁচ বছরের মধ্যে নয়ত—"

নয়ত যে কি হবে তা' আর বলা হোল না। আমরা বুঝলাম সেটি হচ্ছে টপ সিক্রেট। অর্থাৎ মোক্ষম গুহ্যাতিগুহ্য ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত মরি বাঁচি করে আমরা পৌঁছলাম আমদের লক্ষ্যে। ফলল নিরানব্বুই কোটি নিখুঁত সাদা পায়রা। বক বকুম কুম করে যে মহানাদ উঠল আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে তাতে সাগর পারের ওদের আর হিমালয়ের ওপিঠের তাদের পেটের পিলে চমকে গেল।

ইতিমধ্যে একটু আধটু গোলমাল যে হোল না তা' নয়। কারও কারও রান্নাঘর থেকে অল্প একটু আধটু ঘি গরম মসলার গন্ধ বেরুল। কোনও কোনও বাড়ির আস্তাকুঁড়ে পাওয়া গেল সরু সরু কয়েকটি হাড়। কেউ কেউ পেটের গোলমালে বেশ ভুগলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে—বাটা

কোম্পানীর। তাঁদের 'সাদা রঙের জুতোর কালির' চাহিদা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল—দু' এক পশলা ঝেড়ে বৃষ্টি হবার পর ধরাও পড়ল ব্যাপারটা। কয়েকটি লোকের শাস্তিও হয়ে গেল। শাস্তি হচ্ছে ছ মাস ধরে তাদের কানের কাছে ছাব্বিশটা বৈদ্যুতিক খোল আর বাহান্ন জোড়া বৈদ্যুতিক খন্তাল বাজিয়ে একশ আট জন লোক অষ্টপ্রহর রাম নাম গাইবে। ঐ একটি মাত্র শাস্তি দেশে চালু ছিল তখন! অপরাধের তারতম্য অনুসারে খোলের আর গায়কের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হোত।

যে রঙের পায়রাগুলোকে বেছে নিয়ে দেশ থেকে বার করে দেওয়া হোল। চক্ষের নিমিষে সে সংখ্যাটা পূরণ করা হোল সাদা পায়রা দিয়ে বৈদ্যুতিক ইউজিনিক্সের সাহায্যে। বিশেষ গোলমাল কিছু হোল না। মানে কথাটা খোদ কর্তাদের কানে পৌঁছাল না।

তারপর হঠাৎ একদিন এসে গেল আরও অদ্ভুত এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র। তার নাম হচ্ছে—এন্টি এটোমিক স্প্রেয়ার। সেই যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র একদিনের মধ্যে প্রতিটি পায়রার পিঠের ওপর ফুটে উঠল রক্তবর্ণ অক্ষরে 'রাম নাম সত্য হ্যায়—', এতবড় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা নাকের ডগায় ঘটতে দেখে, আমাদের রাষ্ট্র-কর্ণধারগণের শক্তির পরিচয় পেয়ে আমরা চমকে গেলাম।

কিন্তু কিসের দরুন এই সব আয়োজন?

কেউ জানে না। জানবার কোনও উপায় নেই। মানে মিলিটারীর ব্যাপার। 'আননোন ডেসটিনেশনে' যাদের ট্রেন ছোটে তাদের ব্যাপার; তারাও কিছু জানে না।

চোঙে বলে দেওয়া হোল, "প্রস্তুত থাক। দিন আগত ঐ। সবাই সব কিছু জানতে পারবে তখন।"

আমরা প্রস্তুত রইলাম। নিরানব্বুই কোটি পায়রাও প্রস্তুত রইল।

সন চৌদ্দশত ছয়। মাসটা মনেই নেই। বারটা মনে আছে। বারটা ছিল বৃহস্পতিবার আর তখন ছিল ঘোর বারবেলা। সূর্যদেব পাটে বসেছেন।

সাইরেণ বেজে উঠল।

সব কটি চোঙ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল 'পায়রা ওড়াও'। নিমেষের মধ্যে নিরানব্বুই কোটি পায়রা উড়ে গেল আকাশে। আর দেশ জুড়ে কত কোটি বৈদ্যুতিক খোল কত্তাল বেজে উঠল কে তার হিসাব রাখে। মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্চা মাথার ওপর হাত তুলে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে শুরু করলাম। মুখে 'জয় সীয়ারাম'।

আকাশ ঢাকা পড়ে গেল আর হঠাৎ দপ্ করে দেশশুদ্ধ সমস্ত বাতি গেল নিভে। ঘোর অন্ধকারে চালিয়ে গেলাম নাচ আমরা। থামলাম না।

থামলাম আবার যখন সাইরেন 'অল ক্লিয়ার' ঘোষণা করলে। সমস্ত আলো জলে উঠল একসঙ্গে। দম নেবার জন্যে আমরা হাঁ করে বসে পড়লাম।

এমন সময় শেষবার গর্জ্জন করে উঠল সরকারী চোঙ। ঘোষণা করা হোল—"দুষমন এসেছিল এবং চলে গেছে। এক ডজন হাইড্রোজেন আর দেড় ডজন এটম ফেলে পালিয়েছে তারা। কিন্তু সেগুলি রুখেছে আমাদের নিরানব্বুই কোটি শান্তি দূত। সব কটি রি-ডাইরেক্ট হয়ে চলে গেছে তাদের নিজের দেশে। গিয়ে সেখানে যা' করবার তা' করে ফেলেছে। সাদা পায়রা আর রাম নামের গুঁতোয় কি হতে পারে আঁখি মেলি পশ্য।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমামরা। কয়েক মালা নির্যাস পান করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটল রাতটুকু। পরদিন সকালে উঠে ছাদের দিকে চেয়ে দেখি—ওমা এ কি! এরা কারা?

গলা ফুলিয়ে যারা ছাদের ওপর নাচছে তাদের মধ্যে সাদা একটিও নেই। সব কটি জালালী। পূর্ব্ব-পাকিস্তান জালালাবাদের শা জালালের দরগায় এদের উৎপত্তি। রাম নামের পরিণতি দেখে চোখ বুজতে হোল।

ডঙ্কা দা

শেষে নিজের প্রাণটাই দান করে গেলেন। মরে তো সকলেই। কিন্তু হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে সকলের চোখের উপর হেলায় জীবনটাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া ক'জনের ভাগ্যে ঘটে।

ঘটল। সেই মহানাটকের চরম যবনিকার পতনটি সমাধা হয়ে গেল আমাদের সকলের চোখের সামনে। আমাদের ডঙ্কদা চলে গেলেন।

এ-পাড়ার ও-পাড়ার স্ত্রী পুরুষ আণ্ডা বাচ্চা চ্যাঙড়া চেঙড়ী লম্বা বেঁটে রোগা মোটা সকলকে স্রেফ ভাসিয়ে দিয়ে ডঙ্কাদা মহাপ্রয়াণ করলেন।

যাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হওয়া—তাই হয়ে গেল। কি অদ্ভুত পরিবেশ! কি অপূর্ব স্থান কাল নির্বাচন! কি অভূতপূর্ব পরিকল্পনা!

ঘটনাটি ঘটে যাবার এক মুহূর্ত পূর্বেও কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে ডঙ্কাদা ঠিক ঐভাবে আর ঐ অবস্থায় অবলীলাক্রমে ঐ কার্যটি সুসম্পন্ন করবেন! কতবড় একটি কলাদক্ষ সুরুচিসম্পন্ন হৃদয়ের পরিচয় তিনি রেখে গেলেন তাঁর এই শেষ অবদানটিতে। জীবনটি দান করবার সময়ও ডঙ্কাদা আমাদের কথা ভুলতে পারেননি। এইভাবে মহাযাত্রা করে আমাদের এই শিক্ষাই দান করে গেলেন যে যাঁরা ক্ষণজন্মা, এ দুনিয়ার বৃহৎ আদর্শ স্থাপনার্থে যাঁরা কৃপা করে শুভাগমন করেন তাঁদের মহাপ্রয়াণটিও রামা, শ্যামা, হরে, যোদোর মত কাঁথায় শুয়ে কোঁথাতে কোঁথাতে ঘটে ওঠে না। সেই সমস্ত মহাপুরুষদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কর্মেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবেই তাঁদের লোকোত্তর প্রতিভার মহত্তর বিকাশ।

তাই হোল।

বিজয়া দশমীর রাত দশটা। আমাদের সকলের অলক্ষিতে পা টিপে টিপে সেই অন্তিম লগ্ন সমুপস্থিত হোল।

মা ফিরে যাচ্ছেন। লরীর উপর চেপে ছেলে, মেয়ে, সিংহ, অসুর, সাপ,

ইঁদুর, হাঁস, ময়ূর সবাইকে নিয়ে সহাস্য মুখে ঘরে ফিরছেন। ডঙ্কাদার পরিকল্পনা মত লরীখানি সাজান হয়েছে। বিজলী বাতির একশ রকম কেরামতি চলেছে লরীর উপর। জ্বলছে নিভছে, নিভছে জ্বলছে। নানারূপে নানা ঢঙে নানা ছন্দে। লরীর সামনে একটা চোঙ, পিছনে একটা চোঙ। সামনের চোঙ দিয়ে বেরুচ্ছে, "বিদায় নিও না হায় দীপ নিভে যায়।" পিছনেরটি থেকে বেরুচ্ছে, "ছলনা শুধু ছলনা।"

মা ফিরে যাচ্ছেন। আর মা'র সামনে সেই লরীর উপরেই ধুনুচি নৃত্য চলেছে। লাল টকটকে একখানি বেনারসী শাড়ি পরে দু' হাতে দুটি ধুনুচি নিয়ে স্বয়ং ডঙ্কাদা দেখাচ্ছেন ধুনুচি নৃত্যের অতি আধুনিক প্যাঁচ। যা' হচ্ছে আমাদের এই সর্বজনীন মাতৃ-পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। সারা কলকাতা সহরের সবক'টি সর্বজনীন পূজায় অনুকরণ করা হয় আমাদের 'বদনা ভাঙার অকাল বোধন' পূজা মণ্ডপের ধুনুচি নৃত্যের ঝম্পন কম্পন লম্ফন ঘূর্ণন, এক কথায় আমাদের ধুনুচি নৃত্যের সবটুকু নিয়েই সারা কলকাতার পূজামণ্ডপগুলি গৌরবান্বিত। সেই ধুনুচি নৃত্যের ভার স্বয়ং স্কন্ধে তুলে নিয়ে ডঙ্কাদা লরীর উপরে মায়ের সামনে নাচছেন। লক্ষ জোড়া চক্ষু তাঁর দিকে। 'বদনা ভাঙার অকাল বোধন' শুধু এই নামটির সম্মান ইজ্জৎ সমস্ত কিছু নির্ভর করছে ডঙ্কাদার উপর। ডঙ্কাদা নাচছেন ধুনুচি-নৃত্য।

প্রলয় শব্দ উঠেছে। ঢাক, ঢোল, নাকারা, কাঁসি, সানাই একদিকে আর একদিকে ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ। শোভা-যাত্রার সর্বাগ্রে চলেছে মাইক লাগানো আর একখানা লরী। সেই মাইক থেকে বার হচ্ছে মাতাল নারী কণ্ঠের হেঁচকি-তোলা গান! সেই লরীখানির উপরে নাচছে শঙ্খিনী সঙ্ঘের দু'টি তরুণী। সহর-বিখ্যাত নাচের স্কুল শঙ্খিনী সঙ্ঘ। ডঙ্কাদা যার শুধু সম্পাদকই নয় এক কথায় সভাপতি থেকে দরোয়ান পর্যন্ত সবই, সেই শঙ্খিনী সঙ্ঘের সর্বশ্রেষ্ঠা দু'জন আর্টিষ্ট নাচছে অতনুনৃত্য। এই নাচ শেখবার জন্যে মেয়ে দু'টিকে গত বছর চাঁদা তুলে কঙ্গো দ্বীপে পাঠান হয়েছিল। সে সংবাদ

সকলেই জানে। আর সেই মেয়ে দুইটির পায়ের কাছে লরীর উপর যন্ত্র হাতে বসেছেন দশ বার জন যন্ত্রশিল্পী। এঁরাই হচ্ছেন সুবিখ্যাত লুলিয়ান নাইট অর্কেষ্ট্রা। লুলিয়ান কথাটির উৎপত্তি হুলুলু থেকে। হুলুলিয়ান নামটাই আগে দেওয়া হয়েছিল। শেষে হুটা বাদ দেওয়া হোল। এখন শুধু লুলিয়ান নাইট অর্কেষ্ট্রা। তাঁরা বাজাচ্ছেন জীপসী ঢঙের দরবারী কানাডার সঙ্গে পাঞ্চ করা এস্কোই রামপ্রসাদীর একটি সুর।

অবশ্য কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ঢাক, ঢোল, কাঁসি, ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ, তার সঙ্গে 'ছলনা শুধু ছলনা' 'বিদায় নিও না হায়' আর হেঁচকির গান সমস্ত এক সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। শুধু মর্মে মর্মে মালুম হচ্ছে যে শব্দব্রহ্ম সত্যই ব্রহ্ম, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব ছাড়া এত জটিল বিচিত্র এহেন প্রাণান্তকর সর্বাত্মক রসের একত্র সমাবেশ আর কিসে সম্ভব।

সহস্র সহস্র জোড়া চক্ষু মেলে সকলে শুধু দেখছে প্রথম লরীর উপর অতনু-নৃত্য আর দ্বিতীয় লরীর উপর ধুনুচি-নৃত্য। সহস্র সহস্র জোড়া কানের দফা রফা হয়ে গেছে অনেক আগেই সুতরাং এখন রস যা গ্রহণ করা যাচ্ছে তা' শুধু চোখ দিয়েই। ঠিক এই সময় অর্থাৎ যে সময় ডঙ্কাদার মাথার উপরের মাইক থেকে বেরুচ্ছে 'নিশি রাতে তুমি নিশি ডাক' ঠিক তখনই ডঙ্কাদা হঠাৎ একেবারে হিম নিশ্চল নিশ্চুপ মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দু'টি ধনুচিই শুদ্ধ। বাঁ হাতেরটি বুকের কাছে আর ডান হাতেরটি মাথার উপর। একেবারে যেন পাথরের প্রতিমূর্তি।

প্রথমটায় সকলেরই ধাঁধা লেগে গেল। থামল কেন? হয়ত ঠিক ঐ ভাবে থামাটাই আর কাত হয়ে বেঁকে চুরে দাঁড়িয়ে থামাটাই হচ্ছে সঠিক ধুনুচি-নৃত্যের আর্ট। এই থেমে থাকার পরমুহূর্তেই একটা অভাবনীয় কিছু দেখাবেন ডঙ্কাদা—এই আশায় সকলেই অপেক্ষা করতে লাগল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। ধুনুচি নৃত্যে এ পর্যন্ত যা' কেউ কোথাও দেখাতে পারেনি এইবার সে'টি দেখতে

পাওয়া যাবে। হয়ত তিড়িং করে উঠবে লাফিয়ে, হয়ত বা বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকবে। কিংবা হয়ত ঠিক ঐভাবেই ধীরে ধীরে পড়বে বসে। সঙ্গে সঙ্গে মাইকে আরম্ভ হয়ে যাবে 'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম।' এরপর কি হয় কি হয় এই ভাব সকলের মনে।

শোভাযাত্রার একেবারে সামনের পুলিশ ইঙ্গিত করল। সমস্ত শোভাযাত্রা আবার নড়ে উঠল। লরীখানা চলতে আরম্ভ করলে। মায়ের মুকুট দুলে উঠল।

আর ডাক্কাদা দড়াম করে লরীর উপর পড়ে গেলেন গাছপড়া হয়ে।

হয়ে গেল।

সমস্ত শেষ হয়ে গেল। দপ্ করে লরীর উপরের সমস্ত আলো এক সঙ্গে নিভে গেল। ঝপ্ করে মাইক বন্ধ হয়ে গেল। টপ্ করে ডক্কাদাকে নামিয়ে আনা হোল ধরাধরি করে। এবং খপ করে সরিয়ে ফেলা হোল সেখান থেকে।

হৈ হৈ উঠল একবার। কিন্তু সে দু' মিনিটের জন্যে। দু' মিনিটের মধ্যেই ইলেক্ট্রিকের ছেঁড়া তার জোড়া হোল। আবার আলো জ্বলে উঠল আবার রকমারী কেরামতি চলতে লাগল বিজলী বাতির। আবার মাইক দুটো গর্জন করে উঠল। শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে অগ্রসর হয়ে গেল আপন পথে।

ধুনুচি-নৃত্যটা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। কারণ দুটো ধুনুচিই চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তাতে কি যায়। নৃত্য তো আর বাদ দিলে চলে না। আমাদের সকলের মামু পঞ্চান্ন বছরের পঞ্চুমামা দাঁড়িয়ে উঠলেন মায়ের সামনে। কোঁচাটা খুলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চালিয়ে গেলেন নাচ।

বিজয়ার দিন প্রতিমার সামনে নাচ বন্ধ হলে কি প্রেষ্টিজ থাকে নাকি পাড়ার। সে যাত্রা পঞ্চুমামাই সকলের মুখ রক্ষা করলেন।

আমরা জনা পাঁচ সাত ডক্কাদাকে বয়ে নিয়ে গেলাম পাড়ার সঞ্জীব ডাক্তারের ডাক্তারখানায়।

ধূর্জটি হচ্ছে আমাদের এ-পাড়া ও-পাড়া দু' পাড়ার শ্রী। পর পর তিন

বছর দেহ-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সে বদনা ভাণ্ডা শ্রী হয়েছে। তার উপর রাষ্ট্রভাষা শিখতে শুরু করেছে আজকাল। সে বললে, "মায় জলদি কাম মাঙ্‌তা হায়। ডঙ্কাদা পড়ে থাকনে সে এক মিনিট নেহি চলে গা। একঠো কড়া দেখকে ইনজেক্শন লাগাকে আভি খাড়া কর দেও ডাক্তারবাবু। হামলোক সব তুমারা কেনা গোলাম হো কে রহেগা।"

উল্‌টে পাল্‌টে নল বসিয়ে নাড়ী টিপে চোখের পাতা টেনে দেখে ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

বন্‌শীদাস আগরওয়ালের বাবা ভাঙা-চোরা পুরনো লোহা লক্কড়ের কারবারী। বিসর্জনের যাবতীয় খরচা বন্‌শীদাসের। ডঙ্কাদাকে সে গুরুর চেয়ে বেশী ভক্তি করে। ডঙ্কাদা না থাকলে মাসে দু'বার করে ওদের পুলিশে ধরত চোরাই কারবারের জন্যে। ডঙ্কাদা কথা দিয়েছিল যে এবার কর্পোরেশন ইলেক্‌সনে বন্‌শীকে দাঁড় করানো হবে।

বন্‌শীদাস খেপে গেল, এইসব ডগ্‌দর বাবু লোক স্রিফ বুদ্ধু আছে। একদম কাম কা নেহি আছে। লে চল্‌ আভি মারোয়াড়ী হাসপাতাল।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে শুনিয়ে দিলেন, "কোনও লাভ নেই, হয়ে গেছে।" সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম, "হয়ে গেছে! তার মানে?"

নলটা গলায় ঝোলাতে ঝোলাতে ডাক্তার বললেন, "ইলেক্‌ট্রিক শক অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। একেবারে শেষ।"

স্থান সঞ্জীব ডাক্তারের ডাক্তারখানা। বেঞ্চির উপর শুয়ে আমাদের ডঙ্কাদা। আর বেঞ্চির চারধার ঘিরে দাঁড়িয়ে আমরা সাতজন। শুনলাম অর্থাৎ যাকে বলে মাথায় ব্রজ্রাঘাত হোল। নেই নেই নেই—আমাদের ডঙ্কাদা আর নেই। সেদিনটি ছিল বিজয়া দশমী আর রাত তখন ঠিক এগারটা কুড়ি। দশমীর চাঁদ আকাশে তখন হাসছিল। রাস্তায় চলছিল একটার পিছনে আর একটা বিজয়ার মিছিল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ডঙ্কাদাকে ঘিরে সঞ্জীব ডাক্তারের ডাক্তারখানায়।

তারপর রাত দুটোর সময় প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসে পড়াসুদ্ধ সবাই শুনলে সেই সংবাদ।

নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে গেল সেই নিদারুণ সংবাদটা। পুলিশের কাঁদুনে গ্যাসের চেয়ে শতগুণ শক্তিসম্পন্ন সেই গ্যাস এ-পাড়ার ও-পাড়ার দু' পাড়ার মাথার উপর নেমে এল। হায় হতভাগ্য আমরা।

কিন্তু কর্তব্য? কর্তব্য কাঠোর এবং তা' কাউকে ক্ষমা করে না। ডঙ্কাদার কাছে সব চেয়ে বড় ডাক ছিল কর্তব্যের ডাক। তাই না তিনি ছিলেন আমাদের সকলের মাথার উপর একচ্ছত্র সম্রাট। আমাদের এখন কর্তব্য ভুললে চলবে কেমন করে?

আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি যেরূপ সুষ্ঠু পরিকল্পনা মত সমাধা করতেন আমাদেরও যে ঠিক সেই রকমটি করা চাই-ই চাই। এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মাথা ঠাণ্ডা করে চলা। যেন কোন দিকে কোন ফাঁকে কোথাও কোন অঙ্গহানি থেকে না যায় আমাদের ডঙ্কাদার অন্তিম কার্যে। তাহলে যে আমরা নিজেরাই নিজেদের মুখদর্শন করতে পারব না।

অবশেষে আমরা সাজলাম।

প্রথম কথা টাকা চাই এবং অবিলম্বে তা' চাই। ডঙ্কাদা নেই এটুকু জেনেই বন্‌শী আগরওয়াল ভাগলবা হয়েছিল।

গজেন্দ্র বক্‌শী মানে আমাদের গজুদা দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, "আচ্ছা দাঁড়া ব্যাটা। একবার উদ্ধার হয়েনি এই বিপদ থেকে। তারপর দেখব আবার তুই আমাদের পা চাটিশ কিনা।"

মাসের শেষ আর পূজোর মাস। কারও হাতে টাকা পয়সা নেই। কিন্তু তা' শুনতে গেলে আমাদের চলবে কেন? পাড়ার ভদ্রমহোদয়গণ মাস গেলে মাইনে পেয়ে যেদিন বাড়ি ফিরবেন সেই শুভ মুহূর্তটিতে ডঙ্কাদাকে মরতে হবে এমন কোনও কথা ছিল না তো। সুতরাং টাকা চাই। অর্থাৎ দিতেই হবে টাকা এবং এখুনিই।

খই ফুল ফুলের মালা আর পয়সা। তারপর চন্দনকাঠ ঘি আর ধুপধুনা গুগগুল। আরও আছে সেটাও ভুললে চলবে না। মানে ফটো তোলার খরচটা। এই হলেই হবে আপাতত।

"আরও আছে। সেটি বাদ দিলে চলবে না, চলতে পারে না। বন্ধুগণ—আপনারা ভুলে যাবেন না আমাদের অবিসংবাদী নেতা মহাপ্রাণ ডক্কেশ্বর চক্রবর্তী প্রাণদান করে গেলেন পরের জন্যে। পরকে আনন্দ দিতে তিনি তাঁর সর্বস্ব ছেড়ে গেলেন। মাইক, মাইকের গান শোনাতে গিয়ে তাঁর জীবন গেছে। মাইকের তারে তাঁর পা জড়িয়ে গিয়েছিল নাচতে নাচতে। তাই তাঁর এই অকাল প্রয়াণ। সুতরাং মাইক চাই, অন্তত দুটো তাঁর শোকযাত্রায়।"

ঘোষণা করলে ত্রিবিক্রম নন্দী। ত্রিবিক্রম বক্তৃতা না করে কথা বলতে পারে না।

আরও হয়ত কিছুক্ষণ সে তার বক্তৃতা চালিয়ে যেত। কিন্তু তাকে থামতে হোল। সমবেত কণ্ঠে চীৎকার উঠল, "চাই-চাই-চাই। মাইক চাই। মাইক না হলে চলবে না, চলবে না। আমাদের দাবী মানতে হবে।"

বিজয়া দশমীর ভোর রাতে পাড়ার প্রতি বাড়িতে হানা দেওয়া হোল। এ যে ডক্কাদার শেষ কাজ। আর একবার তো আর ডক্কাদার মহাপ্রয়াণ হবে না কখনও। এ সময় নেই কথাটি শুনছে কে? আর নেই বলবার স্পর্দ্ধাই বা আছে কার?

একাদশীর দিন। বেলা তখন এগারটা।

বিরাট শোকযাত্রা তৈরী হোল। বেনারসী পরিহিত কপালে চন্দন ডক্কাদাকে শোয়ান হোল ফুলশয্যায়। তারপর আরম্ভ হোল সেই মহাযাত্রা।

প্রথমেই শঙ্খিনী শঙ্খের সভ্যারা। এলো চুল কালো পাড় শাড়ি পরনে প্রত্যেকের। সর্বাগ্রে ষাটজন চললেন ষাটটি শাঁখ বাজাতে বাজাতে।

তারপরই একখানি সাইকেল রিক্সা। সেখানিতে মাইক লাগানো। আরম্ভ হোল 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই ঘাটে।'

সাইকেল রিক্সার পিছনে মেঘনাদ ক্লাব। মেঘনাদ ক্লাবের সভ্যদের অঙ্গে এক একটি করে লেঙট। তাঁরা চললেন তাঁদের সর্বদেহের পেশী সঞ্চালন করতে করতে। এই মেঘনাদ ক্লাব এই পেশী সঞ্চালন এই শ্রী হবার জন্যে বছর বছর লড়াই কার কৃপায়? ডঙ্কাদাই এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং মেঘনাদ ক্লাবের দাবী সর্বাগ্রে।

মেঘনাদ ক্লাবের ঠিক পেছনেই একখানি লরী। লরীতে লুলিয়ান নাইট অর্কেষ্ট্রা! বিষাদ সঙ্গীত বাজান হচ্ছে। বোহেমিয়ান কাওয়ালীর সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়েছে 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব'র সুর।

লরীকে অনুসরণ করছেন খদ্দর মণ্ডিত পাড়ার নেতারা। যাঁরা সকলের থেকে বেশী ঋণী ডঙ্কাদার কাছে। দু'জন পৌর প্রতিষ্ঠানের সভ্য। একজন হবু উপমন্ত্রী এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা।

আবার একখানি লরী! এখানির উপর 'আনুষঙ্গিক গোষ্ঠি'। এঁরা অভিনয় করছেন এঁদের অনবদ্য অবদান—'ভিটেয় ঘুঘু চরানো।' সহরসুদ্ধ লোক জানে এই 'আনুষঙ্গিক গোষ্ঠি'র নাম। আর এঁদের 'ভিটেয় ঘুঘু চরানো' অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়নি এমন বুদ্ধু কে আছে? ডঙ্কাদার অবিনশ্বর কীর্তি হচ্ছে এই আনুষঙ্গিক গোষ্ঠি।

এর পরই বৈদেহি সমিতি। এদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ এরা বেকার। চির বেকার। এই দলে সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে তেরো বছরের অতি তরুণ পর্যন্ত রয়েছে। ডঙ্কাদা ছিলেন এই বৈদেহি সমিতির প্রাণ। তাঁরই হাতের তৈরী এই সমিতি। এর নিয়ম কানুন সমস্তই তাঁর মানে ডঙ্কাদার নিজের গড়া। কাজেই আজ এরা এক রকম পিতৃহীন হয়ে পড়েছে। এই সমিতির প্রতিটি সভ্যের প্রত্যেকটি ন্যায্য দাবীর জন্যে যিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তিনি আজ নেই। এই না-থাকাটা যে কত বড় না থাকা তা' এদের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। এদের প্রত্যেকের হাতে একখানি করে তিন হাত লাঠির ডগায় আটকানো এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া একখানি টিনের প্ল্যাকার্ড।

আর সেই চাটাইয়ের উপর আঁটা সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা এদের বিভিন্ন দাবীগুলি। দাবীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে তুলে দেওয়া গেল।

(১) আফিম আমার চাই-ই চাই। (২) সিনেমা দেখার পয়সা দিতেই হবে। (৩) বাড়ি ভাড়া চাওয়া চলবে না। (৪) পরীক্ষার প্রশ্ন এক মাস আগে প্রকাশ কর। (৫) মুদিখানার দেনা বরবাদ হোক। (৬) শ্বশুরই বউকে পালন করতে বাধ্য। (৭) চায়ের দোকান ফ্রি কর। (৮) ট্রামে বাসে পয়সা দেওয়া বন্ধ কর। (৯) বিয়ের পণ বাড়িয়ে দাও। (১০) প্রেমের পাত্রীকে চাই-ই চাই।

এই রকমের আরও শত শত ঝাণ্ডা উঁচিয়ে চললেন বৈদোহি সমিতির সভ্যবৃন্দ ছল ছল চোখে।

এরপর একদল হরিনাম সংকীর্তন আর একদল কালীনাম সংকীর্তন। এবং সঙ্গে শঙ্গে আমাদের কাঁধের উপর চিরনিদ্রায় মহাপ্রাণ ডক্কাদা। ফুলশয্যায় শায়িত হয়ে চলেছেন মহাযাত্রায়।

তারপরই একখানি সাইকেল রিক্সায় আর একটি মাইক। তা' থেকে বোম্বাই সুর বার হচ্ছে, 'মেরে দিল কা দিল দরিয়া রে।'

এই মহাযাত্রা আরম্ভ হোল ঠিক বেলা এগারটার সময়। পাঁচ জায়গায় থামতে হোল। পাঁচ জায়গা থেকে ফুলের মালা দেওয়া হোল ডক্কাদার নশ্বর দেহের উপর। তারপর ঝাড়া আধ ঘণ্টা এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে আমরা যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

রাত তখন ন'টা।

গঙ্গার পবিত্র তীরে চন্দন কাঠের চিতার উপর ডক্কাদা। ফটাস ফটাস শব্দে আলো জ্বলে উঠছে। একটি করে বাল্ব নষ্ট হচ্ছে। একখানি করে ফটো [illegible] ডক্কাদার।

তারপরই ঘি, চন্দন কাঠ ভগগুলের গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত

হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তেইশটা বোমায় আগুন দেওয়া হোল। তেইশটি বোমা ডঙ্কাদার জীবনে তেইশ বছরের প্রতীক।

তখন আমরা স্পষ্ট দেখলাম। দেখলাম অগ্নিশিখার মাঝে দাঁড়িয়ে ডঙ্কাদা। হাসছেন আর আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

আমরা ফিরে এলাম।

ফিরে এলাম শোকসভার আয়োজন করতে। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় এ-সঙ্ঘে ও সমিতিতে সর্বত্র শোক-সভা চলতে লাগল এক সপ্তাহ ধরে। বড় বড় বক্তা ধরে এনে সভাপতি করা হোল। প্রধান অতিথির জন্যে হানা দেওয়া হোল সাহিত্যিকদের দরজায়। মোটা টাকা চাঁদা তুলে দেবার অঙ্গীকার করে দৈনিক কাগজের সম্পাদকদের বাগানো হোল সভার উদ্বোধন করবার জন্যে।

কাজেই সপ্তাহ দুয়েক ধরে কাগজের পাতায় পাতায় ছবিসহ ছাপা হতে লাগল ডঙ্কাদার পুণ্য জীবন কাহিনী।

শেষে এসে গেল কালীপূজা। আমরাও তখন আবার লেগে গেলাম সর্বজনীন শ্যামাপূজার আয়োজনে।

সেই পূজার রাত্রেই জানতে পারলাম সকলের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে অধিষ্ঠান করছিলেন ডঙ্কাদা।

কথা হচ্ছিল। মেয়েদের ওধারে ডঙ্কাদাকে নিয়ে। কে বললেন, "মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে সকলের।" কম বয়সী কয়টি গলার খিল খিল শব্দে হাসি উথলে উঠল।

এ ধারে বসেছেন পাড়ার হব্যি ভব্যি ভদ্রলোকেরা। রামাচরণ ডাক্তার সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি দেবী প্রতিমার দিকে চেয়ে জোড় হাতে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "মা তারিণী—একটিকে দয়া করেছ আর একটিকেও নাও মা। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক।"

সমাপ্ত